বাঙালের আমেরিকা দর্শন

বাঙালের আমেরিকা দর্শন

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দিলীপ দাস

প্রথম মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৬৮

নিউইয়র্কের জাহাজঘাটায় একজন ভিখিরি আমার কাছে ভিক্ষে চেয়েছিল। কিন্তু ভিক্ষে দিতে আমার ঠিক সাহসে কুলোয়নি। সেই ভিখিরি একজন পঙ্গু নিগ্রো, পরনে ভদ্রস্থ পোশাক এবং সে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছিল একটা মোটোরাইজড ইনভ্যালিড হুইলচেয়ারে। এফ টি এস ভাঙিয়ে মোট পাঁচশো কুড়ি ডলার সম্বল করে পরনির্ভর ওই ভ্রমণে ভিক্ষে দেওয়ার সাহস আমার আরও একটা কারণে হয়নি, ওখানে ভিক্ষের রেট কমপক্ষে এক ডলার। অন্তত তাই চায়। পঞ্চাশ বা পঁচিশ সেন্ট দিলেও হয়, কিন্তু সেটাই বা কম কি ? আমাকে প্রায় সাড়ে যোলো টাকা দরে এক একটি ডলার কিনতে হয়েছে। যোধপুর পার্কের একটি গলিতে সন্ধের পর একটি বুড়ি রোজ ভিক্ষে করতে বসে। একদিন বাস-এ কুড়িয়ে পাওয়া দুটো সিকি তার কলাইকরা থালায় ফেলাতে তার অবিমিশ্র বিস্ময় দেখে মায়া হয়েছিল। এতটা সে আশাও করেনি। এদেশেও আজকাল ভিক্ষের রেট বেড়েছে বটে। "একটি পয়সা দাও গো বাবু, একটি পয়সা দাও"-এর যুগ আর নেই। পাঁচ দশ কুড়ি পয়সা করে রেট যাচ্ছে এখন। দান-কে দান, পুণ্যি-কে পুণ্যি। কুড়ি পয়সা অবধি তেমন গায়েও লাগে না। দাতা গ্রহীতা দু পক্ষই খুশি। কিন্তু নিউইয়র্কের জাহাজঘাটায় যার দেখা পেলুম সে হল রাজভিখিরি। স্বতশ্চল হুইলচেয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিক্ষে করে। তাছাড়া আছে ভাতার নিশ্চয়তা, মাথার ওপর মজবুত ছাদ, দিনে চার-পাঁচবার ভাল খ্যাঁটের বন্দোবস্ত, রঙিন টিভি বা ফ্রিজ তো ফালতু জিনিস, কার ঘরেই বা নেই। সুতরাং তার ঘরেও হয়তো আছে। আর আছে বিনা পয়সায় রাজকীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা। দিনে যদি ভিক্ষে করে তার নিদেন পঞ্চাশ ডলারও আয় হয়, তাহলে তার দৈনিক আয়টাও তো আমাদের দেশের অনেক কেরানিবাবুর মাসিক আয়ের চেয়েও বেশি। আর ভিক্ষালব্ধ তার মাসিক আয় আমাদের বাইশ তেইশ হাজার টাকার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে যায়। জাহাজঘাটার ভিখিরিকে সুতরাং ব্যাপারটা বোঝানোর উপায় ছিল না যে, তাকে ভিক্ষে দেওয়াটা আমার স্পর্ধার সামিল। তা বলে আমেরিকায় গরিব বা দুঃখী নেই এমন নয়। বেকারও বিস্তর। পুঁজিবাদের কলুষ তো থাকবেই। আছে ঝুপড়ির বাসিন্দা, নোংরা-ঘাঁটা মানুষ। কিন্তু তাদের মান আমাদের দেশের মতো নয়। বিস্তর তফাত।

ভিখিরি দিয়ে ব্যাপারটা শুরু করেই মনে হচ্ছে, এ সব ঘটনা গড়পড়তা বাঙালি জানে। তারা মার্কিন দেশের ইতিবৃত্ত কিছু কম পড়েনি। আকছার বাঙালিরা আজকাল বিদেশে যাচ্ছেও। আমেরিকাতেই এখন অভিবাসী বাঙালির যা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তাতে মিলেজুলে তারা ওখানে একটা মিনি বেঙ্গল রাজ্য তৈরি করে নিতে পারে। সুতরাং আমার এই হাপবহাটি হল গিয়ে মায়ের কাছে মাসির গল্প। তা হোক, আমেরিকার কথা বারবার শুনলেও পুরনো হয় না। বরং একটু রঙ চড়িয়েই বলব না হয়। লাগসই করে কোনও মেমসাহেব বা প্রবাসী বাঙালি তরুণীর সঙ্গে একটা প্রেমের উপকাহিনীও জুড়ে দেওয়া যাবে।

আমার দৌড় অনেককাল অবধি বাংলা বিহার ওড়িশার সীমা ডিঙোযনি। উনিশ শো পঁচাত্তরে প্রথম দিল্লি যাওয়ায় সে কী উত্তেজনা। দিল্লি! আমি তা হলে দিল্লি যাচ্ছি! অ্যাঁ! তারপরে অবশ্য নানা কাজে অকাজে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি টানা মারতে হয়েছে। তবু অদেখা রয়ে গেছে কত রাজ্য। আমার তাতে দুঃখ নেই। যাকে ভ্রমণবিলাসী বলে আমি তেমন নই। গেলেও হয় না গেলেও চলে যায়। বরং বাংলার গ্রাম-প্রান্তরে ছোটো ছোটো স্বল্পক্ষণের ট্রিপ আমার ঢের বেশি প্রিয়।

জ্যোতিষীদের মধ্যে বড্ড বেশি মতভেদ। আমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখে অনেকে বলেছেন, বিদেশযাত্রা নেই। অনেকে বলেছেন, আলবাৎ আছে। আমি নির্বিকার। দিব্যি কলকাতায় থানা গেড়ে বসে মাঝে-মাঝে সভাসমিতি কুম্ভমেলা করতে এখানে সেখানে গিয়ে একটা স্বদেশীয় বৃত্তে আটকা পড়ে যাচ্ছিলুম। বিদেশ নিয়ে কোনও হা-হুতাশ ছিল না। বিশেষ করে আমেরিকা সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়েছিলুম আমার বন্ধু সিরাজ সে-দেশ ঘুরে আসার পর। সে এমন সব বর্ণনা দিত যে, আমি তাকে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেই করতুম না। ভাবতুম ওর মগজধোলাই হয়ে গেছে! কিন্তু মুশকিল হচ্ছিল অন্য দিক থেকে। বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায় সবাই এক আধবার বিদেশ ঘুরে এসেছে। যারা যায়নি তারা মুষ্টিমেয়। আমি সেই অতিশয় সংখ্যালঘুর দলে। ফলে মর্যাদার বেশ হানি হচ্ছিল। আমার পক্ষে ততটা নয় যতটা আমার আত্মীয়-স্বজন-হিতৈষীদের পক্ষে। একটু, আধটু গঞ্জনাও শুনতে হচ্ছিল। কিন্তু নিরুদ্যম ও গেঁতো আমার পক্ষে কিছু ঘটিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল না।

পরের পয়সায় বিদেশ-ভ্রমণের নানাবিধ ফন্দিফিকির আছে। যারা সেসব জানে তারা ভাগ্যবান। ধনী দেশগুলো নানারকম খাতে টাকা খরচ করে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষজনের জন্যও তাদের কিছু বরাদ্দ আছে। এই বরাদ্দের সদ্ব্যবহার করতে যে পারে সে-ই বুদ্ধিমান। কিছুকাল আগে আমার এক

শুভানুধ্যায়ী আমাকে একটা ফর্ম এনে দিয়ে বলল, ভাই, তুমি এই ফর্মটা পূরণ করে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। তা হলে আমেরিকা থেকে তুমি একটা বেশ ভাল স্কলারশিপ পেয়ে যাবে। আমি অবাক হয়ে, তাকে বললুম, এ তো একটা দরখাস্তর ফর্ম দেখছি। এটা পাঠাতে যাবো কোন দুঃখে ? আমি তো মার্কিন দেশ ভ্রমণের জন্য তাঁদের বদান্যতার প্রত্যাশী নই। আমার শুভানুধ্যায়ী অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে বলেছিল, কিন্তু এতে তোমার বিদেশ যাওয়াটা তো হবে। তুমি তো যাওনি কোথাও। তার এই সহানুভূতি দেখে আমি করুণ হাসি হেসে বললুম, বয়স আরও কম হলে এবং আত্মমর্যাদার বোধটা এমন টনটনে না হয়ে উঠলে তোমার প্রস্তাবটা লুফে নিতুম। কিন্তু এখন আর পেরে ওঠা যাবে না। তারা আমন্ত্রণ জানালে আপত্তি ছিল না।

তার দেওয়া ফর্মটা প্রত্যাখ্যান করলেও আমার জ্ঞানোদয় হয়েছিল যে, এরকম সব ফর্ম-টর্ম পূরণ করে বিদেশ যাওয়ার ফিকির আছে। লেখক, ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্পী, সমাজসেবক, গায়ক-বাদক, মৃৎশিল্পী, পটুয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রী, রোগী প্রভৃতি সকলের জন্যই ব্যবস্থা আছে। শুধু খোঁজখবর রাখা এবং ঝোপ বুঝে কোপ বসানোর বুদ্ধি থাকা চাই। লেখকদের কথা খানিকটা জানি। মার্কিন সরকার প্রতি বছরই ভারতবর্ষ থেকে এক আধজন লেখককে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায়। তা ছাড়া আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইটার্স ক্যাম্প তো আছেই। কিন্তু সেসব হল শিকে ছেঁড়ার গপ্পো। আজকাল যে সুযোগের অভাব নেই, এ কথাটা ভারি সত্য।

মার্কিন দেশ নিয়ে আমার প্রথম প্রতিবেদনটি বেরোনোর পরই আমি বিস্তর চিঠি আর টেলিফোন পেয়েছিলাম। সে দেশে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। ফলে বুঝতে অসুবিধে নেই যে, অনেকের কাছেই আমেরিকা এক স্বপ্নময় সব-পেয়েছির দেশ। এই গরিব দেশের মানুষজন তো চাইবেই সেখানে যেতে। দুঃখের বিষয়, বিদেশে যাওয়ার সুযোগ যত, তার চেয়ে উমেদারের সংখ্যা বহু বহু গুণ বেশি। কিছু লোক যায়, বহু লোক বুকে স্বপ্ন পুষে বেঁচে থাকে।

না গিয়েও জানা ছিল, বারো হাজার মাইল দূরে সাহেবরা একটা ঝাঁ-চকচকে আজব দেশ বানিয়ে রেখেছে। খুড়োর কলের মতো সেই বস্তু আমাদের মাঝে মাঝেই উত্তেজিত ও লোভাতুর করে তোলে। সাহেবদের ওপর আমাদের নানা কারণেই হিংসে। হিংসের সবচেয়ে বড় কারণ, অবশ্যই তাদের দেদার টাকা আর ঐশ্বর্য।

ওই বড়লোকের দেশে যাওয়ার জন্য আমি যে আমন্ত্রণটি পেলুম সেটি কিন্তু বেশ দরিদ্র। দেদার বিদেশী মুদ্রার প্রতিশ্রুতি নেই, ভ্রমণ ভাতা নেই, হাত-খরচ নেই। শুধু যাতায়াতের ভাড়া আর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। আনন্দবাজার

পত্রিকার দফতরে এক লোডশেডিং-এর ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে এক বিনয়ী যুবক প্রস্তাবটি মৌখিকভাবে নিয়ে এল। প্রবাসী বাঙালিদের বঙ্গ সম্মেলন হল উপলক্ষ। আমন্ত্রণটি গ্রহণ করব কি করব না সে বিষয়ে আমার দ্বিধা ছিল। প্রবাসী বাঙালিরা আমাদের অনুপাতে যতই ধনী হোক না কেন, তারা অধিকাংশই চাকুরিজীবী তাদের যা কিছু উদ্যোগ তার সবই চাঁদা-নির্ভর। এই চাঁদার টাকায় বিদেশ-ভ্রমণ আমার পছন্দ নয়। কষ্টার্জিত টাকা এভাবে খরচ করতে তাদের হয়তো কষ্ট হবে। আর এমন উঞ্ছবৃত্তি করে আমার যাওয়ার দরকারটাই বা কী?

দরকার যে আমার নয়, তাদেরই একথাটাই যুবকটি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল। তার কথা আগেও লিখেছি। সুদীপ্ত। আমি শেষ অবধি না গেলে আর কাউকে তারা নেবে বটে, কিন্তু আমি কি কষ্ট করে যেতে পারব না? তার কাঁচুমাচু মুখখানা অন্ধকারেও মোমের সামান্য আলোয় দেখে রাজি হয়ে গেলুম। আমি বেশির ভাগ সময়ই ভ্রমণে বিস্তর কষ্ট পেয়েছি। তার কারণ আমি আঘাটাতেই ঘুরেছি বেশি। একবার আমাকে অফিস থেকে পাঠানো হয়েছিল রামচন্দ্রের বনবাসের পথ পরিক্রমায়। অযোধ্যা থেকে রামেশ্বরম অবধি। সে যাত্রায় যেমন থ্রিল ছিল, তেমনই কষ্ট। তার ওপর, আমার আবার বরাবরই নিজের বোঝা নিজে বওয়ার অভ্যাস। ওই গোটা পথ পরিক্রমায় একবারও কুলি নিইনি।

প্রথমবার কুম্ভমেলায় গিয়ে প্রয়াগের মাঠে যে খাওয়া-দাওয়ার কী সাঙ্ঘাতিক কষ্ট পুইয়েছি তা আমিই জানি। তার ওপর রোজ দশ-বারো মাইল হাঁটা। খিদে পেত, কিন্তু ভদ্রস্থ খাবার জুটত না। সাত দিনে দশ-বারো কেজি ওজন কমে গেল। যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন চেহারা দেখে বউ অবধি চিনতে পারে না! নিরামিষাশী বলে আমাকে আরও নানা রকমের কষ্ট সহ্য করতে হয়। সেবার মধ্যপ্রদেশে সরকারি আমন্ত্রণে বিশাল একখানা ভ্রমণের চক্করে বেরিয়েও কিন্তু খাওয়া-দাওয়ায় বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে। আমি পেঁয়াজ রসুন অবধি খাই না, ফলে অনেক জায়গাতেই ভাত আর লঙ্কা ছাড়া কিছুই জোটেনি। ডালে পেঁয়াজ, তরকারিতে পেঁয়াজ, আমাকে বহুবার অভুক্ত রেখেছে। একবার এক টুরিস্ট লজের নেপালি রাঁধুনিকে পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করার অনুরোধ জানানোয় সে প্রবল উষ্মার সঙ্গে বলেছিল, পেঁয়াজ ছাড়া সবজির কোনও 'টেস' হয় না। সুতরাং সে আমাকে বেগর-পেঁয়াজ রেঁধে খাওয়াতে পারবে না। আর একবার মাদ্রাজে সারা শহর প্রায় চষে ফেলতে হয়েছিল পেঁয়াজবিহীন মধ্যাহ্নভোজের সন্ধানে।

ভ্রমণের আরও নানাবিধ কষ্ট আছে। বিশেষ করে একাকী ভ্রমণকারীর। বিশেষ করে অসুখ করলে।

ভ্রমণ নিয়ে এত কথা বলছি, তার কারণ আমি কষ্টের ব্যাপারে কতটা পোক্ত

সে বিষয়ে আলোকপাতের জন্য। আমেরিকা ভ্রমণ হয়তো ততটা কষ্টকর হবে না। হলেও কষ্টটা গায়ে না মাখলেই হয়। আমার অভ্যাস আছে। তাই ধনী দেশে গরিব ভ্রমণে শেষ অবধি রাজি হয়ে যেতে হল।

কিছুদিন পরে জানা গেল বঙ্গ সম্মেলনে লেখক হিসেবে প্রথম আমন্ত্রিত আমি নই, সমরেশ বসু। আচমকা তাঁর দেহাবসান ঘটায় দ্বিতীয় নির্বাচন আমি। এটা শোনার পর মনটা কিছু খারাপ হল। সমরেশ বসু মস্ত লেখক হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ-গমনের বিশেষ সুযোগ তাঁর হয়নি। যদিও আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। সম্ভবত ফিকিরগুলো তাঁরও ভাল জানা ছিল না। ফিকিরের লোক না হলে ভারি মুশকিল। তাঁর পুত্র ইংলন্ডে থাকাকালে নিজের উদ্যোগে একবার বিলাতযাত্রায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি তা ঘটে ওঠেনি। বেশ পরিণত বয়সে বিদেশ থেকে একটি ভদ্রগোছের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। রাশিয়ায়। তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা উপলক্ষে—আমন্ত্রিত হয়ে নয়—খানিকটা নিজের উদ্যোগে এবং প্রবাসী বাঙালিদের বদান্যতায়। তাঁর মতো লেখক বিদেশে যাওয়ার আরও কিছু সুযোগ পেতে পারতেন। পাননি। ফিকিরগুলো অবশ্য অন্যেরা কাজে লাগিয়েছিল। শরীর যখন অশক্ত, হৃদযন্ত্র যখন বারবার বিপাদসঙ্কেত দিচ্ছে, দিনে যখন দশ-বারো রকমের ওষুধ খেয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে এবং একা কোথাও যাওয়ার সাহসটুকু পর্যন্ত আর নেই, তখন সুদূর আমেরিকা থেকে বঙ্গ সম্মেলনের দরিদ্র নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি গ্রহণও করেছিলেন। তাঁর চিঠিটি পরে সমারভিলে বঙ্গ সম্মেলনে প্রদর্শিত হয়েছে। এই নেপথ্যকাহিনী জানার পর অবশ্য বঙ্গ সম্মেলনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম বলে কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছি। সমরেশ বসুর শূন্য স্থান পূর্ণ করার সাধ্য আমার নেই। তবে তাঁর জায়গাটা যে একেবারে ফাঁকা গেল না এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

বিদেশে যাওয়ার সুদূরতম আশাও ছিল না বলে আমি পাসপোর্টের দরখাস্তও কখনও করিনি। শুনেছিলুম সেটা বেশ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। পাসপোর্টের জন্য খুব ভিড় হয় এবং দীর্ঘ লাইনও পড়ে। ভিড়কে আমি ভীষণ ভয় পাই এবং দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ক্লান্তিকর ধৈর্য আমার এখন নেই।

সুদীপ্ত অবশ্য আমাকে এই ঝামেলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। ফর্ম সেই পৌঁছে দেয়। তবে ব্যাপারটা তেমন নির্ঝঞ্ঝাট হয়নি। পূর্ববঙ্গে দেশ এবং পেশায় সাংবাদিক বলে পুলিশি তদন্তে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এবং পাসপোর্টটি আদায় করতে শেষ সময়ে আমাকে বেশ ছোটাছুটি করতে হয়।

পাসপোর্ট যখন হাতে এল তখন সময়ের পুঁজি বড্ড কম। ইচ্ছে ছিল প্যারিস এবং লন্ডন শহরে খানিকটা সময় কাটিয়ে যাবো। সেটা ফিরতি যাত্রার জন্য মুলতুবি রাখতে হল।

স্মৃতি ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কতরকমভাবে যে সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছি আর কতবার যে সে গল্প লোককে শুনিয়েছি তার হিসেব নেই।

বোধহয় সেই ঘটনার বিশ বছর বাদে ঝকঝকে আধুনিক বোয়িং বিমানে চেপে অবাক হয়ে দুটি ঘটনাকে মেলানোর চেষ্টা করলাম। মিলল না। পৃথিবী কত এগিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবী ঠিক কতটা এগিয়েছে তা ভারতবর্ষ থেকে ততটা বুঝবার উপায় নেই। এদেশে বোয়িং চলে, রকেট উৎক্ষেপণের চেষ্টা হয়, পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আবার এদেশে কাঁচা রাস্তায় গোরুর গাড়ি চলে, গাঁয়ের মেয়েদের পাঁচ মাইল দূর থেকে পানীয় জল আনতে হয়। এরকম সহাবস্থান আর কোথাও তেমন দেখা যাবে বলে মনে হয় না। যাই হোক, ভারতবর্ষে প্রগতিশীল দুনিয়ার এক একটা তরঙ্গ এসে লাগে বটে, কিন্তু তার অভিঘাতে কিছুই উলটে-পালটে যায় না। এখানে বিবর্তন ঘটে ওই গোরুর গাড়ির চাকার আবর্তেই।

পৃথিবী কতটা এগিয়েছে সেটা সরেজমিনে দেখার জন্য অন্তত একবার আমার দেশের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাগিদ না থাকলেও।

কিন্তু বিদেশযাত্রার আনন্দ বা উত্তেজনা কোনওটাই বোধ করার অবকাশ জুলাই মাসে আমার ছিল না। উদ্দণ্ড কাজের তাড়ায় আমি তখন আকণ্ঠ ডুবে আছি। অত খাটুনির পর রাতের মোষের মতো ঘুমোই, স্বপ্নও দেখি না।

আমেরিকা থেকে প্রথম আমার তল্লাশ নিতে এল পবু। অর্থাৎ প্রবীর সাহা হাস্যময় সুপুরুষ যুবক। কথা যা বলে তার চেয়ে বেশি হাসে। হাসি দিয়ে কথার অভাব অনেকটা পুষিয়ে দেয়।

প্রথম প্রশ্ন, যাচ্ছেন তো দাদা?

যাচ্ছি।

আমরা কিন্তু ভীষণ অপেক্ষা করছি। কোনও চিন্তা করবেন না, আমরা সব দায়িত্ব নেবো।

পবু এখন মার্কিন নাগরিক। সেখানে বাড়ি গাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসে গেছে। কেন সে মার্কিন নাগরিকত্ব নিল তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি বটে, কিন্তু পরে শুনেছি, প্রথম আমেরিকায় গিয়ে প্রচণ্ড কষ্টে আর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল সে। সেই সময়টায় যথেষ্ট লড়াই করতে হয়েছে নানা বিরুদ্ধতার সঙ্গে নাগরিকত্ব নেওয়ার সময় এসে যেতেই সে তা নিয়ে নিয়েছিল। আসলে নাগরিকত্ব গ্রহণের ফলে চাকরির ক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত হয়। নানা সুযোগ সুবিধেও পাওয়া যায়।

রাত আড়াইটে অবধি লেখাপড়ার কাজ করে শুয়েছি। ভোরবেলা কলিংবেল-এর জরুরী শব্দে প্রায়-কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে দরজা খুলে দেখি, স্বাস্থ্যবান,

বিরলকেশ হাস্যমুখ এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। ঘুম ভাঙিয়েছেন বলে খানিকটা অপ্রতিভ। ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আপনার ঘুমটা ভাঙালুম। কিছু মনে করবেন না। আমি রথীন গাঙ্গুলি, নিউ জার্সি থেকে আসছি।

আসুন, আসুন, বসুন।

উনি খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, না, না, বসলে আপনাকে আরও ডিস্টার্ব করা হবে। আমি শুধু জানতে এসেছি, আপনি বঙ্গ সম্মেলনে যাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ যাচ্ছি, কোনও চিন্তা করবেন না।

আমরা খুবই এক্সপেক্ট করছি।

আমি তাঁকে একরকম জবরদস্তি করেই ঘরে এনে বসালুম। বঙ্গ সম্মেলনের কর্মকর্তা লালমোহন হোড়ের অন্তত খান দুয়েক চিঠি ততদিনে এসে গেছে। সম্মতি জানিয়ে সে দুই চিঠির জবাবও দিয়েছি। তবে যখনকার কথা লিখছি তখন পাসপোর্ট হাতে আসেনি।

রথীনবাবু বিদায় নিলেন।

কয়েকদিন পর অফিসে এসে হাজির রণজিৎ দত্ত।

নমস্কার, আমি রণজিৎ দত্ত। আমেরিকা থেকে আসছি।

আরে, আসুন, আসুন। কী ব্যাপার?

বঙ্গ সম্মেলনে আপনি তো যাচ্ছেন, পাকা খবরটা নিতে এলাম।

কথায় বাঙাল টান এবং ভারি অমায়িক রণজিৎবাবুকে প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে। সংবাদ বিচিত্রা নামে একটি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন আমেরিকা থেকে। সঙ্গে সাদামাঠা চেহারার স্ত্রী। পরে এই বউদিকেই সমারভিলে দেখে আমি চিনতেই পারিনি। পরনে তখন চোস্ত মার্কিন পোশাক এবং মুখে ফটাফট মার্কিন ইংরিজির ট্যা-রা-ট্যাট-ট্যাট সাবমেশিন গান।

এল ধ্রুব কুণ্ডু।

দাদা, আপনি যাচ্ছেন তো। ওখানে কিন্তু আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

যাচ্ছিরে ভাই, যাচ্ছি। না গিয়ে তো উপায় নেই দেখছি।

হাইনরিখ ব্যোল-এর একখানা গল্পে সেই যুদ্ধে গমনোদ্যোগী ছেলেটার কথা মনে পড়ল। তাকে যুদ্ধে যেতেই হচ্ছে। সারাদিন শহরে কেবলই ভ্যাপোঁর ভ্যাঁপ ভ্যাপোর ভ্যাঁপ যুদ্ধের বাজনা বাজছে আর ছেলেটার মনে হচ্ছে বাজনার শব্দ বলছে, আমি কি তবে, আমি কি তবে যাবোই?

আমারও সেই অবস্থা। আমি কি তবে আমি কি তবে যাবোই। সাহেবদের দেশে যাবোই তাহলে? কোনও বাধা এসে দাঁড়াবে না তো! যাওয়ার আগে কোনও অসুখ হয়ে বসবে না তো! হঠাৎ পড়ে-টড়ে গিয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে যদি শয্যা

নিতে হয় ? যদি....না থাকগে। এত যদির ওপর তো কিছুই রচনা করা যায় না।

কিন্তু ওদিকে নিউ জার্সি থেকে লোকজন ও চিঠিপত্র প্রচুর আসতে শুরু করল। শমিতা দাশগুপ্ত লিখলেন, তাঁরা অপেক্ষা করছেন—খুবই অধীর আগ্রহে। লোক মারফত রমেন পাইন জানালেন, ওয়াশিংটনে তাঁর অতিথি হতে হবে। ইত্যাকার আরও।

সাগরদা ('দেশ' সম্পাদক সাগরময় ঘোষ) জ্যোতিষদাকে ('দেশ' পত্রিকার প্রধান পরিচালকদের একজন) ডেকে বললেন, শীর্ষেন্দু তো আমেরিকা পালাচ্ছে। যাওয়ার আগেই পুজোর লেখাটা আদায় করে নেবেন কিন্তু। সেই নির্দেশানুযায়ী ভালমানুষ নিরীহ অজাতশত্রু জ্যোতিষদা হঠাৎ এমন কালাপাহাড় হয়ে আমাকে তাগাদায় তাগাদায় অস্থির করে তুললেন যে, আমি ওই নিরীহ মানুষটির মধ্যে চেঙ্গিস, আইভ্যান দি টেরিবল এবং ড্র্যাকুলার সংমিশ্রিত রূপ দেখতে লাগলুম।

রমাপদদা (আনন্দবাজার পুজো সংখ্যার কাণ্ডারী) মাথা নেড়ে হতাশ গলায় বললেন, আমেরিকা যাচ্ছেন। পুজো সংখ্যার লেখার তাহলে বারোটা বাজল!

আমার নিকটতম সহকর্মী হলেন কবি সুনীল বসু। আমার পাশেই বসেন। অমন সজ্জন মানুষ হয় না। কিছুটা অন্যমনস্ক, সরল, আপনভোলা লোক। তিনি শুনে হঠাৎ একদিন হাহাকার সহযোগে বলে ফেললেন, তুমিও আমেরিকা যাচ্ছো। তাহলে আর বাকি রইল কে ?

বাঙালিদের এত টাকা হয়েছে যে, দেশ থেকে লেখক নিয়ে যাচ্ছে। অনেকের এই বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। ব্যাপারটা বিস্ময়েরই। কারণ দেশী বাঙালিদের যা হেরো চেহারা, গোটা দেশের তুলনায় তাদের যা লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা তাতে বাঙালিদের এলেম সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনকি বিদেশেও বাঙালি গিয়ে টাটা-বিড়লা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন নয়। সেখানেও বাঙালিরা মোটামুটি চাকুরিজীবী। দুচারজন ব্যবসা-ট্যাবসা করেন বটে, কিন্তু গুজরাতি ও পাঞ্জাবিদের তুলনায় কিছুই নয়। বিশেষ করে গুজরাতি সম্প্রদায় আমেরিকা আর ব্রিটেনে ব্যবসার যে মায়াজাল বিস্তার করে ফেলেছেন তাতে তাঁরা সেখানকার ভূমিপুত্রদেরও ঈর্ষার পাত্র।

তবে হ্যাঁ, লেখাপড়ায়, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী লাইনে বাঙালি এখনও কিছুটা সমীহ আদায় করে নেয়। তার প্রতি সরস্বতীর কিছু নেকনজর থাকলেও লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি বিশেষ নেই। লক্ষ্মী কোনও দিনই বাঙালিদের তেমন পছন্দ করেন না।

বাঙালি বলতেই তাই আমাদের চোখের সামনে 'মধ্যবিত্ত' কথাটাই নেচে ওঠে। বাঙালি মানেই মধ্যবিত্ত। উচ্চবিত্ত বাঙালির সংখ্যা এমনই অঙ্গুলিমেয় যে তাঁদের হিসেবের মধ্যে ধরার দরকারই নেই। আর এই যে বাঙালির আমূল মধ্যবিত্ততা তারও কারণ তার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। হায়রে বাঙালি যদি

কোনও সুযোগে কিছু টাকা করতে পারে তাহলেই তার 'আরও টাকা' করার ইচ্ছেটা অবলুপ্ত হয়। ঝোঁক আসে টাকাটা ওড়াবার পন্থা খুঁজতে। এক্সপ্যানশান-এর দিকে তার কোনও আগ্রহ নেই। কয়েক লাখ টাকা জমে গেলেই তার মনে হয় 'অনেক হয়েছে'। লন্ডনের ওয়েম্বলেতে নিয়ে গিয়েছিল বন্ধু ভাস্কর দত্ত। বলেছিল, চল গিয়ে দেখবি, গুজরাতিরা কেমন কলোনাইজেশন করে ফেলেছে। বাস্তবিকই ওয়েম্বলেতে গিয়ে নিরঙ্কুশ গুজরাতি সাম্রাজ্য দেখে আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ। গোটা চত্বরটাই তারা বাঘের থাবায় দখল করে রেখেছে। কে বলবে এটা লন্ডন। গুজরাতি দোকানে গোটা রাস্তা ছয়লাপ, সাহেব-মেমদের ছায়াটুকু পর্যন্ত সেখানে নেই। এদের বেশির ভাগই অবশ্য আফ্রিকার অভিবাসী ছিলেন। সেখানকার রাজনৈতিক সামাজিক স্থিতিশীলতার অভাবে ইংলন্ডে এসে নতুন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়েছেন। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য এঁদের কল্যাণেই এখন রমরমা। এঁদের কল্যাণেই বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা ভারতে আসছে। উপরন্তু ইংরেজরা যে এদেশে দুশো বছর ধরে শাসন করেছিল তার কিছু প্রতিশোধও তো এঁরা নিচ্ছেন। প্রশাসনিক দিক দিয়ে না হলেও অর্থনীতিতে এঁরা তো ব্রিটেনকে অনেকটাই দখল করে আছেন। আমেরিকাতেও কয়েকটা ব্যবসা গুজরাতিদের একচেটিয়া। ইন্ডিয়ান শপ বলতেই গুজরাতিদের দোকান। এসব দোকান সস্তা ও সততার জন্য সুখ্যাত। আমি সেখানে সাহেব-মেমদের ভিড় প্রত্যক্ষ করে ভারি প্রীত হয়েছি।

গুজরাতি এবং পাঞ্জাবিরা হলেন পয়সাওয়ালা ভারতীয়। এঁরাও নানা উপলক্ষে দেশ থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে যান। তবে এঁদের ব্যবস্থাপনা অনেক বিরাট। লাখো লাখো ডলার পাউন্ড তাতে খরচ হয়। আর সেইসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন সেইসব লোকেরাই যাঁদের নাম ভীমসেন যোশি, রবিশঙ্কর, লতা মঙ্গেশকর, অমিতাভ বচ্চন বা ওইরকমই।

তা গুজরাতিরা গুজরাতিদের মতো করবে, বাঙালিরা বাঙালিদের মতো। দুপক্ষের তুলনা করতে যাওয়া বৃথা। তবে বাঙালিরাও যে আজকাল দেশ থেকে লোকজন নিয়ে যাচ্ছে—ওটাই যা বলবার মতো কথা।

তবে কথা উলটো দিকেরও আছে। বরাহূত অনাহূত বাঙালি শিল্পীদের হঠাৎ হঠাৎ গিয়ে হাজির হওয়া প্রবাসী বাঙালিদের কিছু শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্প্রতি। দেশ দেখা বা বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন বা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়া ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যেই এঁরা নিজের গরজে গিয়ে হাজির হন। ঢালাও বিদেশী মুদ্রা না থাকায় এঁদের নির্ভর করতে হয় বাঙালিদের ওপরেই। একই শিল্পী বারবার যাওয়ার ফলে ব্যাপারটা একটু ঘাড়ে-চাপার মতো দাঁড়িয়ে যায়। কাঁহাতক একইরকম গান বারবার দশ ডলারে টিকিট কেটে তাঁরা শুনবেন?

শুধু টিকিট কাটাই তো নয়, গোটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা, খাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত, বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করে দেওয়া ইত্যাদির ঝামেলাও কম নয়। দুঃখের বিষয় সাহেব-মেমদের দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে এঁরা পান না। কাজেই নির্ভর করতে হয় বাঙালিদের ওপরেই। বিদেশে চাকুরিজীবী বাঙালিদের না আছে তত টাকা না আছে তেমন সময়। তবু গিয়ে কেউ হাজির হলে এঁরা তাঁকে ফেলেন না। সাধ্যমত সাহায্য করেন।

কোনও পক্ষকেই দোষ দেওয়ার নেই। এই দেশে শিল্পী কলাকার অনেক, তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের জ্ঞানী-গুণীরও অভাব নেই। সকলেই যে প্রাপ্য মর্যাদা, অর্থ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পান তা তো নয়। এদেশের অনেক প্রথম শ্রেণীর গায়ক বাদক কলাকারকেও পেটের দায়ে চাকরি তো বটেই, উঞ্ছবৃত্তিও করতে হয়। এঁরা যদি শ্যামখুড়োর সব পেয়েছির দেশে গিয়ে কিছু একটা করতে চান তাহলে দোষের কী ? মুশকিল হল স্পনসর নিয়ে। তেমন জোরদার মালদার স্পনসর না জুটলে ওদেশে গিয়ে যে কী কষ্ট পোয়াতে হয় তা ভুক্তভোগীরা ভালই জানেন। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে তেমন স্পনসর পাওয়া খুবই কঠিন। তাঁরা যদি বা গায়ককে বা বাদককে স্পনসর করতে পারেন, তবলচিকে পেরে ওঠেন না। একটা নাটকে যদি পনেরোজন কুশীলব থাকে তো এঁরা হয়তো পাঁচজনকে বড় জোর স্পনসর করতে পারেন। আর একটা বিপদ হল, এদেশ থেকে যাঁরা এরকম ভাগ্যান্বেষে যান তাঁরা অনেকই চান ওদেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যেতে। ফলে উদ্ভব হয় নানারকম জটিলতার। প্রবাসী বাঙালিরা এরকম জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে চান না স্বাভাবিক কারণেই।

নিউ ইয়র্কে একটা বাঙালি পরিবারের বাড়িতে বেসমেন্টের ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে একটি মেয়ে। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। বোম্বের বাঙালি। কয়েক বছর আগে সে নিউ ইয়র্কে চলে এসেছে, বাকি জীবন এখানেই কাটাবে, হয়তো এককভাবেই। তার পেশা গান গাওয়া এবং শেখানো। সে অবাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের গজল-টজল শেখায়, ফাংশনে গান গেয়েও তার রোজগার হয়। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তুমি ভাই, আমেরিকাতেই থাকতে চাও কেন ?

সে খুব সরল হাসি হেসে বলল, আমার এদেশ ভীষণ ভাল লাগে।

দেশের জন্য কষ্ট হয় না ? মা বাবা, ভাইবোনের কথা মনে হয় না ?

হয়, তবে মাঝে মাঝে তো যাবোই।

এই মেয়েটি সাহসী। খুবই সাহসী। সে আমেরিকায় আছে, অথচ হেলথ ইনসিওরেন্স করেনি। তার মানে সামান্য অসুখ-বিসুখ করলেই হাজার হাজার ডলার লেগে যাবে চিকিৎসার ধাক্কায়।

মেয়েটি হাসিমুখেই বলল, গানবাজনার সূত্রে আমার অনেক ডাক্তার চেনা। চিকিৎসায় আমার পয়সাই লাগবে না।

মেয়েটির রূপ নেই বটে, কিন্তু স্বভাবটি চমৎকার। সে বাংলা বলতে পারলেও লিখতে বা পড়তে পারে না। তাছাড়া বোম্বাইতে তাদের তিন পুরুষের বাস। সে আমার লেখা তো পড়েইনি, এমনকি নামও শোনেনি। তবু একজন বাঙালি লেখককে দেখে সে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাল তাতে কোনও কৃত্রিমতা নেই।

বলল, আপনার লেখা পড়িনি, তাতে কি ? আপনি গুণী মানুষ তো, আমাকে একটা অটোগ্রাফ দিন।

নিউইয়র্কে একটা দোকানে বেশ দরাদরি করে জিনিসপত্র কেনার চেষ্টা করছিলাম একদিন। দোকানটার মালিক স্প্যানিশ। বেশ ফেরেব্বাজ লোক। দরাদরি এবং ব্যবসায়িক কথাবার্তায় বেশ কাহিল হয়ে হার মানতে বসেছি, ঠিক এমন সময় কাউন্টারের ওপাশ থেকে কেউ আমার কানে কানে পরিস্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, দাদা কি বাংলাদেশী নাকি ?

আমি পিছনে তাকিয়ে যাকে দেখলাম সে দোকানের একজন কর্মচারী।

আমি বাংলাদেশী নই, তবে ঢাকাই বাঙাল। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে ভারতীয় বাঙালি। নিবাস কলকাতা বা শিলিগুড়ি। মাথা নেড়ে বললুম, না, কলকাতার।

ছেলেটির বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়। দেশভাগের ব্যাপারটা সে তেমন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে না। তবু বাঙালি বলেই বোধহয় সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, এরা অতি খচ্চর লোক। কেটে পড়ুন।

খুব পাজি বুঝি!

খুব।

তুমি এদের খপ্পরে পড়লে কিভাবে ?

ছেলেটা যে দেশী ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলছে তা লক্ষ করেই দোকানদার চড়া গলায় একটা ধমক মেরে ছেলেটাকে বেসমেন্টে পাঠাল কোনও জিনিস আনার ছুতোয়।

মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামেও ক্যান্টিনে বসে খাচ্ছি একজন স্টুয়ার্ডকে দেখে কেমন যেন মনে হল, বাঙালি। বাঙালির চেহারায় তেমন কোনও জাতিগত বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কেন যেন চেনা যায়। খানিকক্ষণ বাদে সেই লোকটা চলে এল আমাদের কাছে, দাদা কি বাংলাদেশী ? পরে জেনেছি দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর ইনি মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন।

এরকম বাংলাদেশী অনেকের সঙ্গেই পথেঘাটে নানা সূত্রে পরিচয় হয়েছে। আমেরিকায় বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যা এখন বিরাট। কেন এবং কিভাবে তাঁরা চলে এলেন তা স্পষ্ট করে বোঝা মুশকিল। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক অস্থিরতা এর মুখ্য কারণ হতে পারে। এঁদের অনেকেরই ইমিগ্র্যান্ট ভিসা বা গ্রিন কার্ড নেই। কারও কারও বা বৈধ ছাড়পত্রেরও অভাব

রয়েছে। এঁরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আশা নিয়ে জীবনসংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ঘণ্টায় তিন ডলার পঁচাত্তর সেন্ট সেখানকার ন্যূনতম মজুরি। কিন্তু বৈধ কাগজপত্র না থাকায় এঁদের কম মজুরিতে খাটিয়ে নিচ্ছে চতুর ব্যবসায়ীরা। এই বঞ্চিতদের মধ্যে বাংলাদেশীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে পোর্টোরিকান বা দক্ষিণ আমেরিকার আরও অনেক লোক। ভারতীয়ও বেশ কিছু আছে। কিছুদিন আগে এক উদার ক্ষমাশীলতায় এঁদের অনেককেই মার্কিন নাগরিক করে নেওয়া হয়েছে। বাকি আছে আরও বহু সংখ্যক ভাগ্যান্বেষীর ভাগ্য নির্ধারণ। আপাতত লুকিয়ে চুরিয়ে পুলিশের নজর এড়িয়ে গা-ঢাকা দিয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের অতিকায় লিফটে নানা ভাষায় 'স্বাগতম' কথাটি লেখা আছে। গুরুত্বপূর্ণ আরও নানা জায়গায় বাংলা ভাষা স্বীকৃত ও সম্মানিত একটি রাষ্ট্রভাষা। এটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের জন্যই। একটি রাষ্ট্রের জাতীয় ভাষা বাংলা, আপাতত এটাই আমাদের কিছুটা গৌরব বৃদ্ধি করে। নইলে পশ্চিমবঙ্গের দুর্বল বাঙালিদের জন্য ভয়েস অফ আমেরিকা বা বি বি সি ব্যয়বহুল বাংলা সার্ভিস চালু রাখত না। বাংলা নিয়ে মাথাব্যথাও ছিল না কারও।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। প্রবাসী বাঙালিরা তাঁদের বঙ্গ সম্মেলনে একজন বাঙালি লেখক এবং প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি করকে নিয়ে যাচ্ছেন—এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনাই বটে। আমেরিকার রাউন্ড ট্রিপ টিকিটের দাম প্রায় পনেরো হাজার টাকা। খুব কম নয়। বাঙালির মাথাপিছু গড় আয় বাড়লেও পনেরো হাজার টাকা এখনও অনেক টাকা। লালমোহন হোড়—অর্থাৎ লালুদা যে প্রোগ্রাম পাঠালেন তাতে দেখলুম, আমাকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে আধঘণ্টার জন্য একটি বক্তৃতা দিতে হবে। চিন্তামণিদার বরাদ্দ সময়ও তাই। মাত্র আধঘণ্টার জন্য এত ঝামেলা পোয়াবেন তাঁরা। এত খরচ করে। আমার ভাষণের দাম যে এত তা তো আমার জানা ছিল না!

ককটেল ডিনার জাতীয় আমন্ত্রণ আমি পারতপক্ষে এড়িয়ে যাই। কারণ যে মদ খায় না তার পক্ষে ককটেলে হাজির থাকা ভারি কষ্টকর অভিজ্ঞতা। অন্যেরা যখন মদের পাখনায় ভর দিয়ে ক্রমে ক্রমে 'হাই' হতে থাকে তখন আমি থেকে যাই আমার সুরাহীন 'লো' লেভেলে। কমিউনিকেশন গ্যাপ দেখা দেয় এবং শেষে আমার হাই উঠতে থাকে একঘেয়েমিতে। সফট ড্রিংক পান করে করে গলা অবধি হয়ে যায়। আর ডিনারের ব্যাপারটাতেও বিশেষ সুবিধে হয় না। কারণ হোটেল ক্লাব ইত্যাদিতে পেঁয়াজবিহীন নিরামিষ পদ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। আগে থেকে বলা-কওয়া থাকলেও শেষ অবধি দেখা যায়, মটরপনিরে পেঁয়াজ, চিজ মসালায় পেঁয়াজ, স্যালাডে পেঁয়াজ। ফলে প্রায় অভুক্তই থেকে যেতে হয়।

আগে– অর্থাৎ কিছুকাল মাত্র আগেও কেউ মদ খায় শুনলে সেটাই হত ঈষৎ

বিস্ময় ও বিরক্তির ব্যাপার। এঃ, লোকটা মদ খায়! আজকাল হয়েছে উল্টো। মদ খায় না শুনলেই লোকে ভ্রূ আকাশে তুলে বলে, সে কী! ড্রিংক করেন না! ওমা! কেন?

একে মা মনসা তায় আবার ধোঁয়ার গন্ধ। মদ খাই না বলে গঞ্জনা শোনবার পরই যখন আমাকে কবুল করতে হয় যে, আমি মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুনও খাই না তখন লোকে এমনভাবে তাকায় যেন 'উফো' দেখছে।

এইসব নানা কারণেই ককটেল ডিনারে যাওয়া আজকাল ছেড়েই দিয়েছি। তবু সামাজিক জীব হিসেবে কোথাও কোথাও না গিয়েও উপায় থাকে না। আমেরিকা থেকে আগত যারা—অর্থাৎ প্রবীর সাহা আর তার বউ সুমিতা যখন লেক ক্লাবে ককটেল ডিনারে ডাকল তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হল। পরিবেশটা প্রথমটায় বেশ মনোরমই ছিল। বন্ধুরা হুইস্কি এবং আমি কোল্ড ড্রিংকস খেয়ে যাচ্ছি, লেকের ওপর চাঁদ, মিষ্টি বাতাস, ঘাসের লন সবই বেশ অনুকূল ছিল। কিন্তু এক নামডাকওয়ালা শিল্পী-বন্ধু সামান্য একটু পান করার পরই ঘ্যান ঘ্যান শুরু করলেন, আমার আমেরিকা যাওয়া নিয়ে। ব্যাপারটা বোধহয় তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। অফ অল পারসনস এ কেন যাবে? প্রথমটায় রঙ্গরসিকতার লেভেলটা ছিল, তারপর শুরু হল প্রায় নাগা-নৃত্য। তাঁর বচনাবলীর সাদা অর্থ দাঁড়ায়, আমার আমেরিকায় শীর্ষেন্দু কেন যাচ্ছে?

আমারও মনে হচ্ছিল, বাস্তবিক, অন্যের আমেরিকায় আমার যাওয়ার দরকারটাই বা কী? না গেলেই তো হয়। বিস্তর ঝামেলা থেকে বেঁচে যাই।

রুটি, ট্যাঁড়সভাজা, কোল্ড ড্রিংকস আর বন্ধুর আক্ষেপে সেই সন্ধের চাঁদ প্রায় চোখের জলে ভেসে গেল। আমেরিকা যাচ্ছি বলে আমারও ভারি দুঃখ হতে লাগল।

হৃৎপিণ্ডে দামামা বেজেই যাচ্ছে, আমি কি তবে, আমি কি তবে যাবোই?

আমার বন্ধু সিরাজ—অর্থাৎ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ—খুব মিটি মিটি হাসতে লাগল আর বলতে লাগল, আশি সালে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তোকে যা যা বলেছিলুম তুই তার এক বর্ণও বিশ্বাস করিসনি! এবার গিয়ে দেখে আয়, তারপর বলিস ঠিক বলেছিলুম কি না। হাঁ হয়ে থাকবি রে, হাঁ হয়ে থাকবি।

আমি তাকে বললুম, যদি তারা আমাকে হাঁ করাতে না পারে তাহলে ফিরে এসে তোকে তুলোধোনা করব, মনে রাখিস।

সিরাজের সঙ্গে আমার ঝগড়া-কাজিয়া দীর্ঘদিনের। আমরা যখন বেশ ছেলেমানুষ তখন সন্ধেবেলায় কফি হাউস থেকে আমাদের তর্কযুদ্ধ শুরু হত, সেটা শেষ হত হ্যারিসন রোডে আমার মেসবাড়িতে এবং নিশুত রাতে। তখন ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যেত এবং সিরাজ গজ গজ করতে করতে পায়ে হেঁটে তার এন্টালির

বাসায় ফিরত। আমেরিকা নিয়ে আনন্দবাজারের নিউজ টেবিলে সেই আশি সালে আমাদের কম লড়ালড়ি হয়নি।

পরে বুঝেছি, আমেরিকাকে নানান চোখে দেখা যায়। ভাল চোখে, মন্দ চোখে। আসলে আমেরিকা নানান রকমের।

ইস্ট কোস্ট ওয়েস্ট কোস্ট দুটোই দেখে আসব। এমন একটা আশা পোষণ করছিলুম। এক ঢিলে অনেক পাখি। প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, লস এঞ্জেলস ইত্যাদি। আমেরিকার বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণার অভাব হয়তো ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল ওদেশে ভ্রমণ ব্যয় সম্পর্কে অজ্ঞতা।

ধ্রুব আমার প্রোগ্রাম শুনে চোখ কপালে তুলে বলল, দাদা, লন্ডন থেকে নিউইয়র্কের যা দূরত্ব, নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেসও তাই। এমনকি সময়টা পর্যন্ত আলাদা। তবে নিতান্তই যদি যেতে চান তাহলে যাবেন।

আমি একটু ব্যোমকে গেলুম। সারাক্ষণ পাঁচশো কুড়ি ডলার দিয়ে গোটা আমেরিকাকে মাপজোক করে যাচ্ছি। তার মধ্যেই কেনাকাটা, তার মধ্যেই ঘোরাফেরা। তাই সতর্ক হয়ে বললুম, আচ্ছা সে ওখানে গিয়ে ঠিক করা যাবে'খন।

ধ্রুব বলল, সেই ভাল।

বাঙালির নেমন্তন্ন, সুতরাং বেহিসাবী কল্পনার লাগাম ছাড়া ঠিক নয়। কাজেই স্বপ্নের পোলাওতেও ঘি ঢালতে কার্পণ্য করতে লাগলুম।

ধ্রুব অবশ্য আশ্বাস দিয়ে বলল, আমেরিকা অনেক বড় দেশ। গোটা আমেরিকাকে সাপটে গেলা শক্ত। তবে নিউ জার্সির কাছাকাছি শ পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যা যা আছে তা আমরাই দেখিয়ে দেবো। ওটা তো আমাদেরই দায়িত্ব। আর ডলার নিয়ে বেশি ভাববেন না। যদি কম পড়ে যায় তাহলে আমরা তো আছিই।

বলতে লজ্জা নেই নিউইয়র্ক নামটি বহুদিন যাবত আমার ভিতরে বিদ্যুতের মতো ক্রিয়া করে। ওই আজব নগরীর আকাশ রেখার যে ছবি অজস্রবার দেখছি বা গল্প শুনেছি বা চলচ্চিত্রে প্রত্যক্ষ করেছি ততবারই মনে হয়েছে, আহা, যদি একবার যেতে পারতুম।

খোদ আমেরিকাতেই এমন সাহেব অনেক আছেন যাঁরা কদাচ নিউইয়র্ক যাননি। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে যেমন "কানু বিনা গীত নাই", অর্থাৎ কলকাতা ছাড়া গতি নাই, আমেরিকায় তো তেমন নয়। এখানে লেখাপড়া, চিকিৎসা, কেনাকাটা, বেড়ানো সব কিছুর জন্যই দেশসুদ্ধ লোক কলকাতার দিকে চাতকের মতো চেয়ে আছে, আমেরিকায় তা তো নয়। সেখানে নিতান্ত একটা গেঁয়ো শহরেও সব কিছুই পাওয়া যায়। অঢেল জিনিসপত্র, প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা,

লেখাপড়ার ঢালাও ব্যবস্থা। নিউইয়র্কের মুখাপেক্ষী থাকার দরকারই নেই।

তাছাড়া নিউইয়র্ক এবং গোটা আমেরিকার মধ্যে চরিত্রগত ফারাকও অনেক। চোর-গুণ্ডা পকেটমার গণিকা ঠকবাজ ভিখিরিতে আকীর্ণ নিউইয়র্কের সঙ্গে হাডসন নদীর ওপারের নিউ জার্সিরই কত না পার্থক্য। নিউইয়র্কের নরক থেকে সে যেন ইডেনের স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ। এ আমার কথা নয়, আমেরিকাবাসীদেরই কথা।

তবু নিউইয়র্ক বহুকাল ধরে আমার সামনে দিল্লিকা লাড্ডু হয়ে দোল খাচ্ছিল। জন্মের শোধ সেই নিউইয়র্কটা একবার দেখা হয়ে গেলে আর কিছু দেখা হোক বা না হোক ক্ষতি নেই। ধ্রুবকে সেই কথাটাই বললুম।

ধ্রুব হেসে উঠে বলল, নিউইয়র্ক আপনাকে রোজ দেখাবো। সবটা দেখাবো।

ধ্রুব তার কথা রেখেছিল। নিউইয়র্কের পথে পথে তার সঙ্গে বিস্তর ঘুরেছি। আর ঘুরেছি সুমিত্রা বউদির সঙ্গে। নিউইয়র্কে আমার সঙ্গী হয়েছে সুপ্রিয়, প্রবীর, ভবানী আর আলোলিকাও। তবে নিউইয়র্ক শহরটার বিশালত্ব এই কলকাতায় বসে কল্পনা করে ওঠাও কঠিন। ব্রুকলিন, ব্রংকস, কুইনস ম্যানহাটান আর স্ট্যাটেন আইল্যান্ড মোট এই পাঁচটি বরো নিয়ে নিউইয়র্ক। যে কোনও একটি বরো গোটা কলকাতাকে গ্রাস করে বসে থাকতে পারে। নিউইয়র্কে কটা কলকাতা ভরা যাবে আমি সঠিক জানি না, তবে এক রাতে কুইনসের জ্যামাইকা অ্যাভেনিউতে পথ হারিয়ে মাইল কুড়ির পাল্লায় উজান-ভাঁটেন করতে হয়েছিল। ভয়াবহ নিউইয়র্কের নিশুত রাতে গা-ছম-ছম পরিবেশে প্রবীরের গাড়িতে বসে আমার জ্ঞানোদয় হল, জ্যামাইকা অ্যাভিনিউয়ের মতো লম্বা রাস্তা কলকাতায় তো একটিও নেই। কুড়ি মাইল পর্যন্তও জ্যামাইকা অ্যাভেনিউয়ের শেষ দেখতে পাইনি। তাহলে কুইনস এলাকাটা কত বড় ? ভাবতে ভাবতে কলকাতা-গর্বী আমি বিস্ময়ে জবুথবু হয়ে পড়েছিলুম।

তবু বলি নিউইয়র্কের সবটা দেখে ওঠা নিউইয়র্কবাসীর পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠে না। ধ্রুব যখন কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে নিউ ইয়র্কের পাশ কাটিয়ে নিউ জার্সিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে বলেছিল, দাদা, আমি রোজ নিউইয়র্কে আসি, রোজ নানা এলাকায় ব্যবসার খাতিরে ঘুরে বেড়াতে হয়, তবু রোজই নিউইয়র্ককে নতুন রকম লাগে। এ এক অদ্ভুত শহর। কিছুতেই চিনে ওঠা যায় না।

নিউইয়র্কে শুধু রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াতেও এত ভাল লাগে, এত কিছু চোখে পড়ে, এত কিছু চমকে বা অবাক করে দেয় যে, নিজেকে বড্ড গাঁইয়া লাগতে থাকে। সোঁদর বন থেকে হঠাৎ কলকাতায় এসে পড়লে যেমনটা লাগে আর কি !

আমি মফস্বলের ছেলে। পূর্ববঙ্গে জন্মানোর পর বাল্য-কৈশোর কেটেছে বিহার উত্তরবাংলা আসামের পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা রেল কলোনিতে। ভারি জনবিরল সব জায়গা। কলকাতাতেও বাল্যকালের কিছুটা সময় কেটেছিল বটে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা তেমন গভীর নয়। মফস্বলে মফস্বলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে খুব ইচ্ছে হত, বড় হয়ে আমি কলকাতায় থাকব। মাঝে মাঝে বেড়াতে-টেড়াতে কলকাতায় এলে ভারি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। টিকিওয়ালা ট্রাম, চলন্ত বাড়ির মতো দোতলা বাস, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, মনুমেন্ট, হাওড়ার ব্রিজ, আর কী গিজগিজে ভিড়, আর কত না রঙিন দোকানপাট। এরকম জায়গা আর কোথায় আছে। এখানে যে রোজ রাসের মেলা, নিত্য রথযাত্রার ভিড়।

বড় হয়ে যখন কলকাতায় থানা গাড়লুম তখনও মনে হয়েছে, বাস্তবিক এরকম জায়গা আর নেই। ত্রিশ বছরের ওপর টানা কলকাতায় বাস করেও আজ অবধি আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ঢুকিনি, মনুমেন্টের মাথায় চড়িনি, ফিয়ার্স লেনে যাইনি। তবু কলকাতা এখনও সম্মোহিত রাখতে পারে আমাকে। কিন্তু নিউইয়র্ক দেখার পর কলকাতা আমার কাছে নিতান্তই সুতানুটি-গোবিন্দপুর হয়ে গেল। এমনকি লন্ডন দেখে অবধি আমি নাক কুঁচকেছিলুম, এই লন্ডন।

লালুদা—অর্থাৎ লালমোহন হোড় জরুরী বার্তা পাঠালেন, ডি সি পি এল-এ গিয়ে যেন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করি। তিনিই টিকিটের ব্যবস্থা করবেন।

পূর্বতন কুলজিয়ান কোম্পানিই এখন ডি সি পি এল। মালিক সাধন দত্ত। ধনী বাঙালি সফল বাঙালির মুষ্টিমেয়তার মধ্যে সাধন দত্ত একজন। মাল্টি ন্যাশনালের মালিক। বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাঁর কাটে ফিলাডেলফিয়ায়। অতি সজ্জন মানুষ। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত ও ভ্রমণশীল মানুষদের তালিকায় তাঁর নামটিও যুক্ত হয়ে থাকে। পার্ক স্ট্রিটে তিনখানা বাড়ি নিয়ে ডি সি পি এল-এর অফিসটি দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

মার্কিন বাঙালিরা তাঁকেই আমার স্পনসর করেছেন।

ভাগ্যক্রমে ডি সি পি এল-এর কর্মী তরুণ কবি মৃণাল দত্ত। তাকে ধরলুম, ভাই ছোটাছুটি করার সময় আমার হাতে নেই। পুজোর লেখা শেষ করে যেতে হবে। তুমি সহায় হও।

সে সানন্দে সহায় হল। পাসপোর্টটা তার হাতে তুলে দিতে পেরেছিলুম যাত্রার মাত্র কয়েকদিন আগে। এয়ার ইন্ডিয়ার সুদীপ্ত অন্য দিক থেকে মদত দিতে লাগল। তারপর আমাকে আর বিন্দুমাত্র ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। টিকিট সমেত তিন তিনটে ভিসা মাত্র দু দিনে হয়ে গেল।

সেটা কথা নয়। চিরকালই কিছু গেঁতো লোকের ঝঞ্ঝাট অন্যেরা পোয়ায়। আমার ঝঞ্ঝাটটা হচ্ছিল মানসিক দিক দিয়ে। শেষ অবধি নিউইয়র্ক যাচ্ছি তো!

নেগেটিভ জ্যোতিষীদের কথা কোনও কারণে ফলে যাবে না তো। পজিটিভ জ্যোতিষীরা আমাকে স্তোকবাক্য দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করেননি তো।

· আরও কিছুকাল আগে, যখন বিদেশযাত্রার প্রবল ইচ্ছেটা মাথা খুঁড়ে মরে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে তখন আমি প্রায়ই রাতে স্বপ্ন দেখতুম, হয় লন্ডন না হয় আমেরিকার কোথাও চলে গেছি। আর সে এমন খুঁটিনাটি সহ স্বপ্ন যে, স্বপ্ন বলে মনেই হত না। একবার দেখলুম, ব্রিটেনে এক রেললাইনের ধারে বসে আমরা কয়েকজন কাঠের উনুনে রুটি সেঁকছি, ভীষণ খিদে, পকেটে পয়সা নেই। ঘুম ভাঙার পর কিছুতেই বিশ্বাস হল না যে, স্বপ্ন দেখেছি। ভাবলুম, এই ঘুম ভাঙাটাই স্বপ্ন। আর একবার আমেরিকায় ছুটন্ত বাসে বসে যেতে যেতে বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলুম, এটা কিছুতেই স্বপ্ন হতে পারে না। আর সেই চেঁচানিতেই ঘুম ভেঙে উঠে বসে বেকুবের মতো চেয়ে রইলুম অন্ধকার কোলে নিয়ে।

ইদানীং স্বপ্ন দেখছিলুম না। কিন্তু বাস্তব ঘটনাটা যত কাছে এগিয়ে আসতে লাগল তত অবিশ্বাস হতে লাগল। এ এক দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নই নয় তো।

আনন্দবাজার পত্রিকায় বছর কয়েক আগে একটা ধর্মঘট চলেছিল কিছুদিন। বাড়ি বসে বসে তখন আর সময় কাটে না। সেই সময়ে হঠাৎ এক দুপুরবেলা একজন গাঁট্টাগোঁট্টা লোক এসে হাজির। বলল, আমি হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি। দিল্লি থেকে একটা মেসেজ এসেছে, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি অবধি আপনি নাকি আমেরিকা থাকবেন।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, না, এরকম কোনও খবর তো আমার জানা নেই।

লোকটা পকেট থেকে একটা টাইপ করা কাগজ বের করে একটু দেখে নিয়ে বলল, এই তো পরিষ্কার লেখা আছে। আপনি আমেরিকা যাচ্ছেন। আমার ওপর ভার দেওয়া হয়েছে আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার।

দীর্ঘকাল শহরে বাস করা সত্ত্বেও এ কথায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। হতেও পারে, আমাকে হয়তো আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাইটার্স ক্যাম্পের জন্য বাছা হয়েছে। অফিস বন্ধ বলে খবর পাইনি। চিঠি হয়তো অফিসেই গেছে। তাই নরম হয়ে বললুম, দেখুন, আমি কোনও চিঠি পাইনি, তবে চিঠি আমার অফিসেও গিয়ে থাকতে পারে। তা বলুন কী জানতে চান।

লোকটা একটা নোটবই বের করে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। কোনও কালে পলিটিক্স করতুম কি না, কোনও বিশেষ রাজনীতির প্রতি ঝোঁক আছে কি না ইত্যাদি।

শেষে বলল, দেখুন, আপনার আমেরিকা যাওয়াটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমার দেওয়া রিপোর্টের ওপর। আমি ও কে না করলে আপনার যাওয়া আটকে যাবে।

আমি সবিনয়ে বললুম, তা তো বুঝতেই পারছি।

লোকটা অভয় দিয়ে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, রিপোর্ট আমি ভালই দেবো।

ধন্যবাদ।

এইসব কথার পরও লোকটা উঠতে গড়িমসি করছিল। আমি ভদ্রতা করে লোকটাকে চা খাওয়াবো কি না তাও ভাবছিলুম। তবে বাড়িতে তখন আমি একা। ফলে চা করতে হলে আমাকেই করতে হয়। তাই আর সেই প্রস্তাবে গেলাম না। চায়ের বদলে যথেষ্ট বিনয় ও নম্রতা দেখাতে লাগলুম।

লোকটা অবশেষে বলেই ফেলল, বুঝলেন কিনা দাদা, আমাদের রিপোর্টের অনেক দাম। তাই বলছিলাম এসব কাজে আমরা কিছু পেয়ে থাকি।

'পেয়ে থাকি' কথাটার সরল অর্থ আজকাল বঙ্গভাষী যে কোনও শিশুও বোঝে। তবু আমি গাড়লের মতো চেয়ে থেকে বললুম, আজ্ঞে, ঠিক বুঝলুম না। একটু বুঝিয়ে বলুন দয়া করে।

লোকটা খুব লজ্জার হাসি হেসে বলল, কি আর বলব দাদা, আপনারা শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক। যা হোক কিছু দিন, রিপোর্ট কালই দিচ্ছি জেনে রাখুন।

আমার বাবা দীর্ঘকাল রেলে চাকরি করেছেন, দেদার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ধর্মভীরু মানুষটি কদাচ একটি পয়সাও ঘুষ খাননি বলে চিরকাল আমরা টানাটানির সংসারে মানুষ। মাসের শেষ কাকে বলে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আবাল্য কৈশোর। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হত না বটে, কিন্তু শখ-শৌখিনতার বালাই ছিল না, আর ওই জীবন-যাপন থেকেই ঘুষ সম্পর্কে স্থায়ী অ্যালার্জিরও সৃষ্টি। আমি অবশ্য কোনও কালেই ঘুষ পাওয়া যায় এমন চাকরিই করিনি। প্রথম জীবনে মাস্টার, তারপর সাংবাদিক। ঘুষের বালাই-ই নেই। কিন্তু কেউ ঘুষটুস খায় জানলে তাকে যেন ঠিক মানিয়ে নিতে পারি না। এ লোকটাকে এমন নাঙ্গাভাবে ঘুষ চাইতে দেখে ভারি সঙ্কুচিত বোধ করতে লাগলুম। লজ্জাটা যেন আমারই, ওর নয়।

আবার ভাবছি, ঘুষ না দিলে যদি লোকটা উল্টোপাল্টা লেখে এবং তাতে যদি আমার আমেরিকা যাওয়াটা বানচাল হয়ে যায়।

দুদিক রক্ষা করতে তা বললুম, দেখুন, আমি এখনও পাকা খবর জানি না। তবে খোঁজখবর নিয়ে দেখি, যদি খবরটা সত্যি হয়ে থাকে তখন দেখা যাবে। আপনি সপ্তাহখানেক বাদে আসুন।

ঠিক আছে। বলে লোকটা একটু অসন্তুষ্ট হয়েই যেন চলে গেল।

সেইদিনই আমি ইউ এস আই এস-এর সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। আমেরিকাব যে কোনও সরকারি বা বেসরকারি আমন্ত্রণ তাঁর

মাধ্যমেই এসে থাকে। উনি শুনে-টুনে অবাক হয়ে বললেন, এরকম খবর তো আমাদের কাছে নেই। তুমি আমেরিকা যাবে আর সেটা আমরা জানব না তা তো হতে পারে না। লোকটা কোথা থেকে এসেছিল ?

হোম ডিপার্টমেন্ট।

সুপ্রিয়দা মাথা নেড়ে বললেন, গোলমেলে, খুব গোলমেলে কেস। হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক আসার তো কথাও নয়। দিল্লি থেকেই বা কেন মেসেজ আসবে। তবু দাঁড়াও, খোঁজ নিয়ে দেখছি।

লোকটা কিন্তু ঘুষও চেয়েছিল।

ঘুষ। বলে সুপ্রিয়দা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন, ঘুষ। বলো কী ? তোমার কাছ থেকে ঘুষ চাইছিল। দিয়েছো নাকি ?

না। তবে পরে দেবো বলেছি।

মাই গড ! এ তো চিটিং কেস। এর পর লোকটা এলে হয় স্রেফ ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে, না হয়তো পুলিশ ডাকবে।

সুপ্রিয়টা তবু ভাল করে খোঁজখবর নিলেন, এমনকি দিল্লির মার্কিন-দূতাবাসে টেলেক্স পর্যন্ত করে দেখলেন। না, আমার মার্কিন দেশে যাত্রার কোনও খবর নেই। তবে সে বছর অল্টারনেট ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমার নাম আছে বটে, কিন্তু সেটা পুলিশ বা হোম ডিপার্টমেন্টের এনকোয়ারির পর্যায়ে পড়ে না।

একটু হতাশ হয়েছিলুম, সন্দেহ নেই। তবে ঘুষটা যে দিয়ে বসিনি তার জন্য নিজেকেই অভিনন্দন জানালুম। আমার অধিকাংশ ব্যাপারেই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটা মজ্জাগত ব্যাপার। অন্তত এই ব্যাপারে আমি যে নিজেকে সংযত রেখেছি সেটা ভাগ্যের জোর।

লোকটা অবশ্য আর দ্বিতীয়বার আসেনি।

আর আমারও আমেরিকা যাওয়াটা হয়ে ওঠেনি।

আমেরিকায় গিয়ে আমার আর এক বন্ধুরও বেজায় রঙ ধরে গিয়েছিল। আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে সে চাকরি পেয়ে সে-দেশে যায়। গরিব ঘরের ছেলে, আড্ডাবাজ, নানা গুণের গুণী। বছর চারেক আমেরিকায় বসবাস করে সে যখন ফিরল তখন অন্য মানুষ। মুখে আমেরিকা ছাড়া কথা নেই। এমনকি পানের দোকানদারকে ইমপ্রেস করার জন্য সে পান খেয়ে বলত, কত ডলার ?

আমার সেই বন্ধুর মগজ ধোলাইয়ের এরকম বহর দেখে আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলুম। একটা দেশ কতটা ভাল বা চমকপ্রদ হতে পারে যা একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোকের এতটা পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ?

বন্ধুটি তখন কথায় কথায় আমেরিকার নিরিখে এ-দেশের সবকিছু বিচার এবং নস্যাৎ করত। আমার সঙ্গে তার এ নিয়ে বচসা বড় কম হয়নি। ভাবতুম,

যদি কখনও যেতে পারি তাহলে তোর আমেরিকার গল্পের কাঁথায় আগুন না দিয়ে ছাড়ব না।

কাঁথায় আগুন দেওয়ার জো যখন পেলুম তখন বন্ধুটি আমার হাতের কাছে উপস্থিত নেই। বিশ বছরে সে আর একবার আমেরিকা গিয়ে ফেরত এসেছে এবং আর যাওয়ার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করে এ-দেশেরই কোথাও সাদামাঠা হয়ে বসবাস করছে।

সাদামাঠা বসবাস কথাটা কলম দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটু দর্শন আছে। এ-দেশে আমাদের সাদামাঠা বসবাস করতে হয় বাধ্য হয়ে। তত রেস্ত কতজনেরই বা আছে যারা সাদামাঠা ছাড়া অন্যরকমভাবে বসবাস করবে ?

তনুশ্রী-প্রভাত, কলম্বাসের এই দম্পতীয় ছেলে রানা এখনও স্কুলে পড়ে। তার একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার আছে। কম্পিউটার আছে ধ্রুবর বউ বৃতির। আরও অনেকের ঘরেই। তাদের ঘরে আরও যা সব জিনিসপত্র অবহেলায় ছড়ানো তা আমাদের দেশের খুব ধনীর ঘরেও নেই। এ-দেশে একখানা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটিও যদি রাতে বাইরে পড়ে থাকে তো চুরি হয়ে যায়। আর তনুশ্রীকে বলেছিলুম, রানার অত ভাল সাইকেলটা বাইরে পড়ে থাকে তনুশ্রী, ঘরে তুলে রাখো না কেন ?

তনুশ্রী ভারি অবাক হয়ে বলল, ঘরে তুলে রাখব ? কেন দাদা ?

মানে চুরিটুরি হয়ে যায় যদি ?

তনুশ্রী হেসে খুন, চুরি। সাইকেল-এ-দেশে কে চুরি করতে যাবে ? দেখছেন না কত গাড়ি পর্যন্ত বাইরে পড়ে থাকে। এসব এখানে কেউ চুরি করে না। নিয়ে করবেটাই বা কী বলুন। এসব জিনিসের তো সেকেন্ডহ্যান্ড বাজার নেই।

তা বটে। কিন্তু আমাদের দেশে তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের বাটিরও সেকেন্ডহ্যান্ড বাজার আছে। পুরনো কাগজ, শিশি-বোতল, ছেঁড়া কাপড় সব কিছুই ঘর থেকে কিনে নিয়ে যায় খদ্দের। ও-দেশে এসব জিনিস তো বটেই, সোফাসেট, পুরনো খাটপালঙ্ক অবধি গারবেজ হিসেবে ফেলে দিতে হয়। সেই দেশে কোন আহম্মক সাইকেল চুরি করতে গিয়ে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে ? সুতরাং রানার সাইকেল আবহমানকাল ওই বাইরেই পড়ে থাকবে, কেউ ছোঁবেও না।

এসব দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সে একরকম। কিন্তু মনটাও যদি পাল্টায় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে দাঁড়িয়ে যায়। মগজ ধোলাই হতে দিতে নেই। যাঁরা "আমেরিকা ! আমেরিকা !" করে খেপে ওঠেন এবং এ-দেশেও আমেরিকার ছায়া দেখতে চান তাঁরা খুব বিবেচক নন।

তবু আমারও একটা স্বপ্নের আমেরিকা, কল্পনার আমেরিকা ছিল। সেখানে কোনওদিন যাওয়া ঘটবে না জেনে আমি মনে মনে তাকে নির্মাণ করে নিতুম। সেই নির্মাণটি অবশ্য আমেরিকা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে গেল।

যত কল্পনাই করা যাক না কেন, যত কিছুই ধরে নেওয়া হোক না কেন, বাস্তবের সঙ্গে তা মিলবে না কিছুতেই।

আমেরিকা নিয়ে অভিবাসী বাঙালিদের একটু অহংকার আছে। যাঁরা সে-দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে ফেলেছেন যা যাঁরা গ্রিন কার্ডের অধিকারী তাঁরা বলেন, এ-দেশে বসবাস করার সুবিধাগুলো এত বেশি, এত সহজ এখানকার জীবনযাত্রা, এত নিরাপদ এখানকার পরিবেশ যে, অন্য কোথাও ঠিক এরকম পাওয়া যাবে না। ভারতবর্ষে তো কল্পনাই করা যায় না।

কথাটা খুব ঠিক। এক মহিলার পেটে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছিল। অপারেশনের পর দেখা গেল অ্যাপেন্ডিক্সের ওপর কয়েকটি ছোটো টিউমার। সঙ্গে সঙ্গে এই টিউমার নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল। খুশি না হয়ে ডাক্তার সেই অ্যাপেন্ডিক্স সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, ও ছবি পাঠালেন আমেরিকার বিভিন্ন মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে। চার-পাঁচ জায়গা থেকে অভিমত নিয়ে তারপর রোগিণীর স্বামীকে জানালেন যে, না, ওগুলো ম্যালিগন্যান্ট টিউমার নয়, এই যে অতি সতর্কতা, অগাধ দায়িত্ববোধ, কৌতূহল এবং পরিশ্রম স্বীকারের আগ্রহ, এসব থেকেই যে আমরা বঞ্চিত। আমাদের হাইওয়ে নেই, স্কাইস্ক্র্যাপার নেই, বিজ্ঞান নেই সেকথা ঠিক। কিন্তু তার চেয়েও বেশি যেটা নেই সেটা হল চরিত্র।

নারায়ণ মজুমদার আমার গুরুভাই। থাকেন জার্সি সিটিতে। আমার ব্যস্ততা এবং সময়াভাবের দরুন কিছুতেই তাঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। সুযোগ তিনি নিজেই করে নিলেন। ফিলাডেলফিয়া থেকে নিউ জার্সিতে আমাকে নিয়ে আসার ভার নিলেন তিনি। সেই তিনশো মাইল রাস্তা আসতে আসতে নারায়ণদা তাঁর দীর্ঘ আমেরিকাবাসের কথা শোনাচ্ছিলেন। কাহিনী যে খুব সুখকর তা নয়। বুঝতে পারছিলুম, এ মানুষটি আমেরিকার বেড়াজালে আটকে পড়ে ছটফট করছেন। কিন্তু জাল কেটে বেরোনোর কোনও উপায় নেই।

দেশে ফিরতে মিয়া রাজি তো বিবি রাজি নয়। বিবি রাজি হলে মিয়া নারাজ। আর সবসময়েই নারাজ ছেলেমেয়েরা। তারা পরিষ্কারই বলে, উই আর আমেরিকানস।

এও ভবিতব্য। জেনারেশন গ্যাপ অভিবাসী বাঙালির সবচেয়ে বড় শত্রু। আর এই জেনারেশন গ্যাপ এমনই সাঙ্ঘাতিক যে পরিমাপ করাই কঠিন।

আমেরিকা যেতে কী কী লাগবে তার একটা আন্দাজ করে কিছু কেনাকাটা

করা গেল। তার মধ্যে একটা হাওয়াই স্যুটকেস আর একখানা কেবিন ব্যাগ। আপনি যদি সরাসরি আমেরিকা যান বা সেখান থেকে সরাসরি আসেন তবে আপনার বরাদ্দ দুটি লাগেজ—ওজনেও অনেকটাই ছাড় পাবেন। একশ কেজির ওপর। কিন্তু অন্য কোনও দেশে যেতে আসতে হলে আপনার বরাদ্দ একটি স্যুটকেস এবং তার মালসমেত ওজন কুড়ি কেজির বেশি হতে পারবে না। আমেরিকা সম্পর্কে এই পক্ষপাতদুষ্ট উদারতা কেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর না থাকলেও অজুহাত নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমেরিকানরা মেজাজী এবং বাবু এবং তারা প্রচুর ভ্রমণ করে। পয়সাওয়ালা মার্কিনদের তোয়াজে রাখাটা এয়ারলাইনসদের স্বার্থের পক্ষেই জরুরী। দুনিয়ার তাবৎ এয়ারলাইনসকে তো তারাই সিংহভাগ লভ্যাংশ দিচ্ছে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা, ব্যবস্থা আলাদা। আগে ব্রেকজার্নি করলে সুবিধেটা পাওয়া যেত না। আজকাল ব্রেকজার্নি করলেও আপনি আমেরিকা যাচ্ছেন বা সেখান থেকে আসছেন জানলে সুবিধেটা যথাবিধি পাবেন। আমি ফেরার পথে লন্ডনে ব্রেকজার্নি করেছিলাম। লন্ডন থেকে ফেরার সময় হিথরোতে ওজন যন্ত্রে দুটি স্যুটকেস তুলতেই মেয়ে অফিসার প্রশ্ন করল, দুটো স্যুটকেস কেন ?

আমি সবিনয়ে বললুম, ইউ এস এ থেকে আসছি যে !

বটে ! টিকিট দেখাতে পারো ?

ভাগ্যিস পুরনো টিকিটের কাউন্টারফয়েল রেখেছিলুম। দেখাতেই ছেড়ে দিল।

ইউ এস এ সারা দুনিয়াতেই এক জাদুই শব্দ। সিসেম। উচ্চারণ করলেই অনেক বন্ধ দুয়ার খুলে যায়, অনেক শুকনো মুখে হাসি ফোটে। অনেক নিস্তেজ প্রাণ চমকে উঠে নড়েচড়ে বসে।

আমি দুটো স্যুটকেস নেবো না। একটাই যথেষ্ট। আগস্টে আমেরিকায় ঘোর গ্রীষ্মকাল। গরম জামা নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। একখানা ধুতি আর একটি পাঞ্জাবি নিতে হবে। আর সাধারণ জামাকাপড়ই যথেষ্ট। ইওরোপ আমেরিকায় আজকাল আর সুটটুট পরার রেওয়াজ নেই। যে যা-খুশি পরে। খোদ আমেরিকায় পরার ঝামেলাও নেই। গ্রীষ্মকালে আদুড় গায়ে সাহেবদের পথে-ঘাটে সর্বত্র দেখা যাবে। লজ্জা নিবারণের জন্য একখানা হাফ প্যান্ট সম্বল। আমি যদিও নাগা সাধুদের দেশের লোক, তবু প্রকাশ্যে খালি গা হতে বাধো বাধো ঠেকে। সব বাঙালিরই ঠেকবে।

হলিউডের ছবি বা বিদেশী ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপিত স্বাস্থ্যবান আমেরিকানদের দেখে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়েছে তাতেও যথেষ্ট গলদ আছে। আমেরিকান মানেই ছ ফুটিয়া, মাসকুলার, মেদহীন কেজো চেহারা

নয়। সেখানে পেটমোটা, মেদবহুল, থলথলে চেহারার লোক এত বেশি যে, অবাক হতে হয়। তাই রাস্তায় ঘাটে খালি গা সাহেব দেখে তাদের স্বাস্থ্যকে খুব বেশি হিংসে হয়নি। তবে স্বাস্থ্য-সচেতন আমেরিকানদের মেদ কমানোর জন্য কষ্টকর দীর্ঘ জগিং করতে বহু জায়গায় দেখেছি। কিন্তু ফিটনেস তারা রাখতে পারে না খাদ্যাভ্যাসের জন্য। খায়ও প্রচুর। ফলে বডি-ব্যালান্স রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমার মাঝারি হাওয়াই স্যুটকেসটি গোছানোর ভার বাড়ির লোকেরাই নিল। আমি তখন পুজোর লেখা শেষ করার জন্য উদ্দণ্ড ব্যস্ত।

একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম, নিত্য প্রয়োজনীয় যে সব জিনিস সঙ্গে যাবে তার কিছু বাদ গেলেও ক্ষতি নেই। আমেরিকায় প্রায় সবই পাওয়া যায়। তাছাড়া বাঙালি গৃহস্থরা আমাকে খুব বেশি বিপদে পড়তে দেবেন না।

যাওয়ার দিন যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই একটু একটু নার্ভাস লাগছিল। যদিও যুক্তি দিয়ে জানি যে, এই স্নায়ুবৈকল্য সম্পূর্ণ অকারণ। তবু কোথাও যাত্রা করার নামেই আমার এই বৈকল্য একটু দেখা দেয়ই। কিন্তু ঘর থেকে একবার বেরিয়ে পড়লে আর কোনও বৈকল্য থাকে না। তখন বেশ ঝরঝরে, একরোখা, সাহসী হয়ে উঠি।

আমার যাত্রার দিন নির্ধারিত হল দোসরা আগস্ট। সোমবার। আসলে তেসরা। কারণ বিমান দমদম ছাড়বে রাত সাড়ে বারোটায়। ইংরেজি মতে তারিখ পাল্টে যাবে। সপ্তাহে ওই একদিনই কলকাতা থেকে সরাসরি ফ্লাইট।

সকলেই জানেন যে, কলকাতা হল এক দুঃখিনী শহর। এর বিমানবন্দরটির পর্যন্ত জাত-মান নেই। আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এই হাওয়াই আড্ডাকে ছুঁয়ে যেতে ঘেন্না করে। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে যে সরাসরি ফ্লাইটের কথা বললুম সেটাও আসলে সরাসরি নয়। অতিকায় বোয়িং ৭৪৭ তথা জাম্বো জেট কলকাতায় আসবে না। একটি এয়ারবাস আমাদের নিয়ে গিয়ে মধ্যরাতে বাম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামিয়ে দেবে। সেখানে বাদবাকি নিশি জাগরণে কাটিয়ে ভোর সাড়ে ছটায় জাম্বো আমাদের নিয়ে বিদেশে পাড়ি দেবে। সরাসরি ফ্লাইট বলতে এইটুকুই। অর্থাৎ বোম্বাইতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সুবিধে। অন্য ফ্লাইটে গেলে বিমানবন্দর বদলাতে হত। মালপত্র টানা হ্যাঁচড়া এবং ইমিগ্রেশন ইত্যাদির ঝামেলা পোয়াতে হত। কাস্টমসও।

আমরা যারা কলকাতাকে ভালবাসি তাদের অনেক অপমানই নিত্য হজম করে নিতে হয়। এই তথাকথিত গান্ধা শহরের ভাগ্যে আন্তর্জাতিক বিমান যোগাযোগটুকু পর্যন্ত ঘটে ওঠে না। ডাইরেক্ট ফ্লাইটের নামে একটা প্রহসনমাত্র আছে।

যেদিন রওনা হব তার আগের দিন হাড়ভাঙা খাটুনি গেল। রাত আড়াইটে

অবধি লেখার পর আনন্দমেলার উপন্যাসটি শেষ করে সবে শুয়েছি এমন সময় বিদেশগামী বাবার সঙ্গে আসন্ন বিরহে কাতর আমার শিশুপত্রটি উঠে এসে আমার পাশে শুল। সেই মাঝরাত্তিরে বাপ-ব্যাটায় কিছু কথাবার্তার পর যখন সত্যিই চোখের পাতা এক করা গেল তখন ভোর সাড়ে তিনটে। বেলা অবধি ঘুমোনোর উপায় ছিল না। তখনও কিছু লেখা বকেয়া পড়ে আছে। সাতটায় শয্যাত্যাগের পরই আবার সকলম বসে যেতে হল। এরই ফাঁকে ফাঁকে নানা জন দেখা করতে আসছেন, বিদায় জানাতে আসছেন। সারাদিন কেটে গেল ঘোর ব্যস্ততায়। তার মধ্যেই খবর পেলুম, হঠাৎ আজ ট্যাক্সি ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। রাস্তায় একটিও ট্যাক্সি নেই। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আর রতনতনু ঘাটি দেখা করতে এসেছিল। আর এল আমার অগতির গতি রাধানাথ—অর্থাৎ রাধানাথ মণ্ডল। তার হাতে সাগরদার কাছে বিপদবার্তা পাঠালুম, ট্যাক্সি নেই, যদি অফিস থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিস থেকে খবর হল, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। চিন্তা নেই।

বিকেল চারটের পর লেখা থেকে মাথা তোলার যখন অবকাশ হল তখন শরীর ঘুমে ভেঙে আসছে। অবসাদে খাড়া হয়ে বসে থাকাই কঠিন। কিন্তু আসলে তখনই নিজের আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগ এল। তারা এতক্ষণ তৃষিতের মতো অপেক্ষা করছে, কখন লোকটার হাতের কাজ শেষ হয়। সন্ধের পর দেখা করতে এল দিব্যেন্দু পালিত আর দীপক রায়।

দুনিয়াটা অনেকের কাছে টেনিস বলের মতো ছোট্টো। একটুখানি। এরা নিত্যদিন নানা কাজে লন্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্ক করে বেড়াচ্ছে। আর অনেকের কাছে এই পৃথিবী এক অফুরান তেপান্তরের দেশ, সাতসমুদ্দুর তেরো নদী, ভূতপেত্নী, রাক্ষস খোক্কসে আকীর্ণ। তাদের কাছে অজানা দুনিয়ার শেষ নেই।

বাঙালিরা আজকাল দুনিয়াদার হয়েছে বটে, তবু এখনও প্রিয়জনের বিদেশ-যাত্রাটা তাদের কাছে তেমন সুখপ্রদ নয়। একটু বাধো বাধো লাগে। যেতে দিতে মন সরে না। দূরের পথ, বিদেশ, বিভুঁই কত কী হতে পারে। বিদেশযাত্রাটা আমাদের কাছে এখনও ঠিক জলভাত হয়ে ওঠেনি।

আর সেই মনোভাবেরই প্রকাশ আমি আমার স্ত্রী-পুত্রের মুখে দেখতে পাচ্ছিলুম। কন্যা কিছু সাহসিকা। সে তেমন শুষ্কমুখ নয়। বরং কিছু খুশিই।

সন্ধেটা খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। রাত সাড়ে বারোটায় প্লেন ছাড়বে। দশটা ত্রিশে রিপোর্টিং টাইম। তবু আমরা হাতে সময় রেখে বেরোলাম।

বিমানবন্দরে যে সব ক্রিয়াকর্ম আছে সেগুলো আগে থেকে জানা ছিল বলে তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি। তাছাড়া সুদীপ্তর সেদিন এয়ারপোর্ট ডিউটি থাকায় আমার কাজ আরও সহজ হয়ে গিয়েছিল।

প্লেনে লন্ডন অবধি একজন বাঙালি সঙ্গী পেয়েছিলুম। রণজিৎ ঘোষ। পরে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। রাস্তা-ঘাটে হুট করে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে আমি পারি না। তাই আমাকে অনেক সময়ে দীর্ঘ পথ একদম মুখ বুজে যেতে হয়।

প্লেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ব এরকমই ঠিক করে রেখেছিলুম। কিন্তু শরীর ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও চাপা টেনশনে ঘুম এল না। রাত তিনটের কাছাকাছি বোম্বাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমে একটু জিরিয়ে নেবো ভেবেছিলুম। কিন্তু অভিনব কারণে তা হল না। শুনলুম, আমরা ডাইরেক্ট ফ্লাইটের যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও এখানে নতুন করে সিট নম্বর এবং সিকিউরিটি চেক ইত্যাদির ঝামেলা পোয়াতে হবে।

ঘুমচোখে, ক্লান্ত শরীরে আবার লাইন দিতে হল। ভোর সাড়ে ছটায় প্লেন ছাড়বে। বাকি রাতটুকু আর ঘুমোনোর সুযোগ হবে না, বুঝতে পারছিলুম। ডিউটি ফ্রি শপে কিছুক্ষণ ঘুরে-টুরে, কিছুক্ষণ একটা সোফায় শুয়েছিলুম বটে, কিন্তু দুম করে সিকিউরিটি চেক-এর ঘোষণা হল। সে বাধা টপকে লাউঞ্জে গিয়ে যখন বসলুম, তখন সহযাত্রীদের চেহারা দেখা গেল।

কথাটা কবুল করা কত দূর উচিত হবে বুঝতে পারছি না। টাপে টোপে বলি, সহযাত্রীদের দেখে আমি বেশ একটু বিস্মিত আর হতাশ হয়েছি। এঁরা সব বিলেত-আমেরিকা যাচ্ছেন! বেশির ভাগেরই চেহারা এবং হাবভাব এতই—ইয়ে—মানে—যাকে বলে অতি সাধারণ যে, মনেই হয় না এঁরা বিদেশ টিদেশ—অর্থাৎ সাহেবদের ঝাঁ-চকচকে দেশে গিয়ে থাকেন। চেহারা ঈশ্বরদত্ত—সে সম্পর্কে কিছু বলার নেই। কিন্তু অনেকেরই পোশাক-আশাক পর্যন্ত অতিশয় ক্যাজুয়াল। যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড়ের প্যানের দোকান অবধি যাবেন। যাত্রীদের মধ্যে বিস্তর বাঙালি। বাঙালিদের মধ্যে বিস্তর বৃদ্ধবৃদ্ধা। চ্যাঁ-ভ্যাঁ, কিচিরমিচির। দু চারজন দেশ থেকে কাজের লোক নিয়ে যাচ্ছেন।

পৌনে সাতটা নাগাদ একটা অস্পষ্ট ঘোষণা শুনে সবাই খাড়া হলেন এবং জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন। ডকিং করা বিশাল প্লেনের অভ্যন্তরে একেবারে লেজের কাছ বরাবর জানালার ধারে আমার সিট। পাশে রণজিৎ। তার ওপাশে দুর্দান্ত সুপুরুষ একটি মারাঠি ছেলে। ব্রেকফাস্টের কিছু পরই ছেলেটি বিয়ার খেতে শুরু করল, সঙ্গে সুস্বাদু আমণ্ড। আলাপ জমে গেল। ছোকরা সুইডেনে থাকে। লন্ডনে নেমে সুইডেনের প্লেন ধরবে। কথায় কথায় বলল, নিউজিল্যান্ডে তার এক প্রেমিকা থাকে বলে মাঝে মাঝেই তাকে সেখানে যেতে হয়। আরও কয়েকটা জায়গাতেও তার প্রেমিকা থাকা সম্ভব। এই সব ছোকরার কাছেই দুনিয়াটা টেনিস বলের মতো ছোট্ট একটুখানি জায়গা। এদেশে-ওদেশ তাদের কাছে এপাড়া-ওপাড়ার সমান।

বিশাল বিমানটি আরব সাগর পেরিয়ে ঢুকে পড়তে লাগল ইওরোপে। ঘণ্টা আষ্টেক উড়ে তারপর নামবে লন্ডনে। দেশের সীমা জীবনে প্রথম লঙ্ঘন করে যাচ্ছি। তৃষিতের মতো নিচের দিকে চেয়ে রইলুম। ধূ-ধূ সমুদ্র, সামান্য কিছু মেঘের আঁশ, খুব ছোট্ট চেহারায় দেখতে পাওয়া কতিপয় জাহাজ। কিন্তু প্লেন ক্রমে ক্রমে উঁচুতে উঠছে। এত উঁচুতে যে, নিচের পাহাড় সমতল সব একাকার হয়ে যেতে থাকে।

মারাঠি ছেলেটি বলল, দাদা, একটু বিয়ার খাবে?

আমি খাই না।

বলে সে এক প্যাকেট নোনতা সুস্বাদু আমণ্ড এগিয়ে দিল। প্যাকেটটা শেষ করতে না করতেই আর একটা।

সঙ্কুচিত হয়ে বললুম, আর নয়।

আরে দাদা, খাও। এ সবের জন্য আমাকে পয়সা দিতে হচ্ছে না।

ব্রেকফাস্টে যথেষ্ট খাবার খেয়েছি। তবু ভরা পেটেও আমণ্ড যে সুস্বাদু লাগছিল তাতেই বোঝা যায়, এই বিদেশী বাদামটি বাস্তবিকই ভাল জিনিস।

হঠাৎ ছেলেটি আমাকে একটু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, দাদা তুমি কি করে তোমার তরোয়ালটি নিয়ে যাচ্ছো? সিকিউরিটি তোমাকে ছাড়ল কি করে?

সোর্ড। বলে আমি হেসে ফেললুম। গুরুদেবের দেওয়া একখানি দণ্ড আছে আমার। প্রায় সর্বত্রই সেটি নিয়ে যাই। কলকাতায় দণ্ডটির জন্য ফোম লেদার দিয়ে একটি খাপ করিয়ে নিয়েছি। সিকিউরিটি চেক-এ আটকায়নি। কিন্তু খাপে বন্ধ দণ্ডটি অনেকটা তলোয়ারের মতোই দেখায়।

ছেলেটিকে সেকথা বলতেই খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। বলল, তোমার সোর্ডটি দেখে অনেকক্ষণ অবধি আমি কিন্তু বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলুম।

আমার ঘুম আসছিল। কিন্তু যতবার ঘুম আসে ততবার কেন যেন চটকা ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ চ্যানেল মিউজিক শোনা গেল। সিনেমা দেখলুম। তবু সময়টা কাটানো কষ্টকর হচ্ছিল।

হঠাৎ পাইলট বলল, নিচে তাকালে বাঁ দিকে বেলগ্রেড শহরটি দেখতে পাবেন। নিরাসক্ত চোখে দেখলুম। কারণ এত ওপর থেকে বেলগ্রেড কেবল একটি রিলিফের ম্যাপ।

সকালের দিকে বাথরুমে একটু ভিড় থাকে। তবে বাথরুমের সংখ্যা বড়ো কমও নয়, পিছনে দু ধারে মোট ছটি। চারটি ছোটো, দুটি বড়। তবে হাওয়াই জাহাজে স্থানাভাবের দরুন সবই মিনিয়েচার। সামান্য একটু জায়গায় বুদ্ধিমান লোকেরা তবু এত সুচারুভাবে বাথরুমগুলি তৈরি করেছেন যে ছোটো হলেও তার ব্যবস্থায় কিন্তু ত্রুটি নেই। এ ডি কোলোন, মেক আপ, আফটার-শেভ লোশন,

চিরুনি, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সবই সাজানো, দয়া করে ব্যবহার কবার অপেক্ষায়। টিশু পেপার, কাগজের ন্যাপকিন ছাড়াও আছে চমৎকার লেস-এর মতো বুনোটের বড় বড় রুমাল। প্রথমবার বাথরুমে গিয়ে মনে হল কোলোন, মেক আপ এবং লোশন নির্ঘাৎ কেউ ভুল করে রেখে গেছে, ওগুলো ব্যবহার করা উচিত হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাথরুমেও কৌতূহলভরে অনুসন্ধান করে দেখলুম, সেগুলোতেও ওগুলো রয়েছে। এছাড়া ঠাণ্ডা ও গরম জল, সাবান ইত্যাদির কোনও কমতি নেই। ফ্লাশ টিপলে কমোড পরিস্কার হয়ে যায় রঙিন জলে।

বন্ধ বাথরুমের দরজায় কে দুম দুম করে ধাক্কা দিচ্ছিল, দরজায় "এনগেজড" সাইন থাকা সত্ত্বেও। বিরক্ত হলুম। তখন আমি লেস-এর রুমালে ও ডি কোলোন ঢালছি চুরি করে। না, সঠিক অর্থে চুরি নয় বটে, কারণ ওগুলো আমাদের ব্যবহারের জন্যই রাখা আছে। তবু আমি গরিব দেশের লোক। সেকেন্ড ক্লাস কামরায় যাতায়াত করে থাকি। সে সব কামরায় শতখানেক লোকের জন্য বরাদ্দ চারখানা টয়লেট। তারও অধিকাংশই মলমূত্রে এমন নিঘিন্নে হয়ে থাকে যে, ব্যবহারের অযোগ্য। ক'লে জল পড়ে না, বা পড়লেও এত জোরে পড়ে যে, ছিটকে এসে জামাকাপড় ভিজিয়ে দেয়। সে সব বাথরুমে সাবান টাবানের বালাই নেই। জন্মাবধি ওই ব্যবস্থায় অভ্যস্ত বলে জাম্বো জেট-এর বাথরুমে এই সব রাজকীয় আয়োজনে নিজেকে একটু চোর-চোর লাগছিল বটে। টের পেলে যদি বকে? বাথরুমের দরজায় আচমকা ধাক্কা পড়ায় তাই একটু আঁতকে উঠেছিলুম, কেউ তদন্তে এল নাকি?

ধাক্কা ক্রমেই বেড়ে ওঠায় অগত্যা দরজা খুলতে হল। ভারি চশমা চোখে এক বৃদ্ধ।

বিরক্ত হয়ে ইংরিজিতে বললুম, কী ব্যাপার?

উনি বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, বড় বেগ চাপিছে।

এবং কথাটা বলেই আমাকে বেরোনোর সুযোগটুকু পর্যন্ত না দিয়ে একরকম ধাক্কিয়ে ঢুকে পড়লেন। স্বল্প পরিসর সেই বাথরুমে দুজনের জায়গা তো হাওয়ার নয়। কোনও তরুণী হলে বলে উঠতুম, হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হো।

অতি কষ্টে বেরিয়ে এলুম। এবং লক্ষ করলুম, আরও দুটো বাথরুম খালিই রয়েছে।

পরে বুড়ো মানুষটিকে আরও লক্ষ্য করেছি, কোনও প্রোটোকল এটিকেটের ধারও মাড়াচ্ছেন না। তিনি বা তাঁর স্ত্রী দুজনেই। টিভিতে মহাভারত সিরিয়ালের কিশোর কৃষ্ণকে লক্ষ করেছেন কি? ছেলেটি দেখতে সুন্দর, তবে সবসময়েই একটু হাঁ করে থাকে। এই বৃদ্ধটিরও সেই একই মুদ্রাদোষ। সবসময়ে একটু হাঁ করে থাকেন।

তা শুধু এই বৃদ্ধই নয়, বিমানের যাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই প্রায় একই রকম অবস্থা। অত বড় জাম্বো জেটে একটিও ফরেন গুডস নেই, সব দিশি মাল। অর্থাৎ সাহেব মেম নেই, দিশি মানুষে ঠাসা।

আমাদের ভাগ্যে যে এয়ার হোস্টেসটি জুটেছিলেন তিনি তরুণী বটে, দেখতেও হ্যাকছি নন, তবে মুখখানায় সবসময়ে একটু কাঁদো-কাঁদো ভাব। আমি তাঁকে, অন্যদের মতো, বিশেষ কোনও ফরমায়েশ করিইনি। তবু যে দু চারবার জল বা চা চেয়েছি তা তিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং পরে মনে করিয়ে দিতে বড় বড় চোখে চেয়ে সর্বনাশের ভঙ্গিতে বলেছেন, ও স্যার, আই ফরগট! এত ভুলোমন এয়ার হোস্টেস কখনও দেখিনি।

এয়ার হোস্টেস প্রসঙ্গটা আর একটু টানতে পারতুম। কিন্তু দেশে ও দেশের বাইরে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস বা এয়ার ইন্ডিয়ায় আজ অবধি হাস্যমুখী, বিনীত, প্রকৃত সেবা-উন্মুখ, স্মার্ট হোস্টেস খুব বেশি দেখিনি। ভারি আঁশটে মুখ, গেরামভারি, রাগী রগচটা তাদের চেহারা। ট্রে থেকে কেউ চারটের জায়গায় ছটা লজেন্স তুললেই ধমকে দিতে কসুর করেন না। কিছু চাইলেই যেন বিরক্ত হন।

বিদেশগামী জাম্বো জেটেও আমি অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। কারণ এর একটা প্রথম শ্রেণীও আছে। সেখানে যত্ন-আত্তি ভালই হওয়ার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অবস্থা অনেকটা লোকাল ট্রেনের মতোই, এক এক সারিতে দশজন লোকের বসবার আসন। অগুন্তি মানুষ। এত লোককে মাত্র গোটা কয়েক এয়ার হোসটেস আর হোস্ট দেখাশুনো করছেন। বিরক্তি আসতেই পারে। বায়নাক্কার তো শেষ নেই।

তিনবার জল চেয়ে এবং না পেয়ে অবশেষে আমি উঠে গিয়ে নিজেই জল চেয়ে খেয়ে আসি। কী আর করা যাবে? তবে হোস্টরা অনেকটাই ধীর স্থির, অভিজ্ঞ, যাত্রীদের কাছে বিশেষ আসেন না, তবে দূর থেকে নজর রাখেন।

লানচের সময় একটু গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠল। আমি এয়ার হোস্টেসকে জিজ্ঞেস করলুম, তরকারিতে পেঁয়াজ রসুন আছে কি না। তিনি কাঁদো-কাঁদো মুখ-চোখ কপালে তুলে আতঙ্কিত গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন, ডিড ইউ গিভ এনি স্পেশাল ফুড অ্যাডভাইস স্যার?

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, আই ডিড।

বিপন্ন মেয়েটি ছুটে গিয়ে তাঁর ওপরওলা হোস্টকে ডেকে আনলেন। তিনিও অসহায় প্রশ্ন করলেন, একই প্রশ্ন। সদুত্তর তাঁদের জানা নেই। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বললেন, আচ্ছা, আমরা দেখছি স্যার, এখনই জানিয়ে যাচ্ছি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি একগাল হেসে এসে বললেন, স্যার, অল দা ভেজিটেরিয়ান মিলস আর ভয়েড অফ ওনিয়ন অ্যান্ড গারলিক।

ততক্ষণে অবশ্য নিজের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় (যদি কিছু থেকে থাকে) কাজে লাগিয়ে আমি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছি এবং খাওয়ায় প্রায় শেষ তবু তাঁকে একটা থ্যাংক ইউ দিয়ে শূন্য ট্রেটা হাতে ধরিয়ে দিলুম।

বিমান চলেছে লন্ডন। বিমান চলেছে নিউইয়র্ক। পায়ের তলায় সুসভ্য ইওরোপ তার গোটা উত্থান-পতনের ইতিহাস নিয়ে রোদ্দুরে পড়ে আছে। বিমানের অভ্যন্তরে তাকিয়ে অবশ্য তা মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল, ইওরোপের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এক মিনি ভারত। নির্বিকার ভারত।

বিমানের তিন ভাগে তিনটি চলচ্চিত্র একসঙ্গে দেখানো শুরু হল। দুটো হিন্দি, একটি ইংরিজি। আমাদের ভাগে ইংরিজি, হায়ার এ কপ। রগরগে থ্রিলার। কিন্তু পিছনে বসেছি বলেই, আমি আর দুটি পর্দাও দেখতে পাচ্ছি। শব্দ নেই। শব্দের জন্য ইয়ারফোন রয়েছে। সেটি সিটের সকেটের সঙ্গে যুক্ত করে কানে ঠুলি দুটো পরে নিলেই ছবির শব্দ পাওয়া যাবে। তবে প্লাস্টিকের ইয়ারফোন (অনেকটা স্টেথসকোপের মতো, কানে ঢুকে থাকে) বেশিক্ষণ কানে রাখা যায় না। ব্যথা হতে থাকে।

এরোপ্লেন বিষয়ে আমার প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতার পার্থক্য প্রায় প্রস্তর যুগের সঙ্গে জেট যুগের। ত্রিশের যুগে যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা বিজ্ঞানের নব নব বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা বড্ড বেশি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের জীবৎকালে দুনিয়া প্রায় পাগলা ঘোড়ার মতো প্রগতির পথ অতিক্রম করছে। পরমাণু বোমা থেকে শুরু করে চাঁদে মানুষ অবধি কত কাণ্ডই না ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। তবে আমরা যারা ভারতবাসী—তাদের কাছে এই সব আবিষ্কার বা প্রগতির অভিজ্ঞতা ততটা প্রত্যক্ষ নয়, যতটা পরোক্ষ। আধুনিক জাম্বো জেট-এ ঘণ্টায় নশো কিলোমিটার বেগে লন্ডনের দিকে উড়ে যেতে যেতে আমার মনে হল, পরশুও আমার বাড়ির পাশে ঝুপড়ির আধ-ল্যাংটো বাচ্চাদের দেখিনি কি, নাকে হাত দিয়ে হাঁ করে আকাশমুখো তাকিয়ে প্লেন দেখছে! এখনও প্লেনের শব্দ পেলে গাঁয়ের শিশুরা খেলা ফেলে আকাশে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। কী ওটা ? কারা যায় ওতে চেপে ? কোথায় যায় ? কী করে ওড়ে ?

দমদম হাওয়াই আড্ডায় আন্তর্জাতিক বেড়া ডিঙোনোর পরই ভারতীয় মুদ্রা অচল হয়ে গেছে। এখন আমার নির্ভর পাঁচশো কুড়ি ডলারের ওপর। সত্তর ডলার নগদ, বাকি সাড়ে চারশো ডলার ট্র্যাভেলার্স চেক-এ। এই বোধোদয় হওয়ার পর থেকেই আমি বেশ কৃপণ হয়ে গেছি। একটা কোক বা স্প্রাইট বা সেভেন আপ কিনে খেতেও ভয় হচ্ছে, যদিও প্লেনে সবই বেজায় সস্তা, ডিউটি ফ্রি বলে। সিগারেট অবধি দেশ থেকে কিনে এনেছি, যাতে অকারণে খরচ করতে না হয়। আর নিজের এই কৃপণতা লক্ষ করে নিজেরই কেন যেন হাসি পাচ্ছে।

এত কেপ্পন ছিলুম না তো কখনও! আর এই কৃপণতা আমাকে এত বায়কুণ্ঠ করে তুলল যে, কেনেডি এয়ারপোর্ট অবধি একটি ডলারও আমার হাত দিয়ে গলেনি।

ডলার শব্দটিই যে কী সাঙ্ঘাতিক তা দেশেই একটু একটু টের পেয়েছিলুম। দেশের বাইরে পা দিয়ে আরও টের পেয়েছি। আমার ব্যাঙের আধুলি পাঁচশো কুড়ি ডলার সম্বল বলে সব সময়ে মনটা একটু ডলারমুখী হয়ে থাকতে বটে, কিন্তু বিদেশে পা দিয়ে দেখেছি যারা খোলামকুচির মতো ডলার আয় করে তাদেরও মনপ্রাণ সবসময়েই ডলার-উন্মুখ হয়ে থাকে।

দুনিয়ার রাজা যদি কেউ থেকে থাকে এখন তবে তার নাম ডলার। ডলার মা-বাপ, ডলারই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ডলার সম্পর্কে এই জ্ঞানোদয় আমার বিদেশ-ভ্রমণের এক মস্ত শিক্ষা।

বিমান চলেছে লন্ডন। বিমান চলেছে নিউইয়র্ক। আকাশে অশেষ রোদ্দুর। দিন বড় হতে হতে চলেছে। ঘড়িতে কলকাতার সময় রেখে দিয়েছি। ইচ্ছে করেই সময় বদলাইনি। ঘড়ির কাঁটা অপরাহ্ণের সঙ্কেত দিচ্ছে। কিন্তু বাইরে এখনো সকাল। নিচে সবে ভোর হচ্ছে।

বিমান চলেছে লন্ডন। বিমান চলেছে নিউইয়র্ক।

কখনও ঝিমুনি আসছে। ফের চটকা ভেঙে উঠে বসছি। দু দুটো খুদে বালিশ নানা অ্যাঙ্গেলে সেট করেও স্বস্তি নেই।

সারা পৃথিবীতে এখন উগ্রপন্থীদের রবরবা। প্রায় কোনও দেশই এই সম্প্রদায়ের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আর কেউই নয় এদের লক্ষ্যের বাইরে। আন্তর্জাতিক বিমান হল উগ্রপন্থীদের সবচেয়ে প্রিয় মৃগয়া। কখনও তারা সুকৌশলে সবরকম সতর্কতার বেড়াজাল ভেঙে বিস্ফোরক তুলে দেয় বিমানে, কখনও বা উড়ন্ত বিমানে গ্রেনেড ও পিস্তল হাতে স্বমূর্তিতে দেখা দিয়ে বিমান নিয়ে চলে নিজেদের পছন্দমতো জায়গায়। উড়ন্ত বিমান সাতিশয় ভঙ্গুর জিনিস, ডিমের খোলার মতো। পিস্তলের গুলি বা গ্রেনেডের ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতাই তার নেই। আজকাল প্লেনে উঠলেই তাই এই সব অলক্ষুনে কথা মনে পড়ে।

তবে একটা সুবিধে। ছিনতাইকারীরা যদি নিতান্তই বিমান অন্য দেশে নিয়ে যায় তাহলে ফাঁকতালে একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে। অবশ্য যদি শেষ অবধি গোলাগুলি না চলে।

এছাড়া জাম্বো জেট অত্যন্ত নিরাপদ বিমান। শান্ত সুশীল এই বিমানটির দুর্ঘটনার দৃষ্টান্ত বড়ো একটা নেই। সারা পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই বোয়িং ৭৪৭ বা জাম্বো জেট খুবই নির্ভরযোগ্য আকাশযান।

মাত্র কয়েকদিন আগেই হিথরো বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কত

হাস্যকর তা প্রমাণ করতে এক সাংবাদিক মাল খালাসির চাকরি নিয়ে বিমানে একটি চিহ্নিত প্যাকেজ তুলে দেয়। না, সে বিমানে অন্তর্ঘাত ঘটাতে চায়নি, কেবল হিথরোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটি দেখাতেই এটা করেছিল। সে মাল খালাসের ঠিকাদার সংস্থায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে একটি চাকরি জোগাড় করে এবং তারপর বিনা বাধায় বিমানে উঠে যায়। একজন সাংবাদিক যদি এত অনায়াসে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেদ করতে পারে তাহলে সংগঠিত এবং ক্ষমতাবান উগ্রপন্থীদের কাছে তো কাজটা জলভাত। ইলেকট্রনিক যন্ত্র বা এক্স-রে বসিয়ে যাত্রীদের হাজারবার তল্লাশি করলেও লাভ নেই। অন্তর্ঘাত তার রন্ধ্রে খুঁজে নেবেই। রন্ধ্রও যে অজস্র।

সহযাত্রীদের সংখ্যা এত বেশি যে তাদের সকলকে দেখে ওঠা সম্ভব নয়। যাঁরা কাছেপিঠে বসে আছেন তাঁদের মধ্যে সম্ভাব্য উগ্রপন্থীদের খুঁজে দেখেছি। উগ্রপন্থীদের চেহারা যে উগ্র হবেই এমন কোনও কথা নেই। সুতরাং হতাশ হতে হল।

মনে আছে দিল্লি থেকে একবার কলকাতা ফেরার পথে আমি আর সমরেশ বসু যখন সিকিউরিটি চেক-এ ঢুকেছি তখন পাঞ্জাবি সিকিউরিটি অফিসার সমরেশদাকে কিছু না দেখেই অ্যাটাচি সমেত ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে বেশ ভালরকম খানাতল্লাশ করলেন।

সমরেশদা ঠাট্টা করে বললেন, দেখলে তো, আমাকে সন্দেহই করল না, কিন্তু তোমাকে কেমন ধরল।

আমি বললুম, দাদা, আমাকে দেখে অন্তত প্লেন হাইজ্যাক করতে পারি বলে মনে হয়। আপনাকে দেখে তা মনে হয় না। ঘটনাটা কিন্তু আমার ফেবারেই যাচ্ছে।

উনি খুব হাসলেন। বললেন, তা বটে। তোমাকে দেখে খানিকটা মনেও হয়। আর একবার শিলিগুড়ির বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এক ভদ্রমহিলা সিকিউরিটি অফিসার যখন আমার অ্যাটাচি খোলার উদ্যোগ করছেন তখন খুব বিনীতভাবে বলেছিলুম, দিদি, আজ অবধি কোনও বাঙালি প্লেন হাইজ্যাক করেছে বলে কি শুনেছেন ? আমি বাঙালি।

উনি বেশ লজ্জা পেয়ে বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনাকে আর অ্যাটাচি কেস খুলতে হবে না।

কিন্তু মজা হল এই যে, আমি যখন আমার সহযাত্রীদের মধ্যে সম্ভাব্য উগ্রপন্থীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি তখন যে বেশ কয়েকজনের সন্দেহমূলক দৃষ্টি আমাকে নিবিষ্টভাবে লক্ষ করছে সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। আপাতদৃষ্টিতে সোর্ডধারী এবং নীরস চেহারার আমাকে যে কেন বিভিন্ন

এয়ারপোর্টে একটু বেশিমাত্রায় খানাতল্লাশ করা হয় তা আমি আজ জানি। তার ওপর আমেরিকায় চুল ছাঁটতে দশ ডলার লাগে শুনে আমি রওনা হওয়ার আগে মাথা প্রায় মুড়িয়ে চুল ছেঁটে এসেছি। ফলে আমার কেঠো চেহারাটা যা খোলতাই হয়েছে তা বলার নয়। আমি যে নিরীহ এবং ভীতু টাইপের লোক সেটা আমি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করছে না। অবশ্য সেটা টের পেতে আমার একটু সময় লেগেছিল। যখন টের পেলাম তখন বড্ড লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল।

বিমান চলেছে লন্ডন। বিমান চলেছে নিউইয়র্ক। দীর্ঘ বিষণ্ণ শব্দ তুলে মেঘস্তরের অনেক ওপর দিয়ে মায়ালোক ছুঁয়ে ছুঁয়ে তার একঘেয়ে যাত্রা। নিচে ইওরোপ শুধুমাত্র রিলিফের ম্যাপ। পাহাড় ও সমতল পর্যন্ত বোঝা যায় না।

মারাঠি ছেলেটি কয়েক ক্যান বিয়ার পান করার পর যথেষ্ট প্রগলভ হয়েছে। সে অবিরল তার জীবনকাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছিল। আমি খানিকটা শুনছিলাম, আর বাকি অর্ধেক মনোযোগ সমর্পণ করছিলাম পদানত ইওরোপের দিকে। কোন রাষ্ট্র পার হচ্ছি, কোন শহর, তা বোঝবার উপায় নেই। পাইলট আর গাইডের ভূমিকা নিচ্ছেন না।

দিন বড় হতে হতে চলেছে। এটি হবে আমার এতাবৎকালের জীবনে দীর্ঘতম দিন। কারণ ভোর সাতটায় বোম্বাই ছাড়লেও এবং ভারতীয় সময় অনুযায়ী বেলা দুপুর হলেও, আমরা চলেছি পশ্চিমে, সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ফলে ইওরোপে এখন সবে ভোর হচ্ছে। আমরা ভোর ছড়াতে ছড়াতে চলেছি। নয় ঘণ্টা পর যখন লন্ডনে নামব তখন সেখানে সবে বেলা সাড়ে এগারোটা।

বলতে নেই, এয়ার ইন্ডিয়ার খাবার-দাবার যথেষ্ট ভাল। এবং দেদার। খেয়ে শেষ করে ওঠাই কঠিন। নিরামিষাশীদের জন্যও বন্দোবস্ত চমৎকার। দিনটা বড় হতে হতে চলেছে বলে কখন খাওয়ার সময়, কখন ঘুমোবার তা কিছু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, ঠিক খিদের মুখেই খাবার চলে আসে। খাবারে অনেক পদ। কার্পণ্য নেই। খাওয়া আর মাঝে মাঝে কানে ঠুলি লাগিয়ে চ্যানেল মিউজিক শোনা, মাঝে মাঝে বাথরুমে গিয়ে লেস-এর মতো রুমালে ও ডি কোলোন ঢেলে মুখ মুছে নেওয়া এই করে করে সময় কাটানো ছাড়া বিমানে খুব বেশি কিছু করার নেই। গুচ্ছের ম্যাগাজিন আব খবরের কাগজ থাকে, সেগুলো নিয়েও কিছু সময় কাটানো যায়। অনেকেই জানালার ঢাকনা টেনে এবং চোখে ঠুলি লাগিয়ে (বিমানসেবিকার কাছে চাইলে পাওয়া যায়) দিব্যি ঘুমোতে পারেন। আমার ঘুম হচ্ছিল না, চাপা টেনশনে। বার বার ঘুমিয়ে পড়েও চটে করে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছি, দু ঘণ্টা কাটল, চার ঘণ্টা কাটল, ছ ঘণ্টা কাটল। খুব ধীরে কাটল।

অবশেষে একটু ধীরে ধীরে বিমান উচ্চতা হারাতে লাগল : লক্ষণটি আমার চেনা। হিথরো আর বেশি দূরে নয়। নিচে ইওরোপের রিলিফ ম্যাপের মতো চেহারা আর নেই। ঘাস মাটি বাড়ি ঘর দেখা যেতে লাগল। ইংলিশ চ্যানেল চিনে নিতে আমার দেরি হল না। বিমান দ্রুত নিচে নামছে।

দূরবিস্তৃত লন্ডনকে যখন জানালা দিয়ে দেখা গেল তখন তৃষ্ণার্তের মতো চেয়ে ছিলুম। ছেলেবেলা থেকে লন্ডন নামটি আমাদের ভিতরে ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজে। লন্ডনকে নিয়ে কত না গল্প শুনেছি, আর ইংরিজি সাহিত্যে লন্ডনের ছড়াছড়ি। ট্রাফলগার স্কোয়ার, চেরিং ক্রস স্টেশন, ওল্ড কিউরিওসিটি শপ ; বেকার স্ট্রিট, ব্রিটিশ মিউজিয়াম মিলিয়ে লন্ডন যেন আর না-দেখা কোনও শহর নয়। ভারি চেনা পুরনো বুড়ি এক শহর।

জানালা দিয়ে চেয়ে আছি। মনের মধ্যে এক শিরশিরে উত্তেজনা। এক আবিষ্কারের আনন্দ।

"আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হিথরো হাওয়াই আড্ডায় নামব। সিট বেল্ট বাঁধুন। ধূমপান করবেন না..." ইত্যাদি ঘোষণার মধ্যে যে যান্ত্রিকতা ছিল তা আমাকে স্পর্শ করল না। ঘোষিকা মাসে হয়তো দশবার লন্ডন আসেন। সহযাত্রীদের মধ্যেও বিদেশবাসী প্রচুর রয়েছেন। তাঁদের কাছে লন্ডন নিউইয়র্ক জলভাত। আমার কাছে তো তা নয়। লন্ডনের সঙ্গে এই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়ের লগ্নে আমার ভিতরে কিছু তরঙ্গ ভাঙছে। উচাটন লাগছে।

ওপর থেকে যেটুকু দেখা যচ্ছিল, লন্ডন শহরে তেমন উঁচু উঁচু বাড়ি নেই। ঢালু দোচালা চারচালার মতো শীর্ষবিশিষ্ট বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়ির সংলগ্ন রয়েছে সবুজ লন। ভারি সাজানো, ছিমছাম দেখাচ্ছিল। আর কতটা যে শহরের বিস্তার তার আন্দাজ করাই কঠিন।

বিমান নেমে পড়ল লন্ডনে।

ঘোষণা করা হল, "যাঁরা নিউইয়র্ক যাচ্ছেন তাঁদেরও বিমান থেকে নেমে যেতে হবে, কেবিন লাগেজ সমেত। কারণ বিমানে এখন সাফাই হবে।"

ব্যাগটি কাঁধে এবং দণ্ডটি হাতে নিয়ে ডকিং দরজার দিকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ডকিং হয় শুধুমাত্র সামনের দরজায়। জাম্বো জেটের এত যাত্রীর পক্ষে ওই একটা দরজা দিয়ে নামা এক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বিশেষ করে পিছনের সিটের যাত্রীদের।

যত অপেক্ষা করতে হচ্ছিল তত ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। লন্ডনে নামবার জন্য প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি। তাও এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউনজের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। তবু এক ঝলক লন্ডনের যতটুকু দেখা যায় সেটুকু না দেখে নিলেও যে নয়।

দীর্ঘ কাচে মোড়া করিডোর পেরিয়ে ট্রানজিট লাউনজে পৌঁছোনোর পথে দুধারে শুধু এয়ারপোর্টের সবুজ ঘাসজমি দেখা যায়। আর কিছু নয়। ট্রানজিট লাউনজে এক প্রস্থ চেকিং হয়। এক্স-রে মেশিনে ব্যাগ আর দণ্ডটি সমর্পণ করলুম। মেশিনের অন্যপ্রান্ত দিয়ে দণ্ডটি বেরিয়ে আসতেই সাহেব অফিসার সেটি তুলে নিয়ে ভারি কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলেন।

"হোয়াট ইজ দিস ?"

"এ স্টিক। হোলি স্টিক।"

ব্রিটিশ অফিসারটি দণ্ডটি খাপ থেকে খুলে মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ দেখল। স্টেনলেস স্টিলের মাথাওলা দণ্ডটি দেখতে এত সুন্দর যে বোম্বাইয়ের সিকিউরিটি অফিসারও আমাকে বলেছিল, ইটস এ বিউটিফুল স্টিক স্যার, হোয়ার হ্যাভ ইউ গট ইট ?

ব্রিটিশরা বোধহয় আগের মতো গোড়ামুখো নেই। এই সাহেবটি লাঠিটি তুলে নিয়ে দু'একবার সুইং করল। তারপর একগাল হেসে জিনিসটি ফেরত দিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

হিথরোতে তখন থিক থিক করছে লোক। দমদম দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজের বিমানবন্দরগুলি থেকে হিথরো বা জে এফ কেনেডি এয়ারপোর্টের ব্যস্ততার ধারণাও করা যাবে না। লন্ডনের হিথরো বা নিউইয়র্কের কেনেডি এয়ারপোর্টে প্রতি সেকেন্ডেই কোনও না কোনও বিমান নামছে বা উড়ছে। সমস্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিমানের যেন লক্ষ্যই ওই এয়ারপোর্ট, তাই এই দুটি বিমানবন্দরের আকারও সুবিশাল। টারমিনালও অতিকায়। বিভিন্ন বিমান কোম্পানির জন্য আলাদা টারমিনাল রয়েছে। তবু এক এক সঙ্গে তিন চারটে বিমানের যাত্রী জড়ো থাকে সবসময়েই। হিথরোতে নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যেই খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করলুম।

ডিউটি-ফ্রি শপ অগুন্তি। বেশির ভাগই মদের দোকান। আর এসব নিষ্কর দোকান থেকে ওই বস্তুই বিকোয় সবচেয়ে বেশি।

তৃষিতের মতো কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলুম। কাছেপিঠে কোনও বাড়ি দেখা গেল না। যতদূর চোখ যায় কেবল এয়ারপোর্টের মাঠ। তবু এ তো লন্ডনেরই মাটি। বুড়ি লন্ডন। কতকালের ইতিহাস বুকে করে আজও বেঁচেবর্তে আছে।

সাহেব মেমরা খোলা রেস্তরাঁয় বসে খাওয়া-দাওয়া করছে। শপিং করছে। তাদের ভিড়ে মিশে আছে, নানাদেশী মানুষ। এশিয়াবাসী, চীনা, জাপানি, আফ্রিকাবাসী। আজকাল পৃথিবীর সব মহানগরই আন্তর্জাতিক লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের কলকাতাও। লন্ডন বা নিউইয়র্ক তার চেয়েও ঢের বেশি। সারা পৃথিবীর

মানুষ এসে রুজি রোজগারের ধান্দায় ভিড় করে এসব শহরে। ফলে এইসব শহরে গোটা পৃথিবীর প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়।

হিথরোর সীমাবদ্ধ এলাকায় ভারি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আর দণ্ড হাতে আমি যতক্ষণ পারলুম ঘুরে বেড়ালুম।

যখন ফের বিমানে ওঠার জন্য লাউঞ্জে ফিরলুম তখন আর এক প্রস্থ সিকিউরিটি চেক হল। লন্ডনে বিস্তর যাত্রী নেমে গেছে। লন্ডন থেকে দেখলুম আমাদের বিমানে ওঠার জন্য অনেক সাহেব আর মেম লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বোম্বাই থেকে লন্ডন অবধি দৌড়ে একজনও সাদা চামড়ার লোক ছিলেন না।

অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সাহেব আর মেমদের একটু বেশি খাতির করা হয়ে থাকে। অভিযোগটি সম্পর্কে অবহিত ছিলুম বলে বিমানে উঠেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলুম। কিন্তু যা দেখা গেল তা মোটেই অভিযোগটির সত্যতা প্রমাণ করে না। ইওরোপিয়ানদের একটু আগে খাওয়া স্বভাব, আর তাদের খাদ্যাভ্যাসও আলাদা বলে তাদের একটু আগে সার্ভ করা হয় এই যা। এছাড়া আর কোনও পক্ষপাত লক্ষ করিনি। আমার কাছাকাছি অনেক সাহেব মেম ছিলেন। তাঁদের প্রতি আমার চেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শিত হয়নি।

লন্ডনে দুজনে নেমে যাওয়ার ফলে আমার তিন আসনের সারিতে আমি একা। অনেক সিটই শূন্য। তার কারণ বোধহয় লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার অজস্র বিমান আছে বলে কোনও বিমানেই ঠাসাঠাসি ভিড় হয় না। যাত্রী ভাগাভাগি হয়ে যায়। গণ্ডগোলও অনেক কম। আমার সামনের আসনে এক জোড়া সাহেব মেম বসা। তারা স্বামী-স্ত্রী হতেও পারে, নাও হতে পারে। আজকাল স্বামী-স্ত্রী না হয়েও সহবাস করার রেওয়াজ তো আমাদের দেশেও চালু হয়ে গেছে। বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়রা বান্ধবী নিয়ে সারকিটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সন্তানাদিও হচ্ছে। আগামী প্রজন্মের কাছে ব্যাপারটা হয়তো জলভাত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত চোখে একটু দ্বিধা থেকেই যায়। সাহেব মেমের এই জোড়াটির স্বামী-স্ত্রী না হওয়াই সম্ভাবনা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশি আদিখ্যেতা থাকে না। কিন্তু এঁদের ছিল। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা পরস্পরের মুখচুম্বন করে গেলেন ক্লান্তিহীনভাবে। বয়সে তেমন তরুণ-তরুণীও নন তাঁরা। আমি প্রথমটায় অন্যদিকে চোখ রেখে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলুম। পরে ভাবলুম, সাহেবদের দেশ শুরু হয়ে গেছে, সুতরাং এমত দৃশ্য আমাকে হয়তো বহুবার দেখতে হবে। সহজ হওয়াই ভাল।

এই সহজ হওয়ার কথাটাই বলি। প্রথমবার কুম্ভ মেলায় গিয়ে ন্যাংটো নাগা

সাধু দেখে ভারি অস্বস্তি হয়েছিল। এত সাধু একসঙ্গে এবং ন্যাংটো—এরকম দৃশ্য তো আগে কখনও দেখিনি। তবে কয়েকদিন পরেই সাধুদের সঙ্গে দিব্যি মিশ খেয়ে যেতে বাধা হয়নি। দ্বিতীয়বার যখন কুম্ভে গেলুম হরিদ্বারে তখন আমি নাগা সাধুদের সম্পর্কে রীতিমত ওয়াকিবহাল লোক। আমার সহযাত্রীরা যখন উগ্র ও মারমুখী সাধুদের দেখে সভয়ে পিছপা হচ্ছে তখন আমি তাদের গাইড হয়ে নাগাদের ডেরায় নিয়ে যাই। বিস্তর সাধুকে হাত করে ফেলেছিলুম। যেটা দেখেছি তা হল ন্যাংটো সাধুদেব কাছে গিয়ে বসতে যে প্রাথমিক সংকোচটা হয় তা কিছুক্ষণ পর আর থাকে না। নিরবরণ ব্যাপারটা অভ্যস্ত ও স্বাভাবিকই লাগতে থাকে। আমি প্রায়ই নাগা সাধুদের ডেরায় গিয়ে বসে বিস্তর আড্ডা দিয়ে এসেছি।

হিথরো থেকে নিউইয়র্ক প্রায় ছ' ঘণ্টার পাল্লা। গোটাটাই আটলান্টিকের ওপর দিয়ে। এই সেই আটলান্টিক, যার ওপর দিয়ে আমাকে উড়ে যেতে হবে বলে আমার বউ ভারি ভয় পেয়েছিল।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক হিথরোতে যাত্রাবিরতির পর বিমান দৌড় শুরু করতে যখন রানওয়েতে চলেছে তখনই একখানা কনকর্ড বিমানকে আকাশে উঠে যেতে দেখলুম। জাম্বো জেট যে রাস্তা ছ'ঘণ্টায় যাবে তার অর্ধেক সময়ে কনকর্ড পৌঁছে যাবে সেখানে। বিচিত্র বিশাল বিমানখানার সাবলীল ওড়া মুগ্ধ নেত্রে দেখছিলুম। ইহজীবনে কখনও কনকর্ডের যাত্রী হওয়া যাবে কি না জানি না। তাই দেখে নিই যতখানি পারা যায়। ভারতবর্ষের কোনও হাওয়াই আড্ডায় কখনও কনকর্ড বিমান নেমেছে বলে শুনিনি। তবে সম্প্রতি ঢাকায় একটি কনকর্ড নেমেছিল এবং সেই সংবাদ বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল টেলিভিশনে। বিমানযাত্রীদের কাছে কনকর্ড এখনও এক কাম্য বিস্ময়, এখনও অজানা অভিজ্ঞতা। সময় কম লাগে বলে কনকর্ডের যাত্রীদের জেট ল্যাগ পোয়াতে হয় কম, সময় বাঁচে, তবে ভাড়া কী পরিমাণে গুনতে হয় তার আন্দাজ অবশ্য আমার নেই।

রানওয়ের মুখে আমাদের বিমানকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। হিথরো অতিশয় ব্যস্ত বিমানবন্দর। মুহুর্মুহু প্লেন উড়ছে, নামছে। আকাশে তাকালে প্রায় সব দিকেই উড়ন্ত নামফ উঠন্ত বিমান দেখা যায়। আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল বিমানবন্দরটি তুলনায় দমদম নেহাত গোস্পদমাত্র।

অবশেষে ওড়বার সঙ্কেত পেয়ে বিমানটি রানওয়েতে এসে দৌড় শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে পায়ের তলায় রোদে ঝকঝক করে উঠল তার বনেদি বাড়িঘর পার্ক রাস্তা নিয়ে লন্ডন শহর। ঠিক কলকাতার মতো দোতলা বাস দেখা গেল একটি। দেখা গেল নদী। গাছপালা। তারপর ইংল্যান্ডের বিশ্ববিশ্রুত গ্রামাঞ্চল—কান্ট্রি সাইড। বিমান চলে পশ্চিমে। বিমান চলেছে নিউ ইয়র্ক।

নিচে কিছুক্ষণ আয়ারল্যান্ডের ভূভাগ দেখা গেল। দেখা গেল সমুদ্রের খাঁড়ি। তারপর বিশাল ও বিপুল অতলান্তিক। মেঘশূন্য রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীলাভ জলরাশি। এক-আধটা দ্বীপ। বিমান তার অভ্যস্ত উচ্চতায় উঠে যেতে লাগল। পৃথিবীকে আবার অস্পষ্ট মানচিত্রে পর্যবসিত হয়ে যেতে হল। তবে এবার শুধু জল আর জল। মাঝে মধ্যে এক আধটা মন্থর জাহাজ।

লন্ডন থেকে নতুন এয়ার হোস্টেসরা উঠলেন। নতুন পাইলট, নতুন যাত্রী। আবার লজেন্স এল, চা এল।

আমার ঘড়ি অনুযায়ী কলকাতায় এখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধে। বিমান থেকে দেখতে পাচ্ছি বাইরে এখন দুপুর। মোটে দুপুর। আজকের দিনের বেলাটা বড্ড বড় হবে। এত বড় দিন, অফুরন্ত দিন আমি আর কখনও দেখিনি। এ যেন সূর্যের সঙ্গী হয়ে চলা।

বিমান চলেছে নিউইয়র্ক। নিচের ওই সমুদ্রপথ ধরে একদা কাঠের দাঁড়টানা জাহাজে ভারত আবিষ্কার করতে পাড়ি দিয়েছিলেন কলম্বাস। নিজের অজান্তে এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন। আর সেই আবিষ্কার করতে গিয়ে কত হ্যাপাই না তাঁকে পোয়াতে হয়েছিল। জাহাজী বিদ্রোহ, মৃত্যুভয়, খাদ্যাভাব, প্রত্যাবর্তনে অনিশ্চয়তা। সেই পথ আমি মাত্র ঘণ্টা ছয়েকে পাড়ি দিচ্ছি গগনপথে। বিমানে লুকোনো বোমা বা হাইজ্যাকার না থেকে থাকলে কোনও ঝক্কিই নেই। সামনে খাবার চাইলেই জল বা পানীয়। হায় কলম্বাস!

ভিতরে বসেও টের পাচ্ছিলুম, আমাদের বিমান চলেছে সামান্য উত্তরমুখো হয়ে পশ্চিমে। অর্থাৎ কানাডার দিকে।

জানালার পাশের আসনে বসে তৃষিত দুই চোখে আদিগন্তের বিস্তার দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল, বহু দূরে, অন্তত মাইল পাঁচ সাত তফাতে একটি কৃষ্ণকায় বিমান সমান্তরাল উড়ে চলেছে, তবে একটু নিচুতে। আকাশে আমরা যে একা নই তা দেখতে পেয়ে কেন যেন ভারি ভাল লাগল। যতবার, তাকাচ্ছি ততবার একই দূরত্বে এবং একই উচ্চতায় এবং একই গতিতে কৃষ্ণবর্ণ বিমানটিকে দেখা যাচ্ছিল। কী অসহায়, কী সামান্য, কত ফঙ্গবেনে দেখাচ্ছিল বিমানটিকে! ওই আকাশ, সমুদ্র, মহাশূন্যের পশ্চাৎভূমিকে কত না পলকা মানুষের তৈরি হাওয়াই কল! ফড়িং-এর মতো যাকে দেখতে পাচ্ছি তারও পেটের মধ্যে এমনই নরম গদির সুখাসনে যাত্রীরা বসে আছেন। পান ভোজন আমোদ, দেখানো হচ্ছে ফিল্ম, প্রচারিত হচ্ছে চ্যানেল মিউজিক, কৃত্রিম তার অভ্যন্তর, আমাদের মতোই।

একটানা একঘেয়ে বিষণ্ণ এক শব্দ তুলে বিমান পাড়ি দিচ্ছে অতলান্তিক। সামনে আমেরিকা। সামনে সব পেয়েছির দেশ। বিমান চলেছে নিউইয়র্ক। বিমান চলেছে আমেরিকা।

আধো-ঘুম আধো-জাগা একরকম ঝিমুনি এসেছিল। নিচে এক মহাসমুদ্রের বিস্তার দেখতে দেখতে উদাসীনতা এসেছিল। কখন যে বিমান সাগর পাড়ি দিয়ে স্থলভূমিতে ঢুকেছে তা ঠিক টের পাইনি। আচমকা চেয়ে দেখি প্লেন পশ্চিমে নয়, চলে দক্ষিণে। নিচে উপকূল। জল আর মাটির সীমানা বরাবর আমরা চলেছি। স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম, বিমান কানাডার আকাশ-সীমায় ঢুকেছে। সম্ভবত ওভাবেই আমেরিকায় ঢোকবার নিয়ম। উপকূলবর্তী অতলান্তিকের নীল জলে অজস্র ছোটো ছোটো জলযান ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং দক্ষ। এটা তাদের নেশাও বটে। অবকাশ পেলেই সমুদ্রে বা জলাশয়ে নিজস্ব পরিবহণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূল আমি অনেকটাই ঘুরে দেখেছি। এত মোটরবোট, পাওয়ারবোট, স্পিডবোট, লনচ চোখে পড়েনি। অতলান্তিকের শান্ত জলে অজস্র রেখা টেনে কয়েক হাজার ওইসব বোট বিভিন্ন দিকে চলেছে।

এক একটা শহর পেরিয়ে যাচ্ছি, প্লেন থেকেও সেই সব শহরের চমৎকার পরিকল্পনা এবং পরিচ্ছন্নতা চোখে পড়ছিল। আর চোখে পড়ছিল তুমুল সবুজ। যেন কোনও পটুয়া সদ্য সবুজের বাটি উজাড় করে চারধার বর্ণময় করে রেখে গেছে। নীল সমুদ্র আর সবুজ স্থলভূমির মাঝে বরাবর দীর্ঘ বঙ্কিম ধূসর তটরেখা।

অনেকক্ষণ বিমানটি উড়ে চলল তটরেখার ওপর দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে উচ্চতা হারাতে লাগল। জুম হয়ে এগিয়ে এল গাছপালা, প্রান্তর, নগর। আমার এতাবৎকালের জীবনযাত্রার যা অভিজ্ঞতা, যে জীবনধারা, যে অভ্যাস তা সব কিছু পিছনে ফেলে নতুন এক অভিজ্ঞতার জন্য আমি মনে মনে তৈরি হচ্ছিলুম। কিছু বিস্ময়, কিছু বৈষম্য, কিছু অস্বস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে নতুন এক ভূখণ্ড তার সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র আর চেহারা নিয়ে। তবু আমি তো সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত।

"জে এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট আর দূর নয়। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই অবতরণ করব। দয়া করে ফর্মটি পূরণ করে হাতে রাখুন, ইমিগ্রেশনে ওটি জমা দিতে হবে। প্রস্তুত রাখুন পাসপোর্ট !"....

এরোপ্লেনে লম্বাটে একটা ফর্ম দেওয়া হয়েছিল যাত্রীদের। সেটি পূরণ করে পকেটে রাখালুম। হাতের কাছেই রয়েছে পাসপোর্ট। গলা একটু শুকিয়ে আসছে। তেষ্টা পাচ্ছে। তবু জানি আমেরিকায় পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরেই সব বিস্ময় ও অনুমান উবে যাবে।

যখন প্লেন খুব নিচুতে নেমে এল তখন আমি জানালা দিয়ে ছবির মতো শহরতলির বাড়িঘর এবং লন ও বৃক্ষরাজি দেখতে পাচ্ছিলুম। তবু তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়।

সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন জে এফ কে-র রানওয়ে স্পর্শ করল। খানিকক্ষণ

াঁড়। এয়ারব্রেকের তীব্র শব্দ। তারপর প্লেন গড়িয়ে চলল ডকিং করতে। অনেকটা রাস্তা। যাত্রীদের মধ্যে একটু ব্যস্ততা।

বিশাল রাক্ষুসে জাম্বো জেট-এর মাত্র সামনের দরজাতেই ডকিং হয়। ফলে ত যাত্রীর নামতে অনেকটা সময় লাগে। বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতীরা একটু এগিয়ে াকেন। কারণ ইমিগ্রেশনের লাইনে তাহলে অনেকের পিছনে দাঁড়াতে হয় না। ফলে সময় বাঁচে। আন্তর্জাতিক ওড়াউড়ির অভিজ্ঞতা না থাকায় আমি তাড়াহুড়ো রিনি। প্লেন থামবার পর ধীরে-সুস্থে ব্যাগ গুছিয়ে দণ্ডটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছি।

প্লেনের ভিতরে স্পিকারে একটা ঘোষণা শোনা যাচ্ছিল। পুরোটা শুনতে াইনি। তিনজনের নাম বলল। তার মধ্যে শেষ নামটা আমার। বলা হল, তোমাদের রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টে লোক আছে।"

কেউ না কেউ থাকবেই, জানা কথা। তবু ঘোষণাটি শুনে দূর বিদেশে পা াখার লগ্নে ভারি ভাল লাগল।

প্লেনের দরজা থেকে সরাসরি লম্বা ঢাকা করিডোর চলে গেছে। একটু াঁকাবাঁকা হয়ে। পদে পদে সিকিউরিটির লোক। কালো, সাদা।

কেনেডি এয়ারপোর্ট কত বড় তার সম্যক ধারণা আমার আজও নেই। তবে কটি মাঝারি মাপের শহর যে তাতে এঁটে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভিন্ন এয়ারলাইনসের জন্য বিভিন্ন টার্মিনাল না থাকলে এই বিচিত্র ও বৃহৎ য়ারপোর্টে দিশাহারা হয়ে যাওয়া অবধারিত।

কিন্তু ভয় নেই। পথিক যাতে কোনওরকমেই পথ না হারায় তার জন্য নির্দিষ্ট পথ ও পথনির্দেশিকা সর্বত্র রয়েছে। বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে য়েছে সেখানেই রয়েছে মানুষ বা ক্রসবারের প্রতিরোধ। ফলে ওই লম্বা রিডোরটির মধ্যেও নানা দিকে যাওয়ার গলি থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে যাওয়ার ভয় কেবারেই নেই। সিকিউরিটির লোকেরা দাঁড়িয়ে যাত্রীদের সবিনয়ে পথ দেখিয়েও চ্ছে।

তবে পথটা বড়ো কম নয়। খানিকটা সিঁড়ি বেয়ে নামতেও হল। তারপর ড়সড় একটি হলঘরে পৌঁছে দেখলুম, আমার সামনে রাসমেলার ভিড়। লকাতায় কেরোসিন সংকটের সময় যেরকম সব লম্বা লাইন পড়ে হলঘরে মনই লম্বা ইমিগ্রেশনের লাইন। কেনেডি এয়ারপোর্টে প্রতি মিনিটে নানা য়ারলাইনসের বিমান নামছে। আমাদের হলঘরে এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়াও অন্য য়ারলাইনসের যাত্রীও আছেন। শেকল দিয়ে ওই বিশাল লাইনকে এমনভাবে াঁকিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে অল্প জায়গাতেও অনেক যাত্রীকে দাঁড় রিয়ে দেওয়া যায়। মার্কিন নাগরিক বা গ্রিন কার্ডধারীদের জন্য অবশ্য ভিন্ন বস্থা। আমার বিদেশ ভ্রমণে এই ইমিগ্রেশনের অভিজ্ঞতাটি বিশেষ রুচিকর

হয়নি। দীর্ঘ বিমানযাত্রার পর দীর্ঘ সময় গরু-ছাগলের মতো গাদাগাদি হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে বড্ড বিরক্তিকর। উপরন্তু কেনেডি এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন হলটিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু ছিল না। প্রবল গরমে বদ্ধ জায়গায় অত লোকের উপস্থিতি ভারি হাঁসফাঁস অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। আমেরিকা সম্পর্কে আমার সুখময় বিস্ময় মিশ্রিত প্রতীক্ষা মুড়িয়ে গেল ইমিগ্রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে বিস্তর সাহেব মেম লাইনে দণ্ডায়মান। তারাই কথা বলছিল বেশি। তুলনায় এশিয়াবাসীরা অনেক চুপচাপ, গম্ভীর।

প্লেনে একটি চেনা মুখ নজরে পড়েছিল। বাঙালি। এক আধ পলক চোখাচোখি হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলুম তিনিও আমাকে চেনেন। কিন্তু কথা হয়নি। ইমিগ্রেশনের লাইনেও তাঁকে দেখা গেল, কিছুটা দূরে। রোগা একটি মেয়েকেও চিনতে পারছি। আমাদের হিন্দি রবিবার কাগজে তার আনাগোনা আছে। সে বিমানের অন্য এলাকায় ছিল বলে দেখা হয়নি। ইমিগ্রেশনের লাইনে তাকেও দেখা গেল। আলাপ নেই বলে কথা বলিনি। অচেনা বা আধচেনা কারও সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারি না। ভারি সংকোচ হয়। উপরন্তু নিউইয়র্কের তন্দুরী গরমে ভেপে আছি। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে হাই তুলছি কখন এই খাঁচাকল থেকে বেরোবো। আলাপ টালাপের ইচ্ছেটাই হচ্ছে না।

লাইন এগোচ্ছে শামুকের গতিতে। দেখতে পাচ্ছি, সামনে অনেকগুলো কাউন্টারে যাত্রীদের ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সময় সংক্ষেপের জন্য। তাও অনেক সময় লেগে গেল।

প্রায় দু ঘণ্টা পর লাইনের সামনে আসা গেল। এক ভারি সুন্দরী মহিলা লাইন আটকে দাঁড়ানো। পরনে সরকারি পোশাক। মুখে একটু গাম্ভীর্য। আমাকে যে কাউন্টারে যেতে বললেন সেটির নম্বর বোধহয় সাত। সাবধান করে দিলেন, কাউন্টারে ঢুকবার আগে যেন দেখে নিই অন্য লোক ভিতরে আছে কি না।

সদাশয়া এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা কাউন্টারে আসীনা। পাসপোর্ট দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন কেন আমেরিকায় এসেছি, কতদিন থাকব। নিতান্তই রুটিন প্রশ্ন। তিন মাসের ছাড়পত্র দিয়ে ছেড়ে দিলেন।

আবার দীর্ঘ করিডোর পেরিয়ে লাউঞ্জ। বিশাল লাউঞ্জ। আমার স্যুটকেসটি লাগেজ এনক্লোজারে পড়ে আছে। আরও হাজারটা লাগেজের সঙ্গে। তবে আমার ভাগ্য ভাল, বেশি খুঁজতে হয়নি।

কলকাতা দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজ হিথরো এ পর্যন্ত কোনও এয়ারপোর্টেই লাগেজ ট্রলির জন্য ভাড়া গুনতে হয়নি। কেনেডিতে হল। সারি সারি ট্রলি সাজিয়ে রাখা আছে দেখে যখন এগিয়ে গিয়ে একটার হাতল ধরে টানাটানি করছি তখন দেখলুম একটি লম্বা প্যানেলের মধ্যে ট্রলির একটি অংশ লক করা। প্যানেলের

শেষে একটি পয়সা গেলার যন্ত্র। এক জাপানিকে দেখলুম ভারি যত্নে এক ডলারের একটি নোট ডাকবাক্সের মতো ফোকরে ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রলিটি প্যানেল থেকে মুক্তি পেল। তার দেখাদেখি আমিও এক ডলারের একটি নোট বের করে যন্ত্রের মুখে ধরতে না ধরতেই যন্ত্র তা চোঁ করে টেনে নিল।

ডলার গেলার নানা যন্ত্র মার্কিন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা রয়েছে। এইসব যন্ত্র এমনই ডলার পিপাসায় কাতর যে হাত থেকে প্রায় ডলার ছিনিয়ে নেয়। গোটা আমেরিকার ডলার-কেন্দ্রিক আত্মাটিকে আমি সে-দেশে ঢোকবার মুখেই কেনেডি এয়ারপোর্টে আবিষ্কার করে ফেললুম। আর সেই এক ডলারই আমার এ যাত্রায় প্রথম অর্থব্যয়। যদিও আমার হিসেবে ট্রলির ভাড়া সাড়ে ষোলো টাকা হওয়াটা ভারি অন্যায় এবং অন্যায্য, তবু প্রথম ডলারটি খরচ করতে পারার একটা প্রাথমিক গর্বও তো আছে।

বেরোবার মুখে সংক্ষিপ্ত কাস্টমস। মধ্যবয়স্ক এক আমেরিকান "ওয়েলকাম টু ইউনাইটেড স্টেটস স্যার" বলেই জানতে চাইল সঙ্গে কোনওরকম গাছপালা বা বীজ জাতীয় জিনিস আছে কি না। নেই বলার পর আমার দণ্ডটি হাতে নিয়ে বলল, এটা কী ?

এ হোলি স্টিক।

হোয়াই ইটস সো হেভি ?

দি হেড ইজ মেড অফ সলিড স্টেনলেস স্টিল।

ইটস এ গুড স্টিক।

ছেড়ে দিল। থ্যাংক ইউ বলতে প্রায় ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এক পা পিছিয়ে এসে সহবত রক্ষা করে বাইরের পথ ধরলুম।

বাইরে দুধারে কয়েক শো লোক অপেক্ষমান। তাদের মধ্যে কে আমাকে নিতে এসেছে তা নির্ধারণ করা কঠিন হত। তবে এক কথার মানুষ ধ্রুব কুণ্ডু বলে রেখেছিল, আর কেউ থাকুক বা না থাকুক আমি এয়ারপোর্টে থাকবই।

আমার থাকার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে তাও জানি না। তাঁরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করবেন না দায় ঘাড়ে নেবেন ? তাঁরা রসিক মানুষ না গোমড়ামুখো ? গেরামভারি না সাদামাঠা ? এইসব নিয়েও একটু চিন্তা ছিল। আমি চিরটা কাল কাটিয়েছি মেস-এ বোর্ডিং-এ। সেই কারণে কোনও অচেনা পরিবারে চট করে সামিল হতে পারি না। সব সময়েই কেবল মনে হয় আমি থাকায় এঁদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। খিদে পেলে বা বাথরুম পেলেও বেমালুম তো চেপে রাখি। অবশ্য দিলখোলা সাদামাঠা পরিবার যদি হয়, আর যদি তারা আমাকে পছন্দ করে ফেলে তাহলে আর অসুবিধে থাকে না।

ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে দুরন্ত গরম নিউইয়র্কের খোলা আকাশের নিচে পা

দিয়েই বুঝলুম, এর চেয়ে তুলনায় বোধহয় আমাদের কলকাতাও ঠান্ডা। আকাশ নির্মেঘ এবং বিকেল সাড়ে ছটাতেও প্রচণ্ড রোদে চারদিক খৈ-ভাজা হয়ে যাচ্ছে।

একটি উল্লসিত চিৎকার কানে এল, শীর্ষেন্দুদা ! এই যে !

ভিড়ের একেবারে শেষে হাসিমুখে ধ্রুব দাঁড়িয়ে। ট্রলিটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঠেলে নিতে নিতে বলল, কোনও কষ্ট হয়নি তো !

আমি সামনের রাস্তাটির দিকে নিবিষ্টভাবে চেয়ে দেখছিলুম। আমেরিকায় আমার প্রথম দেখা দৃশ্য সেটি। কলকাতায় অ্যাম্বাসাডার, মারুতি আর ফিয়াট দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। গাড়িটাড়ি দেখতে আমি বেশ ভালবাসি। আমেরিকায় প্রথম দৃশ্যটিই ছিল গাড়িতে আকীর্ণ। আর লেমুজিন থেকে শুরু করে কত না দুর্দান্ত মডেলের গাড়ি সটাসট চলে যাচ্ছে। ভারি মসৃণ ঝকঝকে তকতকে রাস্তা। ধুলোময়লার বালাই নেই।

গাড়ি পার্ক করার সমস্যাটি যে কত জটিল আর কঠিন তার দুশ্চিন্তা-উদ্রেককারী তা পরে বুঝেছি। এয়ারপোর্ট বড় বড় ক্যাসিনো বা শপিং সেন্টারে বহু টিয়ার বিশিষ্ট বিশাল কার পার্ক এলাকায় কোথায় গাড়িটি পার্ক করা আছে তা অনেক সময়ে গাড়ির মালিকও বুঝে উঠতে পারে না। এই সমস্যায় আমাকে বেশ কয়েকবার পড়তে হয়েছে। কেনেডি এয়ারপোর্টের অবস্থা আরও ভয়াবহ।

কিন্তু ধ্রুব বছরে চার বার কলকাতায় আসে। তাছাড়া সে নিউইয়র্ক শহরটাকে চেনে নিজের হাত দু'খানার মতোই। তাই সে এমন জায়গায় গাড়িটিকে রেখেছিল যাতে বিশেষ হাঁটতে না হয়। রাস্তাটা পার হয়ে কয়েক পা হাঁটতেই তার পার্ক করা গাড়িটির কাছে পৌঁছে যাওয়া গেল।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত তার জাপানি গাড়িটির নাম সুবারু। ব্যবসার কারণে খাটানো হয় বলে গাড়িটিতে কমার্শিয়াল লাইসেন্স প্লেট লাগানো। পার্কিং-এর কিছু অগ্রাধিকার এসব গাড়িকে দেওয়া হয়। তার গাড়িটির মজা হল, পেছনের সিট দুটির হেলান দেওয়ার অংশটি নামিয়ে দিলেই তা ডেলিভারি ভ্যান হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হয়ে ওঠে। পার্কিং-এ রাখার সময় তা ওভাবেই রাখতে হবে, নইলে পুলিশ ধরবে।

স্যুটকেসটা আমার যথেষ্ট হালকা। তবু বিশালদেহী বলবান ধ্রুব আর আমাকে মালপত্র ছুঁতে দিল না। নিজেই গাড়িতে তুলল। ফুটিফাটা গরম আর রোদ থেকে তার গাড়ির শীতল অভ্যন্তরে প্রবেশ করামাত্রই আরামে চোখ বুজে এল। কলকাতায় এখন শেষ রাত্রি। আমেরিকায় বিকেল সাড়ে ছটা মানে কলকাতায় ভোর সাড়ে চারটে। আমার এখন গভীর ঘুমে মগ্ন থাকার কথা। তার ওপর আবার আগের রাত্রিটাও গেছে নিদ্রাহীন। ঘুমকাতর দুটি চোখকে টিন ওপেনার দিয়ে খুলে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

তবু যে আমি ধ্রুবর গাড়ি শীতল আরামে ঘুমিয়ে পড়লুম না, তার কারণ, আমার সামনেই বিশাল প্যানোরামিক চেহারা নিয়ে নিউইয়র্ক। সামান্য কুয়াশার মতো এক মায়াবী আবরণের ভিতর দিয়ে সেই স্বপ্নের শহর দেখা দিচ্ছে।

টালহীন, গর্তহীন অতীব মসৃণ ঝকঝকে পথ। কী বিশাল চওড়া। আর এক একটা রাস্তায় কতগুলো করে লেন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই পথ চলার নিয়ম হল "কিপ টু দি রাইট।" কিন্তু বামাচারী ভারত থেকে আসার ফলে জানা সত্ত্বেও বারবার মনে হচ্ছিল, এই রে, ধ্রুব বুঝি রং সাইডে গাড়ি চালাচ্ছে।

নিদ্রাকাতর দুই চোখ মেলে বাঁ দিকে চেয়ে আছি। নিউইয়র্ক শহর ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। তবু আমরা শহরে ঢুকব না। শহর এড়িয়ে আমরা হাডসন নদী পেরিয়ে ঢুকে যাবো নিউ জার্সিতে। দূর থেকে যেটুকু দেখা গেল, তাতেই বুঝলুম মহানগর বলতে সত্যিই কাকে বোঝায়।

রাস্তাঘাট ভাল, বাড়িঘর ভাল, এসব তো জানিই। কিন্তু যে ব্যাপারটা চোখকে মুগ্ধ করে রাখে তা হল, প্রকৃতি। কত যত্নে এরা প্রকৃতিকে রচনা করে। কত মাথা খাটিয়ে শহরের সঙ্গে প্রকৃতিকে মিশিয়ে দেয়। গাছপালার মধ্যে যে জীবনীয় সম্পদ আছে তা কত গভীরভাবে এরা অনুধাবন করেছে!

আমেরিকার রাস্তাঘাটের পরিকল্পনা কার মাথা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তা আমি জানি না। কিন্তু এরকম অদ্ভুত রাস্তাঘাট পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে কি না বলা শক্ত। হাইওয়ে আমেরিকার এক বিস্ময়। হাইওয়ের সঙ্গে কোথাও কোনও রাস্তার কাটাকুটি নেই, ট্র্যাফিক সিগন্যাল নেই। কিন্তু অগুন্তি একজিট আছে, যা ধরে হাইওয়ে ছেড়ে কোনও শহরে পৌঁছোনো যায়। এই ঐন্দ্রজালিক রাস্তার প্ল্যানিং আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার আরও কয়েকদিন সময় লেগেছিল। ধ্রুবর সঙ্গে গাড়িতে প্রথম আমেরিকার অভ্যন্তরে ঢুকতে ঢুকতে সেটা ভাল টের পাইনি।

রাস্তার মাঝে মাঝে টোল নেওয়ার অবরোধ আছে। ধ্রুবর গাড়িতে ড্যাশবোর্ডের নিচে খুচরো রাখার খোপ ভর্তি আধডলার সিকি ডলারের মুদ্রা দেখে বললুম, ওগুলো রেখেছো কেন?

ধ্রুব হেসে বলল, এ হল শনিপুজোর প্রণামী। রাস্তায় কত ঠেক আছে।

টোল দিতে হয় কেন?

না দিয়ে উপায় নেই। এইটেই নিয়ম। রাস্তাঘাট মেনটেন করার খরচও অনেক। আমরাও মাইন্ড করি না।

নিজের পোশাক সম্পর্কে একটু সঙ্কুচিত ছিলুম। আমার তেমন অভিজাত সাহেবী পোশাক-টোশাক নেই। কিন্তু পাশের লেন-এ দেখলুম এক সাহেব দিব্যি খালি গায়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

ধ্রুব, এ যে আদুড় গা সাহেব দেখছি।

গরমে বেশির ভাগই আদুড় গা। ওরা পোশাকের তেমন ধার ধারে না। পায়ে অবশ্য জুতো মোজা থাকে, নইলে অনেক দোকানে বা রেস্তরাঁয় ঢুকতে দেয় না।

আমেরিকায় এখনও এত ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে যে সেগুলো ভরে তুলতে আমেরিকানদেরও বহু বছর লেগে যাবে। রাস্তার ডাইনে বিশাল প্রান্তর, গাছপালা, বনভূমি চোখে পড়ছিল। সর্বত্র সবুজের সমারোহ। সবুজের সংবর্ধনা। এত বড় দেশকে নির্মাণে নির্মাণে ভরে তোলা কঠিন কাজ। অবশ্য ভরে তুলতে তাবা আগ্রহীও নয়।

হাডসন নদীর তলায় একাধিক প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথ আছে। আমরা অবশ্য একটি সেতু পেরিয়ে নিউ জার্সিতে ঢুকলুম। রাস্তার গাড়ির পর গাড়ি, গাড়ির মিছিল চলেছে। মাঝে মাঝে অতিকায় আঠারো চাকার ট্রাক পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ট্রাকগুলো দেখলেই ভয় করে। ওই সব চলতি ট্রাকের একটু ধাক্কা লাগলেই যে কোনও গাড়ি ছিটকে তালগোল পাকিয়ে যাবে।

আমার প্রশ্নের শেষ ছিল না, ধ্রুবরও জবাব দেওয়ার ক্লান্তি ছিল না।

অনেকটা পথ। কমবেশি ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইল বেগে চলেও রাস্তাটা পেরোতে বোধহয় ঘণ্টাখানেক বা তার বেশি লেগেছিল। বলা বাহুল্য রাস্তায় জ্যাম ছিল না এবং রাস্তাও তো আগেই বলেছি—অতি অতি উত্তম। নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে হাডসন নদী পেরিয়েই এক সবুজ, প্রগাঢ় গহিন রাজ্যে চলে এলুম।

এ হল নিউ জার্সি, এক প্রকৃতিসমৃদ্ধ রাজ্য। ছোটো ছোটো অজস্র পাহাড়-শহরে আকীর্ণ।

ভবানী আর আলোলিকার বাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই দম্পতির সঙ্গে অনেকদিন আগে একবার আলাপ হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকার দফতরে। প্রবাসী বাঙালিরা দেশে এলে 'দেশ' পত্রিকাব দফতরে একবার করে এসে থাকেন। অনেকের সঙ্গে এইভাবে পরিচয়। কিন্তু দীর্ঘ অসাক্ষাৎকারে তাঁদের মুখশ্রীর সঙ্গে নাম মেলাতে পারি না। তাই ধ্রুব যখন ভবানী আর আলোলিকার কথা বলল তখন কোনও মুখশ্রী ভেসে উঠল না চোখের সামনে। তবে লেখেন বলে আলোলিকার নামটি আমার পরিচিত।

হাইওয়ে ছেড়ে ধ্রুবর গাড়ি একজিট ধরল। চারদিকে যে বাড়িঘর, ঘাসের লন আর প্রকৃতির শোভা দেখা যাচ্ছে তাকে কিছুতেই বাস্তব ও সত্য বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কেউ এঁকে রেখে গেছে। বাড়িঘর রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছি কিন্তু কোথাও কোনও পথ চলতি মানুষ নজরে পড়ছে না। একটা কুকুর বা বেড়াল অবধি কোথাও নেই। এ যেন সব ভুতুড়ে শহর।

আজকাল নতুন নিয়মে বসবাসের এলাকায় কোনও দোকানপাট বসবার

নিয়ম নেই। এমন কি বসত এলাকায় কোনও ডাক্তার বাস করলেও তাঁর প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ। বসত এলাকা একান্তই বসত এলাকা। শপিং সেন্টার বা বাজার অনেকটাই দূরে। গাড়ি ছাড়া উপায় নেই বাজার করার।

এরকম কয়েকটা শপিং সেন্টার আমাদের পথে পড়ল। চারধারে বিশাল চত্বর এবং পার্কিং লট। মাঝখানে বিশাল বাড়ি। এই সব শপিং সেন্টারের বিশালত্ব এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে তখনও ধারণা হয়নি। ঘুম-ঘুম চোখ জোর করে খুলে রেখে একটু আলগাভাবে দেখে দেওয়া মাত্র।

আমেরিকার ম্যাপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন পঞ্চাশটি অঙ্গরাজ্যে সমন্বিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শহরের সীমাসংখ্যা নেই। আমেরিকার বড় শহরগুলির নাম সকলেই জানে, কিন্তু যে অজস্র সমৃদ্ধ ছোটো শহর আছে তার হিসেব বেশি লোক রাখে না। শহরে বাস করার সর্বরকম সুবিধাযুক্ত এই সব শহরকে পল্লীশ্রীমণ্ডিত করে রাখা হয়েছে। আর এইখানেই তাদের রুচি বোধে লেগেছে উঁচুদরের শিল্পের ছোঁয়াচ। শহরকে যে এমন শান্ত সুন্দর করে তোলা যায় তা না দেখলে প্রত্যয় হয় না। ছোটো ছোটো শহরগুলোতে পথে যেতে যেতেই চোখে পড়ল সুইমিং পুল, পার্ক, টেনিস কোর্ট, গলফ কোর্স, বিশাল বিশাল স্কুল, পরিষ্কার জলাশয়, খোলা মাঠ, বনভূমি। বনভূমির মধ্যেও রয়েছে একান্তে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সযত্নরচিত বনপথ, রয়েছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর সুচারু ব্যবস্থা। প্রতিটি বাড়িরই সামনে ও পিছনে প্রশস্ত লন রাখা আবশ্যিক।

ওয়েন এইরকমই একটি শহর। শহর বলতে যা বোঝায় তা নয় মোটেই। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে শহর যেরকম হয়ে থাকে সেরকম নয়। আবার পল্লীগ্রামও তাকে বলা যায় না। ঈষৎ উচ্চাবচ ভূখণ্ডের ওপর বওয়ানো সবুজের বান। তার মাঝে মাঝে পটে আঁকা ছবির মতো বাড়িঘর, আপনি ওয়েন বা ওয়েন-এর মতোই যে কোনও ক্ষুদে শহরেও আধুনিকতম গাড়ি, দুর্লভতম ওষুধ, আধুনিকতম চিকিৎসা, অত্যাধুনিক কম্পিউটার বা যন্ত্রপাতি, সুইডেনের চিজ বা মেকসিকোর আম সবই পাবেন। আর পাবেন এক অতিশয় নির্জন, দূষণমুক্ত, ঝিম-ধরা পরিবেশ।

ওয়েন-এর কিউয়ানিস ড্রাইভে ভবানী-আলোলিকার বাড়ির সামনে যখন গাড়ি থামল তখন আমার ঘুমহীন দ্বিতীয় রাত্রিও শেষ হয়ে গেছে। যদিও মার্কিন সময়ে বিকেল সাতটা বা সাড়ে সাতটা। বিকেল বললুম—আসলে বিকেলও নয়, কারণ তখনও অতিশয় ঝলমলে রোদ চারদিকে।

এখানে কখন সন্ধে হয় ধ্রুব ?

রাত সাড়ে আটটা।

মনে মনে প্রমাদ গুনলুম। আমার দিনটা আর কত লম্বা হবে ? বোম্বাইতে

ভোর হয়েছিল, আর তারপর এই নিউ জার্সি অবধি ওই একটাই দিন শেষ হতে চাইছে না। তার ওপর সন্ধে হবে সাড়ে আটটায়!

ঘাসের লনের মাঝখানে দোতলা চমৎকার ছিমছাম বাড়িটার সামনে যখন নামলুম তখন দীর্ঘক্ষণ শুধু বসে থাকার জন্য শরীরের-একটা কাঠ কাঠ ভাব টের পাচ্ছিলুম।

আলোলিকা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিলেন। কলিং বেল বাজানোর আগেই দরজা খুলে একটি হাসিমুখ প্রকাশিত হল। কৃত্রিম হাসি নয়। ভারি উজ্জ্বল খুশির হাসি।

আসুন।

হাঁফ ছাড়লাম। ওই হাসি দেখেই মনে হল, এঁরা খোলামেলা মানুষ। ফর্ম্যালিটির হ্যাপা পোয়াতে হবে না।

আমার সব কিছুই জানবার আগ্রহ। এঁদের ঘরদোর কেমন করে সজানো? খুব সাঙ্ঘাতিক ঝঁ-চকচকে কি? খুব অন্য ধরনের সব আসবাব?

ঘরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। হ্যাঁ, বটেই তো, এঁরা আমেরিকায় থাকেন, আর আমেরিকা হল পয়সার দেশ। সুতরাং ঘরদোর অন্যরকম হবেই। কিন্তু সেটা বিস্ময়কর নয়, কারণ সেসব বিস্ময়ের জন্য আমি তৈরি ছিলুম। ঘরে ঢুকে যেটা ভাল লাগল তা হল, পরিবেশটি ভারি ঘরোয়া, মোটেই ভড়কে যাওয়ার মতো নয়। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তর ওখানে সব বাড়িরই। কার্পেট টার্পেট তো থাকারই কথা। কিন্তু ওসব থাকা সত্ত্বেও খুব বেশি 'ফরেন' লাগল না।

বিদেশিয়ানার ব্যাপারটা মানসিক। ঘরদোর আসবাবপত্রে তার স্বীকরণ তো থাকার কথা নয়। সেটা দেখতে হয় মানুষের স্বভাবে। আমি বিদেশিয়ানাকে বেশ ভয় পাই। বিদেশীদের চরিত্রে যেটা থাকে সেটা আমার কাছে বিদেশী হলেও তার স্বদেশিয়ানা। সুতরাং তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। কথা হল, বাঙালি বা স্বদেশী লোকজনের মধ্যে যে বিদেশিয়ানা সেটাই ভারি ভয়াবহ।

এ বাড়িতে আর যাই হোক, বিদেশিয়ানা ব্যাপারটা অনুপস্থিত। আলোলিকা নিকষ্যি বাঙালি। একটু বাদে যখন ভবানী এল তখন সেই বাঙালিয়ানা আরও স্পষ্ট হল। ভবানী মুখার্জি নামেই বামন নয়, গলায় ধপধপ করছে পৈতে। এই দূর বিদেশেও।

আমাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল বলে প্রায় সকলেই গালমন্দ করে থাকে। বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবেরা। তার ওপর গুরুবাদ নিষ্ঠার সঙ্গে মানি একটু ঠাকুর ঠাকুর করি। সুতরাং আমার দোষের সীমা নেই।

তবু আমার কেন যেন মনে হয়, রক্ষণশীলরা রাখে। প্রগতিবাদীরা ভাঙে। দুটোর মধ্যেই ভাল মন্দ দুটোই আছে। আমার পক্ষপাত রক্ষণশীলদের প্রতিই। তা তাতে যে যা খুশি বলুক না কেন।

বসবার ঘরটিতে জমিয়ে বসা গেল। দীর্ঘ বিমান-যাত্রা ও জেটল্যাগের ক্লান্তি এক কাপ গরম চা-এই উড়ে গেল। অ্যাশট্রে খুঁজে পেতে একটু দেরি হল, কারণ, সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস বাড়ির কর্তার নেই।

সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে আমেরিকায় বেশ লজ্জায় পড়তে হয়েছে। যাওয়ার সময় এরোপ্লেনে স্মোকিং জোনে বসেছিলুম। কিন্তু সেখানে যেমন তিন-চারজনের বেশি মানুষকে সিগারেট খেতে দেখিনি, তেমনি আমেরিকাতেও খুব কম মানুষকেই ধূমপানে রত দেখেছি। এই বদ অভ্যাসটিকে ওরা প্রায় দেশছাড়া করতে চলেছে। ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার আর ব্যক্তিগত ভয় দুটোই কাজ করেছে ধূমপান প্রতিরোধে।

দু কাপ চা শেষ করার পর ভবানী অফিস থেকে ফিরল। আড্ডা জমে যেতে একেবারেই দেরি হল না। এত চট করে এই পরিবারের সঙ্গে ভাবসাব হয়ে যাবে এমনটা ভাবাই যায়নি।

কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর ধ্রুব চলে গেল। সে থাকে নিউইয়র্ক রাজ্যের সাফাচন শহরে। বেশ দূর।

আলোলিকা বললেন, এবার রাতের খাবারটা খেয়ে নিন। হাতমুখ ধোবেন না ? খিদে পেয়েছে তো !

এখন ভাত খাবো ? এখনও যে বাইরে রোদ্দুর।

খুব হাসলেন ওঁরা। বললেন, এখানে এ সময়েই খেতে হয় যে। এখন রাত সাড়ে আটটা।

আমার থাকার জায়গা হল মাটির নিচেকার ঘরে। বেসমেন্টে। বেসমেন্টের ঘরটি সাধারণত বড়ই হয়ে থাকে। অনেক সময়ে যত বড় বাড়ি প্রায় তত বড় বেসমেন্ট। আলোলিকাদের বেসমেন্টটি দেখামাত্র আমার পছন্দ হয়ে গেল। খেলনা, বই আর ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি দেখে বুঝলুম এটি ওদের মেয়ের খেলার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত। সারা ঘরে চমৎকার নরম কার্পেট বিছানো, প্রশস্ত বিছানা। লাগোয়া বাথরুম।

আমেরিকা বা বিদেশে বাথরুম ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে অপ্রস্তুত এবং বিপন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়ে আমাকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আগেই কিছু পাঠ দিয়ে রেখেছিল। বাকি পাঠ দিল ভবানী।

সোজা কথায় বালতিতে জল নিয়ে মগে করে ঘপাঘপ জল ঢেলে সারা বাথরুম ভিজিয়ে চান করার উপায় নেই সেখানে। বাথরুম যেমন খটখটে শুকনো আছে ব্যবহারের পরও অবিকল তেমনই থাকবে। মুখ ধুতে হলে সাবধানে ব্যবহার করতে হবে বেসিন। তাও কুলকুচো করা জল তাতে ফেলা চলবে না। কারণ সাহেবরা বেসিনের ফুটো বন্ধ করে তাতে জল ভরে নিয়ে আঁজলা করে

সেই জল তুলে মুখে দেয়। বাঙালি বাড়িতে সেরকমটা করা হয় না বলে বেসিনটি যদৃচ্ছা ব্যবহার করা চলে। স্নানের ব্যবস্থা হয় বাথটাবে, নয়তো ফাইবারের তৈরি ছোট্ট চৌখুপিতে। প্লাস্টিকের জলপ্রতিরোধক পর্দাটি ভাল করে টেনে নিতে হবে, নইলে জলের ছিটে বাথরুম ভেজাবেই। মনে রাখতে হবে আমেরিকার বেশির ভাগ বাথরুমেই মহার্ঘ কার্পেট পাতা থাকে। আর বাথরুমে সিগারেট খেতে হলে অবশ্যই একজস্ট ফ্যানটি চালিয়ে নিতে হবে। কারণ বাথরুমে আর কোনও বায়ু চলাচলের রাস্তা নেই। সিগারেটটি জল দিয়ে নিবিয়ে গারবেজের ঝুড়িতে ফেলতে হবে। নিবিয়ে না ফেললে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা। টিস্যু পেপার ব্যবহারের পর কমোডে ফেলতে নেই। তা ফেলতে হবে গারবেজে। বাথরুম ব্যবহারের বিধিনিষেধ ঠিকমতো পালন না করলে গৃহকর্তা বা কর্ত্রীকে ভীষণ বিপদ ও খাটুনিতে ফেলে দেওয়া হবে। বেসিন এবং শাওয়ারে ঠাণ্ডা ও গরম জলের ট্যাপ আছে। ঠাণ্ডা জল সারা বছরই ভীষণ ঠাণ্ডা। গরম জল একেবারে ফুটন্ত গরম। তাই এই দুটিকে সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে নিতে হবে। প্রথম প্রথম একটু আধটু ভুলভাল হলেও কয়েকবারের চেষ্টায় সঠিক তাপের জলের মিশ্রণ তৈরি করা কঠিন নয়।

স্নান করে লুঙি পরে ও গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আরও ঘরোয়া হওয়া গেল। ঘুমের একটা আলস্য টের পাচ্ছি কিন্তু ঢুলে পড়ছি না। ভিতরটা একটু শুকনো লাগছে চোখে একটু জ্বালা।

আলোলিকা অতি যত্নে সুক্তো, এঁচোড়ের ডালনা ইত্যাদি বহু পদ রেঁধেছেন। ঘরে পাতা দৈ অবধি। মার্কিন মূল ভূখণ্ডের প্রথম খাদ্য গ্রহণ করেই ভারি ভাল লাগল। আলো বাঙালিমতোই রাঁধেন। মশলা সবই পাওয়া যায় এখানে। যেসব মশলার মানও অনেক উন্নত এবং তা শতকরা একশো ভাগই খাঁটি। ভেজাল জিনিস চালানো মার্কিন দেশে অসম্ভব। উপরন্তু সবজিও চমৎকার। যে এচোড় আলো রেঁধেছেন তা আসে মেকসিকো থেকে। অবশ্য কৌটোজাত। আগে পটল পাওয়া যেত না। আজকাল কৌটোর পটল পাওয়া গেলেও দিশি পটলের মতো স্বাদ নয়। আর লাউটাউ ওখানে বাঙালিদের বাগানেই অজস্র ফলে। আলো যে দৈটি পেতেছেন সেটি আমেরিকার বিখ্যাত দুধের তৈরি। এমন জমাট ও সুস্বাদু যে মনে হয়, এমনটি কখনও খাইনি।

আমেরিকায় গিয়ে আর কিছু না হোক দুধটা খেয়ে দেখা দরকার। আসল দুধের বিস্মৃত স্বাদ পেয়ে যেন পূর্বজন্মেব কথা স্মরণ হবে। পুরো ক্রিমওয়ালা দুধ খেলে তো কথাই নেই। পুরো ক্রিমসমৃদ্ধ বা ক্রিম টেনে নেওয়া বহু রকমের দুধ পাওয়া যায়। যার যা সয় সে তাই কিনে খেতে পারে। ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ারই প্রচলন। জ্বাল দেওয়া গরম দুধ কাউকে বড়ো একটা খেতে দেখিনি।

প্লেনের খাবার তখনও খিদে পেতে দেয়নি। তবে খানিকটা রান্নার গুণে আর খানিকটা আমেরিকার অতীব স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ার আনুকূল্যে খাওয়াটা জমে গেল। বিশেষ করে গল্পে গল্পে।

খাওয়ার পরই প্রস্তুত পান মশলা এবং জর্দা। সবই পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশের দামে নয় এই যা। এক কৌটো পান পরাগের দাম কলকাতায় কুড়ি টাকা হলে ওখানে ডলারে তা পড়বে যাট টাকার মতো। তবে ডলারকে ওখানকার বাঙালিরাও টাকা হিসেবেই ভাবে বলে গায়ে লাগে না। তারা ডলারকে টাকা বলেই উল্লেখ করে।

আমেরিকায় পদার্পণের পর থেকেই আমি চোখ কান ও বোধকে সজাগ রেখেছি। একটি মুহূর্তেও আনমনা হচ্ছি না। স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে যতদূর সম্ভব বুঝে ও জেনে নিতে হবে।

ভবানী অফিস থেকে ফেরার পথে একটা খবরের কাগজ এনেছিল। খবরের কাগজে কাজ করি বলেই বোধহয় এ জিনিসটার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু কাগজ হাতে নিয়ে বুঝলুম খবরের কাগজ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী সমস্ত ধারণা নস্যাৎ হয়ে গেল। একটা দৈনিক পত্রিকায় যদি পঞ্চাশ ষাটটা করে পৃষ্ঠা থাকে তাহলে ধারণাটা বজায় রাখি কি করে ?

ভবানী হাসছিল। বলল খবরের কাগজ পড়ে শেষ করতে পারবেন না। আমরাও পড়ি না, বিশেষ বিশেষ কিছু খবর ছাড়া। রবিবারের কাগজ দেখলে তো আঁতকে উঠবেন।

নিউইয়র্ক টাইমসটি সুতরাং কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে রেখে দিতে হল। খাওয়ার পর হাই উঠছে, ক্লান্তি লাগছে।

শুয়ে পড়তে চাই কিনা জিজ্ঞেস করল ভবানী। মাথা নেড়ে বললুম না। আমি জানতে চাই। অনেক কিছু জানতে চাই।

জানাতে তারাও অনাগ্রহী নয়। ফলে ফের এক প্রস্থ আড্ডায় বসে যাওয়া গেল। সঙ্গে পান পরাগ জর্দা, সিগারেট এবং প্রয়োজনে চা বা কফি।

কথায় কথায় আলো বলল, ভাল কথা আপনার হেলথ ইনসিওরেন্স করা হয়েছে। ফর্মটায় সই করতে হবে।

অবাক হয়ে বললুম হেলথ ইনসিওরেন্সের কী দরকার হল ?

ভবানী বুঝিয়ে বলল, ইনসিওরেন্স না থাকলে ভগবান না করুন যদি বাইচান্স কোনও অসুখ-বিসুখ হয় বা হাত-পা ভাঙে তাহলে যা খরচ লাগবে তা কল্পনার বাইরে।

কেন, এরকম কেন ?

এদেশের এরকমই রীতি। ধরুন কারও যদি পা ভাঙে তবে হাসপাতালে নিয়ে

গেলে তারা যা চার্জ করবে তা দাঁড়াবে আমাদের দেশের পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশি।

আমার চোখ কতটা গোল গোল হয়ে উঠেছিল তা আমি দেখিনি।

ইনসিওরেন্সের খরচ একশো আটাশ ডলার। তিন মাস মেয়াদ।

ভবানী ঠাট্টা করে বলল, ওপেন হার্ট সার্জারি করার দরকার পড়লেও তা ওই একশো আটাশ ডলারেই কভার করা আছে।

শুনে একটু লোভও হল। কোনও দিন আমার ওপেন হার্ট সাজারির দরকার পড়বে কি না জানি না। যদি ভবিতব্যে তাই থাকে তবে সেটা এই মাসখানেকের মধ্যে ঘটে যাক না কেন। মার্কিন সরকারের ঘাড়ে ভর করে ফাঁড়াটা কাটিয়ে যেতে পারি তাহলে। আর লাভটাও দেখতে হচ্ছে। ঠ্যাঙ ভাঙলেই যদি এদেশে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয় তাহলে হার্ট সার্জারিতে তো লাখো লাখো টাকা লেগে যাবে।

আমেরিকার ডাক ব্যবস্থা কেমন তাই অব্যবস্থ ডাকের দেশে বসে কল্পনাও করা যাবে না। এই তো মাত্র মাস তিনেক আগে আন্ডার সারটিফিকেট অফ পোস্টিং তিনটি চিঠি ছেড়েছিলুম, তার দুটি নিখোঁজ, একটি মাত্র পৌঁছেছে। কলকাতারই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চিঠি যেতে আজকাল তিন চার দিন লেগে যাচ্ছে বা কখনও কখনও তারও বেশি। আমেরিকায় আমার প্রথম ডাক অভিজ্ঞতা ঘটল ওই ইনসিওরেন্স নিয়েই। বিকেলে আলোলিকা ইনসিওরেন্সের ফর্মটি আমার স্বাক্ষর সহ ডাকে দিলেন। পরদিন এনডোর্সড হয়ে সেটি ফিরে এল। শুধু ডাক ব্যবস্থাই নয়, অফিসের কাজও চোখের পলকে ঘটে যেতে দেখে আমার চোখ ক্রমশ বর্তুল থেকে বর্তুলতর হতে লাগল।

নির্জন নিঃশব্দ মশাহীন পোকাহীন বেসমেন্টের ঘরে শুতে যাওয়ার সময় মনে মনে ভাবলুম, টেনে ঘুমোবো। অনেক বেলা পর্যন্ত। দু রাত্তির ঘুম নেই।

কিন্তু তখনও জেট ল্যাগ কাকে বলে, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। আমার শরীরের টিউনিং হয়ে আছে কলকাতার দিন রাত্তির সকাল বিকেলের সঙ্গে। আমেরিকার দিন রাত্তির সকাল বিকেলকে আমি বোধ বুদ্ধি দিয়ে মানলেও আমার শরীর মানবে কেন! এইজন্য জেট ল্যাগ কাটাতে ঘুমের ওষুধ খাওয়া ভাল।

আমি খাইনি। প্রথম রাতটা দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লুম। কিন্তু রাতে তিনটেয় সম্পূর্ণ জেগে টান টান হয়ে উঠে বসলুম বিছানায়।

রাত তিনটেয় ভূতগ্রস্তের মতো বসে থেকে বুঝতে পারলুম, এটাই সেই বিশ্রুত জেট ল্যাগ।

আমেরিকার এই সব পল্লীশহরের নির্জনতা এতই নিরেট এবং পরিপূর্ণ যে

কানে তালা ধরে যায়। উপরন্তু বাড়ির ভিতরটা শীতাতপনিয়ন্ত্রণের জন্য মোটামুটি শব্দনিয়ন্ত্রিতও বটে। মাটির নিচেকার ঘর বলে নৈঃশব্দটা একেবারে জমে বসে আছে। এই শব্দহীনতা আর অন্ধকারের একরকম উপভোগ্যতা আছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকতে হল। ভারি অদ্ভুত লাগছিল। দক্ষিণ কলকাতায় আমার যে বাসা সেখানেও যথেষ্ট নির্জনতা রয়েছে, কিন্তু তা এমন জমাট নয়। একমাত্র আকাশবাণীর স্টুডিওতে এরকম নৈঃশব্দ্য আছে।

ঘরের সিলিং-বরাবর গোটা দুই স্কাইলাইট আছে। সেদিকে চেয়ে রইলুম, ভোরের আলোর প্রতীক্ষায়। কিন্তু ভোরের এখনও অনেক দেরি। শরীরে ঘুমের কিছুমাত্র রেশ নেই। বাকি রাতটা তাহলে কাটানো যায় কিভাবে? উঠে আলো জ্বেলে বই পড়ব? পায়চারি?

কিছুই করলুম না। শুয়ে থেকে মনে মনে কলকাতায় ফিরে গেলুম। সেখানে এখন পরদিন দুপুর। ছেলেমেয়েরা যে যার স্কুল-কলেজে। তাদের মা নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে অবশ্যই উৎকণ্ঠ সময় কাটাচ্ছেন। বাইরে শান্ত দুপুর। খর রোদ। ধুলো ময়লা।

দু একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেলুম। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। তারপর শোনা গেল পাখির ডাক। স্কাইলাইটের কাচে ধূসর আলোর আভাস।

আমি উঠে পড়লুম। হাতমুখ ধুয়ে পুজোপাঠ সেরে আমি যখন ওপরে উঠলুম তখন ঘড়িতে সাতটা বেজে গেছে। গৃহকর্তা অফিসে রওনা হয়ে গেছেন।

আমি বাইরে এসে ঘাসের লন, রাস্তা এবং সামনের অরণ্যের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলুম। আজও বিভ্রম ঘটেছিল। যা দেখছি তা যেন সত্যি নয়, যেন আঁকা।

প্লাস্টিকে মোড়া একটা খবরের কাগজ ঘাসে পড়ে আছে অবহেলায়। কুড়িয়ে নিলুম। বেশ হৃষ্টপুষ্ট কাগজ। পৃষ্ঠসংখ্যা অবিশ্বাস্য। কম করেও ত্রিশ চল্লিশ পৃষ্ঠা। আগাগোড়া ঝকঝকে ছাপা এবং বেশির ভাগ পাতাই বহুবর্ণ। এটা স্থানীয় সংবাদপত্র এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরিত হয়ে থাকে। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি সাত সকালে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়। গৃহস্থরা যদি দয়া করে উল্টেপাল্টে একটু দেখেন। কিন্তু গৃহস্থদের সকালের খবরের কাগজ দেখার না আছে সময়, না গরজ। সুতরাং এই সব খবরের কাগজ মোড়ক-বন্দী অবস্থাতেই গারবেজে নিক্ষিপ্ত হয় প্রতিদিন।

কিন্তু আমি খবরপিপাসু লোক। মার্কিন সংবাদপত্রের চরিত্র বুঝতেও আগ্রহী। সুতরাং খবরের কাগজটি খুলে মন দিয়ে দেখতে লাগলুম। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে বিজ্ঞাপনের আধিক্য অতীব বিস্ময়কর। আমাদের দেশের প্রথম

শ্রেণীর বহুল প্রচারিত কাগজেও এত বিজ্ঞাপন কল্পনাও করা যায় না। ওয়েনের মতো ছোট্ট একটু জায়গায় এরা এত বিজ্ঞাপন পায় কি করে?

আলোলিকা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে বাইরে এসে বললেন, তাই বলুন, আপনি বাইরে চলে এসেছেন। আমি তো পাছে ঘুম ভাঙে সেজন্য পা টিপে টিপে চলাফেরা করছি।

বললুম, ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙেছে। মাঝরাতে।

আলোলিকা বললেন, তাহলে তো আপনার বেশ জেট ল্যাগ হচ্ছে। অবশ্য ওটা হবেই। আজ ঘুমের ওষুধ খেয়ে নেবেন কি?

মাথা নাড়লুম, না। ঘুমের ওষুধটাকে বড্ড ভয় পাই। আমার ঘুম এমনিতেই চাষাড়ে। ও কেটে যাবে।

আলোলিকা অতি সুচারু ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করেছেন। ঠাণ্ডা দুধে অতি সুস্বাদু সিরিয়াল, সুস্বাদু পাঁউরুটিতে সুস্বাদু মাখন, আম, মিষ্টি ইত্যাদি। সকালে এত খাওয়ার অভ্যাস নেই। কিন্তু খেতে হল। যস্মিন দেশে যদাচার। ব্রেকফাস্ট একটু গুরুতর করাই নিয়ম। কারণ, দুপুরে ভাত খাওয়ার রেওয়াজ প্রায় নেই-ই। কর্তা গিন্নি ছেলে মেয়ে সবাই সকালে অফিস বা স্কুল কলেজে বেরিয়ে যান। লানচ সেখানেই সারতে হয়। বাড়িতে দুপুরের গুরুভোজনটাকে বাদ না দিয়ে উপায় নেই। কাজেই মোটামুটি ব্রেকফাস্টই সেখানকার সবচেয়ে গুরুগম্ভীর ভোজন।

একদিক দিয়ে দেখলে নিয়মটি ভালই। দুপুরে গুচ্ছের ভাত খেলে শরীরটায় একটা গড়িমসি ভাব আসে, ঘুম-ঘুম পায়, আলস্য আসতে চায়। এই কেজো দেশে আলস্যের চিন্তাও পাপ। সুতরাং ভাতটা দুপুরে না-খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কলকাতায় আমি কানাডার ভিসা করিয়ে আনিনি। অথচ নায়াগ্রা দেখার প্রবল ইচ্ছে। আজকাল দেশের বাইবে অন্য কোনও দেশে গেলে সেখান থেকে ভিন্নতর দেশে যাওয়ার ভিসা পাওয়া যায় না। তবে কানাডা ব্যতিক্রম, অন্তত আমেরিকা থেকে কানাডার ভিসা পাওয়া যায়। ধ্রুব সেটা কলকাতাতেই আমাকে জানিয়ে এসেছিল।

আজ ধ্রুব এসে আমাদের নিয়ে যাবে নিউইয়র্কে, কানাডার ভিসা করতে। সুতরাং তৈরি হয়ে নিতে হবে।

কিন্তু খবরের কাগজটায় একটু চোখ না বুলিয়ে পারছি না। আমার খবরের কাগজের নেশা দেখে আলোলিকা বললেন, তবু আপনার হাতে ওই কাগজ একটু মর্যাদা পেল, আমরা তো খুলেও দেখি না!

কেন খোলেন না?

আসলে ওটা লোকাল নিউজপেপার। তেমন কোনও খবর থাকেও না। তাছাড়া টিভিতে তো নিউজ চ্যানেলে সব সময়েই বিশ্বদুনিয়ার খবর প্রচার করা হচ্ছে, কাজেই লোকাল কাগজটা আমরা পড়ি না। তবে মার্কেটিং-এর দিন ওটা দেখতে হয়। কোন দোকানে কোন জিনিসের ওপর সেল দিচ্ছে তার খবর থাকে। অনেক সময়ে কুপনও দিয়ে দেয়। এছাড়া ও কাগজ আর কোনও কাজে লাগে না।

এখানে পুরনো খবরের কাগজের ঠোঙা হয় না। কাজেই পুরনো খবরের কাগজওলা মস্ত ঝোলা আর দু নম্বরি বাটখারা নিয়ে কাগজ কিনতেও উদয় হয় না। গারবেজ হয়ে এসব কাগজ নিক্ষিপ্ত হয় মার্কিনি কোনও ধাপার মাঠে। তবে ইদানীং এসব কাগজ রি-সাইক্লিং করার চেষ্টা চলছে। তাতেও অবশ্য গৃহস্থের লাভ নেই।

খবরের কাগজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ভারতবর্ষের খবর কিছুই পাওয়া গেল না। এমন কি গোটা এশিয়ার খবরই প্রায় অনুপস্থিত। ইওরোপের ওপাশে যে মানুষ বাস করে সেটাই যেন এদের জানা নেই।

আলোলিকা বললেন, এক-আধটা খবরের কাগজে নামমাত্র ওরিয়েন্টাল নিউজ থাকে। তাছাড়া ভারতবর্ষ কেন, গোটা প্রাচ্য সম্পর্কেই এরা উদাসীন।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখাও আমার প্রিয় কালক্ষেপ। এসব কাগজে বিজ্ঞাপনের বৈচিত্র্য দেখার মতো। জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন তো আছেই, এছাড়া সমকামীদের সঙ্গে যোগাযোগের বিজ্ঞপ্তি বা টেলিফোনে কেউ যদি নিছক গালাগাল শুনতে চান তারও প্রচার রয়েছে। সব মিলিয়ে এক খ্যাপাটে কাণ্ড। দেশটা বাইরে থেকে দেখতে এত সুন্দর, এর তলায় তলায় যে এত জটিলতা বা বিকৃতি আছে তা যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না।

ব্রেকফাস্টের পর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাড়ির সামনেই একটা বাঁক। অফিস টাইমে ওই বাঁকটা দিয়ে মুহুর্মুহু গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ি দেখতে লাগলুম। কত রকমের যে গাড়ি, কত ডিজাইন, কত রঙ এবং আকার। একজন করে সাহেব বা মেম গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেরই কানে ওয়াকম্যানের হেডফোন লাগানো, হাতে কফির পাত্র। না, কফি চলকাবে না, কারণ রাস্তায় খানাখন্দ নেই এবং এসব গাড়ির স্প্রিং ইত্যাদিও ভারি ভাল। মোড়ে কোনও ট্রাফিক লাইট বা পুলিশ নেই, তবু প্রতিটি গাড়িই মোড়ের কাছে এসে গাড়ির গতি একদম কমিয়ে দিচ্ছে, তারপর দুপাশ দেখে মোড় নিচ্ছে। ট্র্যাফিক আইন এখানে এমনই কঠোর এবং শাস্তিও এতটাই কঠিন যে মোটরবাজরা এখানে কদাচিৎ স্বাধীনতা নিতে পারেন। যদৃচ্ছাচারের কোনও সুযোগই নেই।

গাড়ি দেখছি বটে, কিন্তু ওয়েনের রাস্তায় একজনও পথচারীকে দেখছি না।

এমন কি সামনের বা পাশের বাড়িগুলোর লনেও কোনও মানুষ নেই। যত দূর চোখ যাচ্ছে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এমন জ্ঞানশূন্যতা দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। কেমন যেন অলৌকিক-অলৌকিক লাগে।

একটু বাদেই ধ্রুব এসে গেল।

নিউইয়র্ক শহরটা আজ কিভাবে কতটা দেখা যাবে তা নিয়ে তিনজনে একটু পরামর্শ করা গেল। ঠিক হল প্রথম যাওয়া হবে ইউ এন ও-র সদর দফতরে, তারপর কানাডার কূটনৈতিক অফিসে। তারপর যেমন তেমন বেড়ানো, বিকেল অবধি। কোন এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে কিভাবে যাওয়া হবে তাও ছক করে নেওয়া হল। আমেরিকায় এ ব্যাপারটা প্রায় আবশ্যিক। পথ ঠিক করে না নিলে অযথা ঘুরপথে গিয়ে তেলের অপচয় ঘটবে।

আমেরিকায় অবশ্য তেলটা বেজায় সস্তা। এক ডলারে এক গ্যালন। তাও আবার নিজে তেল ভরে নিলে অর্থাৎ সেল্‌ফ্‌ সারভিস হলে নব্বই থেকে পঁচানব্বই সেন্ট-এর মধ্যেই হয়ে যায়। কাজেই গাড়ি চালাতে গিয়ে মাইলেজ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা হয় না। তবে যেহেতু আমেরিকা দূরত্বের দেশ সেই হেতু সময় বাঁচানোর দিকে নজর রাখতেই হয়।

গাড়ির সামনের সিটে বসতে গেলে সিট বেল্ট লাগানো আবশ্যিক। না লাগালে এবং পুলিশের চোখে পড়লে ঝামেলা হবেই। এ পাঠ আগের দিন জে এফ কে থেকে আসার পথেই ধ্রুবর কাছ থেকে নিয়েছি। সুতরাং সামনের সিটে বসেই সিট বেল্ট এঁটে নিলুম। আলো পিছনে একা বসলেন।

হু হু করে গাড়ি উড়ে চলল নিউইয়র্কের দিকে। প্রশস্ত মসৃণ রাস্তা এবং দুধারে অতীব মনোরম বাড়িঘর, দৃশ্যাবলী। জানালার কাচ বন্ধ এবং এয়ারকন্ডিশনার চালু। ভিতরে কোনও শব্দ নেই বলে চলন্ত গাড়িতেও তিনজন গল্প করতে করতে যাচ্ছি। আশে পাশের লেনে, সামনে পেছনে গাড়ির পর গাড়ি। কাচ একটু খুললেই এত গাড়ির মিলিত ঝোড়ো শব্দ যখন কানে আসে তখন একটু ভয়-ভয় করে। মোটামুটি ঘণ্টায় পঞ্চান্ন মাইল স্পিড বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সামান্য হেরফের ঘটানো যায়, কিন্তু বেশি স্পিড দিলে পুলিশ ধরবেই। প্রকাশ্যে পুলিশ দেখা না গেলেও তারা আড়ালে আবডালে রাডার নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। নিয়ম ভাঙলেই ঝাঁপিয়ে এসে ধরে। 'টিকিট দেওয়া' ব্যাপারটাকে মোটরবাজরা যমের মতো ভয় পায়। একটু এদিক ওদিক হলেই পুলিশ 'টিকিট দেয়।'

আমেরিকায় গাড়ির সংখ্যা যা এবং যে গতিতে গাড়ি চলে তাতে দুর্ঘটনা ঘটবার আশঙ্কা খুবই বেশি। এবং ওই তীব্র গতির ওপর দুর্ঘটনা ঘটলে মৃত্যু প্রায় অবধারিত। সেইজন্য ট্র্যাফিক আইন নিয়ে এত কড়াকড়ি। ফলে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকটাই কম।

একটু দূর থেকে যখন নিউইয়র্কের আকাশরেখা দেখা গেল তখন নড়েচড়ে বসলুম। ঝলমলে রোদে অনেকটা দেখা যাচ্ছে। যেরকম ছবিতে দেখেছি অবিকল সেই রকম। তবে বিস্তার অনেক অনেক বেশি।

টেমস নদীর তলা দিয়ে ট্রেন চলে—এটা শৈশবে আমাদের বিস্ময় ছিল। কি করে চলে ? জল ঢুকে পড়ে না তো সুড়ঙ্গে ? তা সেই টেমস নদীর সুড়ঙ্গপথ এখন পুরনো কাসুন্দি। আমেরিকার প্রযুক্তিবিদরা কত কাণ্ডই না ঘটিয়েছেন ইতিমধ্যে। তা তাঁদের কাছে হাডসন নদীর তলা দিয়ে প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ তৈরি নিতান্তই ছেলেখেলা।

কিন্তু সুড়ঙ্গটা আমার কাছে তো ছেলেখেলা নয়। হাওড়ার পোল পেরিয়ে যেতে-আসতে ট্র্যাফিক জ্যামে নাভিশ্বাস ওঠে আমাদের। দ্বিতীয় হুগলি সেতু সেই কবে থেকে হচ্ছে তো হচ্ছেই। কবে যে হয়ে উঠবে তা কে বলতে পারে ? গঙ্গার তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ তৈরির কথা আমরা তো ভাবতেও পারি না আজ অবধি।

প্রশস্ত, ঝকঝকে, হলঘরের মতো একটি আবহ রচনা করে সুড়ঙ্গটি বয়ে গেছে। এক ডুবে হাডসন পেরিয়ে ম্যানহাটানে ঢুকবার মুখেই ট্র্যাফিকের একটু জড়ামড়ি। ধ্রুবকে গাড়ি থামাতে হল।

লম্বা চেহারার কয়েকজন নিগ্রো হাতে তরল সাবানের ক্যান আর বুরুশ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কাজই হল, বিনা জিজ্ঞাসাবাদে ঝড়াক করে গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে সাবান ছড়িয়ে বুরুশ ঘষে দেওয়া। এক ডলার বা দু ডলার দক্ষিণা। একবার সাবানটি মেরে দিলে আর পয়সা না দিয়ে উপায় নেই। হুজ্জত করবে।

ধ্রুব এরকম একজন ল্যাংকি নিগ্রোকে তার গাড়ির কাছে এগোতে দেখেই আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে বলল, আই ডোন্ট নিড ইট....ডোন্ট....ডোন্ট...

লম্বু নিগ্রোটা মস্ত দাঁত দেখিয়ে হাসল এবং দয়া করে রেহাই দিল।

আমি ধ্রুবর চিৎকার শুনে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বললুম, ব্যাপারটা কী বলো তো !

ওই একটু সাবান জল দিয়ে পয়সা আদায় করবে আর কি।

ব্যাপারটা যে জুলুম তা বুঝতে পারছিলুম। আমাদের দেশে কিছু বাচ্চা ছেলে ট্রেনের কামরায় উঠে মেঝে ঝাঁটপাট দেয় তারপর পয়সার জন্য হাত বাড়ায়। তবে জুলুম নেই। যার খুশি দেয়, কেউ বা দেয় না।

সেই সব দীনদরিদ্র ছেলেগুলোর মুখ হঠাৎ আমার মনে পড়ল। ভাবলুম, আহা রে। ওদের গা-জোয়ারি নেই, কেবল ম্লান নিবু নিবু চোখে চেয়ে থাকা আছে। দুর্দান্ত নিগ্রোদের সবাই সমঝে চলে, এ বেচারাদের দিকে ভাল করে ফিরেও দেখে না কেউ।

নিগ্রোদের বা পোয়ের্টোরিকানদের সম্পর্কে একটা সার্বজনীন ভীতি আমেরিকায়

পা দেওয়ার পর থেকেই লক্ষ করেছি। দুঁদে নিউইয়র্কাররাও এদের সম্পর্কে সন্ত্রস্ত তাতে বিশেষ দোষও দেওয়া যায় না। কারণ তাদের হাবভাব গতিবিধ বেশ বেপরোয় এবং ভীতি-উৎপাদক। দিনে-দুপুরে মাগিং বা ছিনতাই কোনও ব্যাপারই নয় এদের কাছে। পাতাল রেলে অকুতোভয়ে এরা অস্ত্র দেখিয়ে লুঠপাট করে। অস্ত্র দেখানোর ওপর দিয়ে যদি ফাঁড়া কাটে তো ভালই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্ত্র প্রয়োগই করা হয়। চোরাগোপ্তা খুন জখম নিউইয়র্কে হামেশাই ঘটে থাকে।

আমেরিকায় বহিরাগতের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে আধুনিব অপরাধপ্রবণতা। নিউইয়র্ক শহর হচ্ছে অপরাধপ্রবণদের অতি প্রিয় চারণভূমি আমাদের কলকাতাতেও এত বেপরোয়া অকুতোভয় ডাকাবুকো ছিনতাইবাজ ব গুন্ডা নেই। ফোরটিনথ স্ট্রিট বা হারলেম অঞ্চলকে দিনের বেলাতেও লোকে এড়িয়ে চলে। যেতে হলে নিতান্তই উলোঝুলো পোশাক পরে যায়, যাতে মালদার লোব বলে নজরে না পড়তে হয়।

নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র হল ম্যানহাটান। ম্যানহাটান ঘুরে দেখলে নিউইয়র্কের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেখা হয়ে গেল। হাডসন পেরিয়ে ম্যানহাটানে ঢুবে নিউইয়র্কের একেবারে হৃৎপিণ্ডে চলে এলুম আমরা। লোকজনে গমগম করছে রাস্তাঘাট। পথচলতি মানুষের ভিড়। এমনটি নিউ জার্সি বা অন্যত্র চোখেই পড়ে না। আর মানুষজনও ভারি বিচিত্র। পাগড়ি মাথায় শিখ, চীনে, কাফ্রি, জাপানি, গুজরাতি, বাঙালি, নিগ্রো সাহেব সব মিলিয়ে এক বিশাল জগাখিচুড়ি। প্রত্যেকই প্রবল ব্যস্তসমস্ত পায়ে বিষয়কর্মে চলেছে।

কলকাতার মানুষদের বদ অভ্যাস হল অন্য শহরে গেলেই কলকাতার সঙ্গে তার তুলনা করে দেখা। আমিও এই দোষ থেকে মুক্ত নই। নিউইয়র্কে ঢোকার পর থেকেই কলকাতার সঙ্গে মনে মনে দ্রুত তুলনা করে দেখছি। কিন্তু মুশকিল হল তুলনা করতে হলে কিছু সাদৃশ্যও থাকা দরকার। কিন্তু নিউইয়র্কের বহিরঙ্গের সঙ্গে কলকাতার বহিরঙ্গের এতটাই গরমিল যে তুলনাটা কিছুতেই গড়ে তুলতে পারছি না। আমাদের কলকাতা তৈরি হয়েছে এলোপাতাড়ি পদ্ধতিতে। যেমন-তেমনভাবে গাছ মুড়িয়ে, ফাঁকা জায়গা হাসিল করে, যত্র তত্র বাড়ি তোলাই হচ্ছে আমাদের শহর রচনার শেষ কথা। তারপর শহরের মানুষগুলো হাঁসফাঁস করল না হাবুডুবু খেল না নিয়ে ভাববার মতো দূরদর্শিতা আমাদের নেই। এ শহরে একজন মানুষের ছোটো-বাইরে বা বড়-বাইরে পেলে সে যে কী বিপন্ন হয়ে পড়ে তা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কল্পনাও করা যায় না। জলতেষ্টা পেলে আপনাকে এধার-ওধার অনেক খুঁজে দেখতে হবে কোথাও পানীয় জলের কলটল আছে কি না। না থাকারই সম্ভাবনা পনেরো আনা। কলকাতাবাসীর নাগরিক দুঃখ ঝুড়িভরা।

নিউইয়র্কের সঙ্গে অতএব তুলনা করাটা উচিত হবে না। তবে এটুকু বলা যায়, মানুষের যাবতীয় সুখ-সুবিধে, ছোটো-বাইরে, বড়-বাইরে সমেত যাবতীয় প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মাদি এবং তার চলাফেরা, গন্তব্যে পৌঁছোনো ইত্যাকার নাগরিক প্রয়োজনগুলির প্রতি নিবিষ্ট লক্ষ রেখে নিউইয়র্ক শহরটি রচিত হয়েছে। শহরের মধ্যে যে অতিকায়, সুবিশাল পার্কসমূহ রয়েছে সেগুলোই আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এ শহরের বড় বড় বাড়ি দেখতে হলে ঘাড়ে যাদের স্পন্ডেলাইটিস আছে তাদের বিশেষ সুবিধে হবে না। কিন্তু ঘাড় না তুলেও যা দেখা যায় তা দু চোখ ভরে দেখার মতোই। শহর কাকে বলে তা নিউইয়র্কে না এলে অজানা থেকে যেত।

হাইরাইজ বা স্কাইস্ক্র্যাপারের সঙ্গে একটি করে প্লাজা রাখতেই হবে। কঠোর নিয়ম। কারণ স্কাইস্ক্র্যাপারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে রাখলে এবং জনগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে সেটা জনগণের অপমান বলেই ধরা হয়। সুতরাং যে কোনও স্কাইস্ক্র্যাপারের তলায় সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য ওই প্লাজা। দোকানপাট, বিশ্রামাগার, অবসর বিনোদনের নানা উপকরণসমেত এইসব প্লাজা ভারি চমকপ্রদ।

ধ্রুবর গাড়ি এসে থামল রাষ্ট্রপুঞ্জের সামনে। পার্কিং-এর জায়গা নেই বলে ধ্রুবকে বসে থাকতে হল গাড়িতে। আমি আর আলোলিকা নামলুম। সামনে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশাল সদর দফতর।

ছবিতে যেমন দেখেছি ইউ এন ও সদর দফতর অবিকল তাই। শুধু ছবির সঙ্গে বাস্তবের যে মাত্রাগত তফাত থাকে তা ছাড়া। ইস্ট নদীর জলে নিজের অতিকায় প্রতবিম্ব ফেলে রোদে হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক স্থাপত্যের চমৎকার নির্মাণটি। সামনে রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান। বিশাল চত্বর, লন, বাগান টাগান তো আছেই। বিশ্বশান্তির ক্ষীণ আশার আলোটি এই দফতরেরই অলক্ষ্য অভ্যন্তরে আত্মার মতো বিরাজমান। দুর্বলতর দেশগুলোর অন্তিম ভরসার স্থল ও বিবদমান বিশ্বের স্বীকৃত মধ্যস্থ ইউ এন ও আমাকে অনেকদিন ধরেই ডাকছে।

ভুল করে সদর ফটক দিয়ে ঢুকতে যেতেই শ্বেতাঙ্গ সিকিউরিটি বাধা দিয়ে ভারি বিনীতভাবে বলল, ভিজিটরস দ্যাট ওয়ে স্যার।

একটু উড়িয়ে আর একটি ফটক। সেটি অবাধ। যেতে যেতেও ফিরে চাইলুম। আমাদের দেশের সিকিউরিটির লোকেরা আগন্তুকদের সঙ্গে এত ভদ্রভাবে কথা বলে কি ? এই সাহেবটির কণ্ঠস্বর, ভঙ্গি সব কিছুর মধ্যেই একটি সৌজন্য যে ফুটে উঠছে তা কি এ প্রশিক্ষণ পেয়ে শিখেছে, না কি সহজাত ? কে জানে !

দ্বিতীয় ফটকটিতেও পাহারা আছে। তবে প্রবেশ অবারিত। ভিতরে ঢুকে ইতস্তত একটু ঘুরে বেড়ালুম। লোক আছে, কিন্তু ভিড় নেই। আর নেই কোনও হইহট্টগোল। হাডসনের ধারে চমৎকার লন রয়েছে, আছে বসবার জায়গা। নদীটি মন দিয়ে দেখছিলুম। বেশ চওড়া নদী। আর তাতে কত রকমের লঞ্চ স্টিমার পাওয়ার বোট চলছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। একটা সী-প্লেন চোখের সামনে গোঁ গোঁ করতে করতে জলে নেমে পড়ল। নদীর ধারে কিছু বাতাস আছে। কিন্তু চড়া রোদে আর উষ্ণ আবহে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি।

ইউ এন এ-তেও মস্ত প্লাজা রয়েছে। আছে গাইডেড ট্যুরের সুচারু ব্যবস্থা। প্লাজায় ঢুকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা আগন্তুকের।

প্রচণ্ড তেষ্টা পেয়েছিল বলে ফোয়ারায় জল খেয়ে নেওয়া গেল। এই পানীয় জলের ফাউন্টেন আমেরিকার সর্বত্র রয়েছে। বোতাম টিপলেই উর্ধ্বমুখী কলের মুখ থেকে জল ওপর দিকে উৎসারিত হয়। তবে জামা কাপড় বা মুখমণ্ডলে ছিটকে এসে লাগবার ভয় নেই। যন্ত্রের দেশ তো, এসব ব্যাপারে খুব সাবধান। কিন্তু জল এত ঠাণ্ডা যে দাঁত ঝন ঝন করে, গলায় ধার বসে যায়। ফাউন্টেন থেকে তাই আমি কখনোই আকণ্ঠ জল পান করতে পারিনি। কয়েক ঢোঁক খাওয়ার পরই হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে।

ইউ এন ও থেকে একটা কোনও স্মারক নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার অভ্যন্তরে যে কৃপণটির আবির্ভাব ঘটেছে তার হাত দিয়ে জল গলে না। যে স্যুভেনিরেই হাত দিই না কেন আগে চোখ গিয়ে পড়ে প্রাইস ট্যাগটার ওপর। দশ ডলার বিশ ডলার দেখে চোখ তাড়াং তাড়াং হয়ে ওঠে। সামান্য একখানা টি শার্ট বা একখানা প্লাস্টিকে মোড়া ম্যাপের দামও আশ্চর্যজনকভাবে বেশি। কিন্তু লোকে কিনছেও। ইউ এন ও থেকে স্মারক নিয়ে যাওয়ার একটা হুগুজও তো আছে।

আমি শেষ অবধি ভেবে চিন্তে কুল্লে দুখানা পিকচার পোস্টকার্ড কিনে উঠতে পারলুম। শিলিগুড়িতে উদ্বিগ্ন বাবা আর কলকাতায় উদ্বিগ্ন পরিবার দুপক্ষকেই পৌঁছ-সংবাদটা অন্তত না দিলেই নয়। ইউ এন ও থেকে চিঠি ডাকে দিলে চিঠিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের মোহর পড়বে। সুতরাং মাটির তলাকার আর্কেডে ডাকঘরের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঝটপট চিঠি লিখে ফেলা গেল। আলোলিকা ডাকটিকিট কিনে আনলেন, এবং ডলার-দুর্বল বাঙালি মসীজীবীর কাছ থেকে দামটি কিছুতেই নিলেন না।

চিঠি ডাকে দিয়ে নানান দেশের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ালুম। আলোলিকা গাইডেড ট্যুর নেব কিনা জানতে চাইলে সবেগে মাথা নাড়লুম। আপত্তির কারণ দুটো। ইউ এন ও-র ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ানো অর্থহীন। দ্বিতীয়ত গাইডেড ট্যুরের দক্ষিণাও বেশ মোটা।

ডাকটিকিটের পয়সাটা যে উনি নিলেন না এতে মনটা খচ-খচ করছিল। ছোট্ট একটা ঋণ থেকে যাচ্ছে কাজটা ভাল হচ্ছে না। কিন্তু সামান্য কয়েকটা সেন্ট আলোলিকাই বা হাত পেতে নেন কি করে ? আর আমিই বা অসামান্য সেন্ট কটি না দিয়ে পারি কি করে ?

এই ঋণটা আজ অবধি রয়ে গেছে। আর এইখানেই বলে রাখি ইউ এন ও-তে পোস্ট করা আমার দুটো চিঠির একটা মাত্র পৌঁছেছিল গন্তব্যে। তবে একটাও যে পৌঁছেছে তা-ই যথেষ্ট। ফিফটি পারসেন্ট সাকসেস। ভারতীয় ডাকবিভাগ, যুগ যুগ জীও।

হাতে বিশেষ সময় ছিল না। কানাডার ভিসা অফিসে যেতে হবে, তারপর ঘোরাঘুরি আছে। ভিসা অফিস বেশিক্ষণ খোলা থাকে না। কাজেই বেরিয়ে আসতে হল।

আমেরিকার সব কিছুকেই ক্রমাগত ভাল বলতে থাকলে পাঠক-পাঠিকাদের আমার বোধ সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু ভাল না বললেও যে ভারি অন্যায় হয়ে যাবে। এখন যে জিনিসটার ভূয়সী প্রশংসা করতে যাচ্ছি সেটি রাস্তার হকারের কাছ থেকে কেনা আইসক্রিম।

কোনও জিনিসের প্রশংসা করার আগে আগেকার কবি সাহিত্যিকরা সরস্বতী গণেশ ইত্যাদিকে ডাকাডাকি করতেন কলমে ভর করার জন্য। এমন কি বঙ্কিম অবধি। পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ করুন, আমি কিন্তু ততটা বাড়াবাড়ি করছি না।

ইউ এন ও থেকে বেরিয়েই ডান ধারে একটি বেশ গাছ-গাছালিওলা চাতালমতো। সেখানে একজন হৃষ্টপুষ্ট ইতালিয়ান আমাদের দেশের আইসক্রিমওয়ালাদের মতোই গাড়ি করে আইসক্রিম বিক্রি করছে। আলোলিকা একরকম জোর করেই আইসক্রিম কিনে হাতে দিয়ে বললেন, খেয়ে দেখুন, ভাল লাগবে।

কাঠের চামচে ক্ষীরের মতো জিনিসটা তুলে পটাং করে ওয়েফার বিস্কুটের তৈরি চোঙায় ভরে দিল। পরিমাণটাও দেখবার মতোই। এতটা আইসক্রিম একসঙ্গে কেউ খেতে পারে বলেও জানা ছিল না। তবে নিউইয়র্কের দুর্দান্ত গরমে আমি আর আপত্তি তুললাম না।

কোনও খাবার খেয়েই স্মরণকালের মধ্যে আমার সমগ্র রসনা এরকম সহর্ষে নেচে ওঠেনি। আদিকবির মতো আমারও বলে উঠতে ইচ্ছে হল, কিমিদং ? এ কী আশ্চর্য বস্তু, ঠেসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি, সুতরাং কণামাত্র খিদে নেই। খিদে না থাকলে খাদ্যবস্তু বিস্বাদ লাগবার কথা। কিন্তু এ জিনিসটি যে শুধু খাদ্যই নয় শিল্পবস্তু।

পরে যেটা জেনেছি সেটা হল, খাদ্যের স্বাদ নিয়ে অবিরল গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এরা মানুষের রসনায় স্থিত টেস্ট বাড বা স্বাদ-তন্ত্রীতে

তরঙ্গ তোলার ব্যাপারে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছে। মানুষের ভোগস্পৃহা ও ভোগ্যবস্তুর মধ্যে একটি সাগ্রহ মেলবন্ধন রচনার পিছনেও এরা বিস্তর মাথা খাটায়। এই রাস্তার হকারের কাছে কেনা ঈষৎ টক-মিষ্টি ও মিশ্র গন্ধবিশিষ্ট আইসক্রিমটি কলেরা বা অন্যান্য রোগজীবাণুর সংক্রমণভীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাছাড়া এর পিছনে রয়েছে বিজ্ঞান, শিল্প, গবেষণা এবং খানিকটা কল্পনাও। দিল্লি বা কলকাতার নামী কোম্পানির আইসক্রিমও যথেষ্ট সুস্বাদু। কিন্তু এটার সঙ্গে তাদের তুলনাই চলে না।

তিনজনে তিনটি বিপুল আইসক্রিম নিয়ে গাড়িতে বসলাম। ধ্রুব এয়ার কন্ডিশনার চালিয়ে দিল। ঠাণ্ডায় বসে ঠাণ্ডা আইসক্রিম খেতে খেতে বললুম, এরকম কখনও খাইনি তো ধ্রুব!

হবেই তো শীর্ষেন্দুদা, এরা আইসক্রিমটাও কত যত্নে তৈরি করে। আর কলেরারও ভয় নেই। এখানকার সব খাবারই পিওর। যেখানে খুশি নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

কিছুক্ষণ পার্ক করা গাড়িতে বসে থেকে ইউ এন ও সদর দফতরটির পটভূমি ইস্ট নদী এবং মার্কিন আকাশের শোভা দেখলুম। শয়ে শয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে সামনে দিয়ে। হর্ন-টর্ন দেওয়ার নিয়ম নেই।

আইসক্রিম শেষ করতে অনেকটা সময় লাগল। সুস্বাদে ভরে রইল রসনা। আলোলিকা পিছন থেকে জর্দাসহ পানমশলা সরবরাহ করতে লাগলেন।

অ্যাভেনিউ অফ আমেরিকাজ ম্যানহাটানের শিরদাঁড়া বললেই হয়। বিশাল চওড়া রাস্তা। কূটনীতিক ভবন-টবন তো আছেই। আর রাস্তার চেহারার মধ্যেই একটা প্রবল আভিজাত্য ও গুরুগাম্ভীর্য রয়েছে।

কানাডীয় ভিসা অফিসটি যে বাড়িতে সেটি গগনচুম্বী। ধ্রুব সেখানে আমাকে আর আলোলিকাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। ঘণ্টা তিনেক লাগবে ভিসা করতে। সুতরাং সে ততক্ষণে নিজের ব্যবসার কাজকর্ম সেরে আবার সেখান থেকেই আমাদের তুলে নেবে সময়মতো।

এসব বাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকলেই একটু গা ছমছম করে। বিশাল হলঘর। মহার্ঘ টালি বা পাথর এবং কাচ দিয়ে এমনভাবে সাজানো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ঐশ্বর্যের এত বাহুল্য দেখে অভ্যেস নেই। তাই যা দেখি একটু হাঁ হয়ে যেতে হয়।

লিফট ধাঁ করে ওপরে নিয়ে গেল। কানাডীয় ভিসা অফিস নিতান্তই একটা মাঝারি হলঘর। সেখানে ঢুকে দেখি মেছোবাজারের ভিড়। থিকথিক করছে লোক। এবং সেই সব লোকের মধ্যে মেলা বাঙালি, গুজরাতি, পাঞ্জাবি, দক্ষিণ ভারতীয়, চীনে, জাপানি।

বলাই বাহুল্য এই ভিড়ের কারণ হল নায়াগ্রা। এই বিশ্রুত জলপ্রপাতটি রোজ

দুনিয়ার কত দেশের কত লোককে যে টেনে আসছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই ভিড়ের মধ্যে দুটি চেনা মুখ নজরে পড়ল। সেই রোগা মেয়েটি যাকে দমদমে দেখেছি। আর একজন প্লেনে দেখা বাঙালি ভদ্রলোকটি। কেউই অবশ্য কথা বলার আগ্রহ দেখায়নি। আমিও না।

বিশাল লাইন পড়েছে ভিসার জন্য। ঘরের মধ্যেই লাইনটি সাপের শরীরের মতো পাক খেয়ে আছে। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লুম, আলোলিকা ফর্ম নিয়ে পূরণ করতে বসে গেলেন। ফর্মটি বেশ বড় এবং তার অনেক ফ্যাকড়া। ঘণ্টা খানেক লাগল ফর্মটি পূরণ হতে এবং ততক্ষণে আমি কাউন্টারে পৌঁছে গেছি। চমৎকার দ্রুতবেগে কাজ হয় বলে আমেরিকার কোনও অফিসেই অপেক্ষা করতে বা লাইন দিতে গিয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। আর লাইনে দাঁড়িয়েও ব্যাপারটা আমি উপভোগই করছিলুম। আমার সামনে গুটি তিনেক চীনে মেয়ে নিজেদের ভাষায় সোৎসাহে কথা বলছিল। পিছনে কয়েকজন যুবক, অমার্কিন ইংরিজিভাষী। এবং গা-ঘেঁসে আরও বহু মানুষ। এই বিচিত্র সমাবেশটি আমার দিব্যি লাগছিল।

পাসপোর্ট ও ফর্ম জমা দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। আলোলিকা জনা দুই পাঞ্জাবি মহিলার সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছেন। আমি দেয়াল ঘেঁষে কাচের শার্সি দিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করতে গিয়েই আঁতকে উঠলুম। আমি উচ্চতা-ভীত লোক। পাহাড়-টাহাড়ে গেলে নিচের দিকে তাকাতে পারি না, হাত পা শিরশির করে। এমন কি চার-পাঁচতলা বাড়ির ছাদ থেকে নিচে তাকানোটাও আমি এড়িয়ে চলি। কানাডীয় ভিসা অফিস কম করেও ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তলা হবে। নিচে এক অগাধ অতল। কাচের প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও একটু অস্বস্তি হতে লাগল।

কিন্তু এত ওপর থেকেও দৃষ্টি প্রসারিত করা শক্ত। কারণ রাস্তার ওপাশের বাড়িটিরও সমান বা ততোধিক স্পর্ধিত উচ্চতা। আশপাশের বেশির ভাগ বাড়িই তাই। তবে নিউইয়র্ক তো উঁচু বাড়ির জন্যও বিখ্যাত। বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আমার দু পাশে একটি গুজরাতি পরিবার দু ভাগ হয়ে বসে আছে। আমার পাশে এক বৃদ্ধ মানুষ। ভারি বিনয়ী লোক। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমেরিকায় খুব ঘুরলেন বুঝি?

না, আজ আমার আমেরিকায় মাত্র দ্বিতীয় দিন। আপনি?

আমি এসেছি দিন দশ-বারো হল। ছেলে থাকে নিউইয়র্কে। এই প্রথম আসা।

কেমন লাগছে?

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, সবই ভাল। কিন্তু কি জানেন, কী যেন নেই। কিসের যেন অভাব।

সেটা কী ?

ভাল বুঝতে পারি না। আমার ছেলে আর বউমা দুজনেই চাকরি করে, আমি এসে অবধি ওদের সঙ্গে ভাল করে কথাটা বলার সুযোগই পাইনি। তবে একটু-আধটু বেড়িয়েছি। খুব বেশি নয়। আমেরিকায় তো একা বেড়ানোর উপায় নেই, তার ওপর আমারও বয়স হয়েছে।

সে তো ঠিকই। আমেরিকা তাহলে আপনার তেমন ভাল লাগছে না ?

না না, তা নয়। সবই ভাল। কিন্তু কেমন যেন সচ্ছন্দ বোধ করি না। আমার মেয়ে আছে কলকাতায়, তার কাছে যাবো এবার।

ক'দিনের বেড়াতে আসা আপনার ?

ছেলেমেয়েরা যতদিন ধরে রাখে। তবে খুব বেশিদিন থাকতে ভাল লাগবে না।

এক কথায় দু কথায় অনেক কথা হল। বুঝতে পারলুম ভদ্রলোক এখানে স্বস্তি বোধ করছেন না। বললেন, আসবার সময়ে লন্ডনে ভাইপোর কাছে ছিলুম। ভারি ভাল লেগেছিল।

লন্ডনের সঙ্গে নিউইয়র্কের তফাতটা কী ?

আকাশ পাতাল তফাত।

আমার নম্বর ধরে ডাকা হতেই উঠে পড়লুম। নির্দিষ্ট কাউন্টারে হাস্যমুখী এক মহিলা, হাসিটি ভারি অকৃত্রিম। ভিসার ছাপ দেওয়া পাসপোর্টটি হাতে দিয়ে বললেন, ওয়েলকাম টু কানাডা। হ্যাভ এ নাইস স্টে।

পাসপোর্ট নিয়ে আমি আর আলোলিকা নিচে নেমে এলুম। হাতে দেখলুম বেশ সময় আছে। ধ্রুব আরও ঘণ্টাখানেক বাদে আসবে।

আলো বললেন, দোকান-টোকান ঘুরে দেখবেন নাকি একটু ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। দেখতেই তো আসা।

বিশাল বিশাল বাড়ির ছায়ায় প্রশস্ত ফুটপাত ধরে নিউইয়র্কের এই অভিজাত পাড়ায় ঘুরে বেড়ানোর আনন্দই আলাদা।

আলো রাস্তাঘাট ভালই চেনেন। সুতরাং হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু গাইড ভাল না হলে নিউইয়র্কে পথ হারানো আশঙ্কা বেশ সবল।

কৌতূহলবশে একটা খাওয়ার দোকানে ঢোকা গেল। এমন সুচারু এবং সমৃদ্ধ ব্যবস্থা আমাদের ধারণাতেই আসে না। আমিষ নিরামিষ দু-রকমেরই এত ব্যবস্থা এবং সুপ্রচুর এবং এত রকমফের যে ভারি তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। পরিচ্ছন্নতা প্রায় অকল্পনীয়। লানচ টাইম নয় বলে ভিড় বিশেষ নেই। ছোট্টো রেস্তরাঁটিতে তাই একটু ঘুরে দেখলুম। এতে কেউ আপত্তি তুলল না।

নানা বিষয়ে প্রশ্নে প্রশ্নে আলোকে একটু ব্যতিবাস্ত করছি বটে কিন্তু উনি

এ আনাড়িকে মার্কিন হাল হকিকৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে মোটেই নিরুৎসাহ করছেন না।

বেশ কয়েকটি দোকানে ঢুকে নানা জিনিস দেখছি। ক্যামেরা দেখলুম, বেজায় সস্তা। এক একটা শো-কেসে নানা ধরনের এক-দেড়শা ক্যামেরা সাজানো। নানা ধরনের, নানা দামের। আর বেশির ভাগ দোকানেই 'সেল' বা সস্তার আমন্ত্রণ। খদ্দের আকর্ষণ করার আরেক উপায় হল 'গোয়িং আউট অফ বিজনেস' বিজ্ঞাপন লটকানো। মোদ্দা কথা হল, ব্যবসা তুলে দিচ্ছি, জলের দরে মাল তুলে নিয়ে যাও হে খদ্দের লক্ষ্মী। আর এক কৌশল হল 'বাই ওয়ান টেক ওয়ান ফ্রি।' অর্থাৎ একটা যদি কেনো তো আর একটা ফাউ পাবে। একখানা শার্ট কিনলে আর একখানা মাগনা দিচ্ছি।

ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানে ঢুকে দেখি স্যামসোনাইট স্যুটকেস বেশ সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। স্যুটকেস একটা কেনা দরকার। আমেরিকায় অবশ্যই আমাকে কিছু কেনাকাটা করতে হবে।

স্যুটকেস পছন্দ হল। দাম পঁয়তাল্লিশ ডলার। কিন্তু এখনই কেনা ঠিক হবে না, আলো পরামর্শ দিলেন, দামটা সস্তা মনে হলেও ধ্রুব আসুক, তারপর কিনবেন। নিউইয়র্কে আমার কেনাকাটার অভ্যাস নেই। এখানে বড্ড ঠকায় শুনেছি।

আমারও কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল। দোকানটা চিনে রেখে আবার পায়ে পায়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

এই ঘুরে বেড়ানোটা যে কী মনোরম, তা আমিই জানি। ওই চড়চড়ে রোদ এবং ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও শারীরিক কষ্টটা যেন টেরই পাচ্ছি না। পায়ে পায়ে আমেরিকার অভ্যন্তরে ঢুকছি। একটু একটু করে।

নিউইয়র্কের রাস্তায় বেশ ভিড়। নিউ জার্সির মতো জনশূন্যতা নেই। তবে কলকাতার মতো গায়ে গায়ে লোকও নেই। ফুটপাত এত মসৃণ ও বাধাহীন যে অন্য দিকে চেয়ে হাঁটলেও আধলা ইটে বা গর্তে হোঁচট খেতে হবে না।

ভিড়ের একটা বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সব দেশেই লোক রয়েছে। দেশটার উত্তরাধিকার সাদা চামড়ার লোকদেরই বটে, কিন্তু কালো বাদামী পীত মানুষেরও কমতি নেই। আমাদের দেশে যখন আমরা সাহেব দেখি তখন তাদের প্রতি নিজের অজান্তেই একটা সমীহের ভাব এসে যেতে চায়। কিন্তু স্বক্ষেত্রে মার্কিনদের দেখতে এতই স্বাভাবিক এ সাধারণ মনে হয় যে, ফিরেও দেখি না। তবে হ্যাঁ, সুন্দরী মেয়েদের ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম নেই। তাদের দিকে ফিরে তাকানোটাই নিয়ম।

মার্কিন মেয়েদের রূপের খ্যাতি শুনিনি তেমন। তবে এত বড় দেশে নিশ্চয়ই সুন্দরীর অভাব নেই। ক্ষণকটি পীন বক্ষ মার্কিন মেয়েদের ছবি-ছবি তো কিছু কম চাক্ষুষ করিনি।

কিন্তু আমেরিকাবাসের দ্বিতীয় দিনে নিউইয়র্কের রাস্তায় কয়েক হাজার মেয়েকে চোখে পড়ল বটে, কিন্তু কারও দিকেই দ্বিতীয়বার নেত্রপাত করার দরকারই হল না।

দুদিকে দুটি উঁচু পাহাড়ের সানুদেশে গিরিখাতে দাঁড়ালে যেমন অনুভূতি হয়, নিউইয়র্কের দুটি আকাশ-নাগাল বাড়ির মধ্যবর্তী রাস্তায় দাঁড়ালে ঠিক তেমনটিই হয়। আর কেমন যেন একটু গা-শিরশিরও করে। না, বাড়ি দুটি কোনওক্রমেই ভেঙে পড়বে না, বা আমাদের মাথায় কোনও কিছু বর্ষিতও হবে না বাড়ির কোনও তলা থেকে। ভয়টা তবে কেন হয় ? আসলে যে-কোনও বিশালত্বের কাছে গেলেই ক্ষুদ্রকায় আমাদের এরকমটা হতেই পারে। যদিও জানি এই সব বাড়ির স্থপতিরা আমাদের মাপেরই মানুষ এবং আমেরিকা জুড়ে স্থাপত্যের যে ম্যাজিক তা মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্ট, তবু বারবার ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চোখ দিয়ে বাড়ি দুটির উচ্চতা মাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। তলা গুনতে গিয়ে বারবার গুলিয়ে ফেলছি, এই অন্যমনস্কতায় কথাবার্তাতেও বাধা পড়ছে। বহুকাল আগে টারজানের একটা ছবি দেখেছিলুম, টারজানকে ধরে নিউইয়র্ক শহরে নিয়ে আসা হয়েছে। একটা খোলা গাড়িতে অর্ধনগ্ন টারজান শহর দেখতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে টলায়মান এবং পড়ো-পড়ো অবস্থা। আমার অবস্থা ততদূর খারাপ নয়। কিন্তু আচমকা ভারতবর্ষ থেকে নিউইয়র্কে হাজির হলে তফাতটা হয়ে যায় উনিশ শতকের সঙ্গে একুশ শতকের। আমার অবস্থা বাইরে টলায়মান না হলেও ভিতরে ভিতরে টলছি। অথচ প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলুম, যত বিস্ময়করই হোক না আমেরিকা, আমি কিছুতেই ঘাবড়াব, না, কিন্তু বাস্তবে একটু বিমূঢ় হয়ে পড়তেই হয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই গাড়ি এসে গেল। ফিফথ অ্যাভেনিউ ধরে গাড়ি যখন নিউইয়র্কের অমিত ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী ভেদ করে চলেছে তখন কেবলই মনে হচ্ছে আমি বড়ো গরিব এক দেশ থেকে এসেছি। আমরা বড্ডই গরিব।

খিদে পেয়েছিল। মার্কিন জলবায়ু এদিক থেকে অতি উত্তম। জলে লোহা, পোকামাকড়, সাপখোপ, ধুলোময়লা, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদির জীবাণু নেই। চুনার বা দেওঘরের জলে যেমন ক্ষুধা চাগিয়ে ওঠে, আমেরিকাতেও তাই। উপরন্তু নিরামিষাশীদের খিদে একটু তাড়াতাড়ি পায়। খিদে-তেষ্টার কথা মুখ ফুটে বলতে ভারি সংকোচ হয়। আমার যে সময়ে খিদে পেয়েছে সে সময়ে হয়তো আমার সঙ্গীদের পায়নি। অতএব চনচনে খিদে চেপে হাসিমুখে বসে রইলুম। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, মার্কিন জলবায়ু পক্ষপাতদুষ্ট নয়। আমার খিদে পাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যেই ধ্রুবরও খিদে পেল।

কে যেন বলেছিল, হায়, নিউইয়র্কে বেআইনিভাবেও যে গাড়ি পার্ক করব তারও জায়গা নেই। কথাটা যে কত বড় সত্যি তা সরেজমিনে টের পাচ্ছিলুম।

এ শহরে ব্যক্তিগত গ্যারেজ খুব কম লোকেরই আছে। বেশির ভাগ গাড়িই পড়ে থাকে রাস্তায়। তাও অধিকাংশ লোকই বাড়ির কাছাকাছি পার্ক করার মতো জায়গা জুটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে প্রায়শই গাড়ি পার্ক করতে হয় অনেক দূরে, তারপর বাস বা মেট্রো ধরে বাড়ি ফেরে। এই পার্কিং সমস্যার জন্য নিউ ইয়র্কের বহু লোক গাড়ি কিনে ঝামেলা বাড়াতে চায় না। আর নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুবিধে এত অঢেল যে গাড়ি না থাকলেও কোনও অসুবিধে নেই।

আমাদেরও গাড়ি পার্ক করা নিয়ে বেশ ঝামেলা হল। জায়গা নেই। খিদে চড়চড় করে ওপরে উঠছে, পার্ক অ্যাভেনিউ ছেড়ে আমরা নানা স্ট্রিট ধরে ঘুরছি। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় একটি জায়গায় গাড়িটি রাখা গেল। আমরা হাঁফ ছেড়ে হাঁটা ধরলুম।

নিউইয়র্কে এই হাঁটাপথের অভিজ্ঞতাই আমার কাছে মনোরম বলে মনে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা দোকান বাছছিলুম। মুশকিল আমাকে নিয়েই। নিউ ইয়র্ক শহরে তো আদর্শ বৈষ্ণো হোটেল পাওয়ার আশা নেই। ডেলি বা ছোটো রেস্তরাঁগুলোয় মাছ মাংসেরই ঢালাও ব্যবস্থা। সব্জি আছে বটে কিন্তু ব্যবস্থাটি মিশ্র। একথা ঠিক যে প্রবাসে নিয়মো নাস্তি। কিন্তু দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে আমি আজকাল আমিষ গন্ধেও খানিকটা কাহিল হয়ে পড়ি। ধ্রুব এবং আলোলিকা আমাকে নিয়ে তাই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন।

আচ্ছা, পিজা খেলে কেমন হয়? আপত্তি নেই তো?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, নিরামিষ পিজায় আপত্তি কিসের?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিরামিষ পিজা খুব ভাল করে এরা চলুন।

অনেক বেছেগুছে ছোট্ট একটা ইতালিয়ান দোকান বের করা গেল। বিশাল বড় বড় থালার মতো পিজা তৈরি হচ্ছে সামনেই। মূল জিনিসটা তন্দুরি রুটির সগোত্র। তার ওপর পুরু চীজের আস্তরণ। আর সেই চীজের মধ্যে শুয়োর গোরু ভেড়ার মাংস, মাছের টুকরো, চিংড়ি বা কাঁকড়া থাকতে পারে। আর নিরামিষ পিজায় থাকে পালং শাক বা ক্যাপসিকাম বা টমেটো বা অন্যান্য সব্জির টুকরো।

দোকানটি ছোট এবং শীততাপনিয়ন্ত্রিত নয়। ফলে বেশ গরম লাগছিল। বসবার জন্য টুল রয়েছে আর দেয়ালে ফিট করে টেবিল। আমাদের পিছনেই গ্যাস উনুনে অতিকায় পিজা সেঁকা হচ্ছে। বিশেষ ধরনের চীজ গলিয়ে ঢালা হচ্ছে পিজার ওপর। যাদের এ গন্ধটি সহ্য হয় তাদের ভালই লাগবে। কিন্তু চীজের ভক্ত যাঁরা নন তাঁদের নাকে রুমাল চাপা দিতে হবে।

খিদেটা বেশ জব্বর চাগাড় দেওয়াতেই বোধ হয় ধ্রুব দুটো করে পিজার হুকুম দিয়ে বসল। পালং শাক দেওয়া গরম পিজা এসে গেল প্লাস্টিকের থ্রো-অ্যায়ওয়ে প্লেটে। সঙ্গে প্ল্যাস্টিকের থ্রো-আওয়ে কাঁটা এবং ছুরি। টিসু কাগজের ন্যাপকিন,

সঙ্গে আবশ্যিক একটিন করে কোক বা স্প্রাইট বা সেভেন আপ—যা অতি শীতল করা। আমেরিকায় গ্রীষ্মকালে এই ঠাণ্ডা পানীয়গুলির কদর হয় দেখবার মতো। রাস্তায় রাখা গ্যারবেজ বিন উপচে পড়ছে ঠাণ্ডা পানীয়ের শূন্য কৌটোয়।

গরম পিজায় কামড় বসিয়েই বুঝলুম, ভারি জিনিস। একটা টুকরোই এত বড় যে, খুব খিদের মুখেও গোটা জিনিসটা ভিতরে চালান দেওয়া কঠিন কাজ। লঙ্কার গুঁড়ো এবং এক ধরনের সবুজ মশলা ছড়িয়ে খেতে অতি উত্তম। কিন্তু খেতে খেতে মুখ মেরে আনে। ওপরে যে পরিমাণ চীজ ছড়ানো আছে তাও পরিমাণে অনেকটা। আমেরিকায় খাওয়ার জিনিসে কোনও কার্পণ্য নেই কোথাও। হট ডগ বা হ্যামবার্গারের সাইজও দেখেছি, বিশাল।

ঠাণ্ডা পানীয় সহযোগ গরম পিজাটি অতি কষ্টে শেষ করা গেল বটে, কিন্তু ততক্ষণে গলা অবধি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পিজাটি আর কোনওক্রমেই গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয়।

কাঁচুমাচু মুখে আলোলিকার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তিনি একটিই শেষ করে উঠতে পারেননি। আধাআধি খেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন।

ধ্রুব অবশ্য বলবান পুরুষ। দুঃসাহসীও। সে দুখানা পিজাই উড়িয়ে দিল।

আমাদের দুটি উদ্বৃত্ত পিজা নিয়ে আমরা একটি মুশকিল পড়লুম। কী করা যায় ?

ধ্রুব অবশ্য আমাকে দ্বিতীয়টাও খেয়ে নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগল। কিন্তু অতি ততটা প্রতিভাবান নই বলে পেরে উঠলুম না।

ঠিক হল, পিজা দুটো প্যাক করে নেওয়া হবে। ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেলে খাওয়া যাবে।

চড়চড়ে রোদে নিউইয়র্ক শহরটাও পিজার মতো তেতে উঠছে। ফুটপাতে হরেক পশরা। গানবাজনা, মাদারির খেলও দুর্লক্ষ্য নয়। নিউইয়র্কের এক প্রমোদমত্ত রূপ আছে। ফূর্তিবাজ আমেরিকানরা কাজের সঙ্গে এসব জিনিস চমৎকার ব্লেন্ড করতে পারে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা হুল্লোড়বাজ আমোদপ্রিয় কিন্তু রুচিশীল জাতির উপচানো প্রাণশক্তির স্পর্শ পাওয়া যায়। আর রঙ। এত বর্ণাঢ্যতা আর কোন শহরে দেখা যাবে জানি না।

আজ নিউইয়র্কে আমার প্রথম দিন। প্রথম দিনটিতেই আমি আকণ্ঠ শহরটিকে পান করে নিচ্ছি। অবশ্য পকেট সম্পর্কে একটু সাবধান হয়ে।

কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে যাবো শুনে হোটেলের বেয়ারা সাবধান করে দিয়েছিল, সাব, জেব সামহালকে—এক হি গলিমে বিশ্বনাথজী ভি হ্যায় অউর জেব হাসিল করনেওয়ালা ভি।

নিউইয়র্কের শোভা ও স্থাপত্য দেখতে দেখতে বেশিমাত্রায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলে

কুশলী গ্রন্থিচ্ছেদকরা আপনার ভার লহমায় লাঘব করে দেবে। অবশ্য তারা আমাদের দেশের পকেটমারদের মতে শুধু হাতের কৌশলের ওপরেই নির্ভর করে না। পেশিশক্তির ওপরেও করে এবং দৌড়-ক্ষমতার ওপরেও। অনেক সময়ে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার লোকের চোখের সামনেই হস্তধৃত ব্যাগ বা অ্যাটাচি হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে হাওয়া হয়ে যায়।

গাড়ি বহু দূরে পার্ক করা আছে। সুতরাং হাঁটার পাল্লাটা বেশ দীর্ঘ।

একটু ঘুরেফিরে সেই স্যুটকেসের দোকানটিতে ফের হানা দিলুম। কিন্তু আমাদের আগ্রহ দেখে দোকানদার অম্লান বদনে দাম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, না, না, পঁয়তাল্লিশ ডলার আমি ভুল করে বলেছি। ওটার দাম আসলে পঁচাত্তর ডলার।

দাম নিয়ে বিস্তর ঝোলাঝুলি হতে লাগল ধ্রুবর সঙ্গে দোকানদারের। আমি দর্শকমাত্র। তবে বুঝতে পারছি, দোকানদার অতিশয় ঘোড়েল এবং লোক সুবিধের নয়।

তবে দোকানটি অতিশয় সমৃদ্ধ। শোকেসে যে পরিমাণ জিনিস সাজানো তাতে রীতিমতো অবাক হতে হয়। বেশির ভাগই দামী জিনিস। ক্যামেরা, কলম, ইলেকট্রনিকস। দোকানদাররা ইওরোপীয়। অতিশয় সুদর্শন। ব্যবসাটা সম্ভবত পারিবারিক, কারণ একই ধাঁচের চেহারার বেশ কয়েকজন দোকান সামলাচ্ছে।

বাক-যুদ্ধ দেখতে দেখতে ক্লান্ত আমি পিছন দিকে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ কানের কাছে কে যেন ফিস ফিস করে বাঙাল ভাষায় জিজ্ঞেস করল, দাদা কি বাংলাদেশ থিক্যা আইতে আছেন!

একটু চমকে গিয়ে পিছনে চেয়ে দেখি বিশ-বাইশ বছরের এক তরুণ। দোকানেরই কর্মচারী।

বললুম, দেশ ঢাকা। তবে কলকাতা থেকে আসছি। আপনি?

বাংলাদেশী।

এখানে কী করছেন?

কাম করি।

মুখখানা মলিন এবং চোখ দুখানা ক্রুদ্ধ। বুঝলুম এই দোকানে এই বাঙালি ছেলে সুখে কাজ করছে না।

জিজ্ঞেস করলুম, এরা লোক কেমন বলুন তো! একটু আগে এক দাম বলছিল, এখন দাম বাড়িয়ে বলছে।

এরা এক নম্বরের হারামি। সাবধান না হইলে ঠইক্যা যাইবেন।

স্যুটকেসের দাম কত?

যা আগে কইছিল তাই।

ঠিক এই সময়ে দোকানদার লক্ষ করল যে তার দোকানের কর্মচারী খদ্দেরের সঙ্গে বিজাতীয় ভাষায় কিছু বলছে। সুতরাং ঘোড়েল লোকটি ছেলেটিকে বিশাল এক ধমক দিয়ে বেসমেন্টে পাঠিয়ে দিল। খদ্দের-কর্মচারী আঁতাত কোনও দোকানদারই ভাল চোখে দেখে না।

এই ছেলেটির মলিন মুখখানা আমি আজও ভুলতে পারিনি। বাংলাদেশ থেকে কোনওভাবে এই দূরদেশে চলে এসে সে যে আতান্তরে পড়েছে তা তার চাউনিতে, মুখের রেখায় স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল।

দোকানদারকে স্যুটকেসের ব্যাপারে আর নরম করা গেল না। পঁচাত্তর ডলার থেকে সত্তর ডলারে থামল "হায় হায়" করতে করতে। তার নিচে আর কিছুতেই নয়। ভারি আফসোস হতে লাগল, প্রথমেই কিনে নিইনি বলে।

আমার কলম কেনার সাঙ্ঘাতিক এক নেশা আছে। যেটুকু লেখালেখি করি তাতে দুটো চারটে কলমেই যথেষ্ট। কিন্তু আমার নেশাটা সংগ্রহের। ফলে বেশি কিছু কলম জমে গেছে। তবু নেশাটা যায়নি। এখনও ভাল কলম দেখলে চোখ কান বন্ধ করে কিনে ফেলি।

এই দোকানের শো-কেসে সাজানো ম ব্লাঁ শেফার্স এবং অন্যান্য মহার্ঘ কলমের চমৎকার সমাবেশটি দেখে লোভাতুর হয়ে উঠেছিলুম বটে, কিন্তু প্রাইস ট্যাগে চোখ পড়তেই আর এগোতে পারলুম না। বেশির ভাগ কলমেরই দাম একশ ডলারের ওপরে।

স্যুটকেস-হতাশ আমরা অগত্যা দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। নিউ ইয়র্কে স্যুটকেসের কিছু অভাব নেই। অজস্র দোকান, অঢেল সওদা। কিন্তু কোথাও স্যামসোনাইট স্যুটকেস অত কম দামে পাওয়া গেল না। ধ্রুবরও ব্যবসার কাজে দুটো স্যুটকেস কেনা দরকার। কাজেই আমরা হন্যে হয়ে অনেক খুঁজে বেড়ালুম।

একটা সময়ে হাল ছেড়ে দিয়ে আমরা এমনিই ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলুম।

নগর-পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন তাঁদের দূরদৃষ্টির তারিফ নানা কারণেই করতে হয়। নিউইয়র্কে পঙ্গু এবং হুইল চেয়ারবাহন লোকের সংখ্যা প্রচুর। পঙ্গুর সংখ্যা যে আমাদের দেশে কম তা নয়। কিন্তু তাদের ভাগ্যে হুইল চেয়ার জোটে না, এই যা। এদের জোটে। এই সব পঙ্গুরা যাতে সহজেই ফুটপাত থেকে নেমে রাস্তা পেরোতে পাবে তার জন্য প্রতিটি চৌমাথার কাছে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামবার অংশটি ঢালু করে দেওয়া রয়েছে। হুইল-চেয়ারে করেই অনায়াসে বাসেও উঠে যাওয়া যায়। তার জন্যও সচারু ব্যবস্থা রয়েছে। দেশটা বাইরে থেকে যতটা ঝাঁ-চকচকে দেখায়, তা মুগ্ধ করে বটে, কিন্তু এই যে প্রতিটি মানুষের জন্যই মানবিক চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ দেখছি সেটা আরও মুগ্ধকর।

রাস্তায় হঠাৎ লাঞ্চের ভিড় নেমে এল। খাবারের দোকানগুলো গিসগিস

করতে লাগল খদ্দেরে। ফুটপাতেও ফলের দোকানে জমে গেল লোক। আমাদের ডালহৌসি পাড়ার মতোই। কিন্তু তফাত আছে। বেশ বড় তফাত।

আমেরিকা আয়তনে ভারতের তিন গুণ হেসেখেলে হবে। আর জনসংখ্যা তিন ভাগের এক ভাগ হলেই ঢের। তাই গোটা দেশটায় নির্জনতা বা জনহীনতা বড্ড বেশি। যত শহরে বা জনপদে গেছি বেশির ভাগই ভারি জনহীন মনে হয়েছে। ফলে নিউইয়র্কের জনবন্যা আমেরিকার প্রকৃত চিত্র নয়। নিউইয়র্কের সঙ্গে বাদবাকি আমেরিকার পার্থক্যের এটাও একটা পয়েন্ট।

আর জনস্রোতও কী বিচিত্র। সেভেনথ অ্যাভিনিউ আর ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটের চৌমাথার কাছাকাছি যে হাঁটুর কাছে ছেঁড়া জিনস্ আর নিতান্তই অজুহাতের মতো একখানা বক্ষাবরণ পরা সুন্দরী মেমসাহেবটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা উদাসভাবে চিবোচ্ছে, তাকে দেশের রাস্তায়-ঘাটে দেখলে আমার কর্ণমূল রাঙা হয়ে উঠত লজ্জায়। এখানে হল না। কারণ আশেপাশে পথ-চলতি মহিলাদের অঙ্গবস্ত্রও যৎসামান্য, অনেকেই লুক থ্রু জামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গরমটাও পড়েছে চেপে। পুরুষদের পোশাকও নিতান্তই সাদামাঠা। হাফপ্যান্ট পরা লোকের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ। স্যুট-টুট বিশেষ কারও পরনে নেই। টাইপরা লোক চোখে পড়ছে না। স্যুট-টাই পরা লোক যে নেই তা নয়। তবে ইনফর্মাল পোশাক পরা লোকের সংখ্যা বহু বহু গুণ বেশি।

হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি। দোকানে দোকানে চলছে খাওয়া-দাওয়া, কেনাকাটা। আমেরিকার জাতীয় খাদ্য কী, এই প্রশ্নের জবাবে কেউ যদি বলেন হ্যামবার্গার বা হট ডগ তবে তিনি যথার্থ। মাঝখানে একখানা গো-মাংসের ভর্জিত চাকা, ওপরেও নিচে দুটো মস্ত বান-রুটির চাকা—এই হল হ্যামবার্গার। সঙ্গে ড্রেসিং বা শাকপাতা থাকতে পারে। আবার ডবল বা ট্রিপল ডেকার অতিকায় হ্যামবার্গারও হয়। হট ডগ প্রায় একই বস্তু, তবে তার আকার লম্বা। কোথাও কোথাও দৈর্ঘ্য এক ফুট অবধি হয়। দামও বেজায় সস্তা। একখানা খেলেই ভরপেট হয়ে গেল। আগেই বলেছি, আমেরিকায় সব জিনিসই মাপে বড়। একখানা স্বাভাবিক সাইজের হ্যামবার্গার বা হট ডগও এত বড় যে, আমাদের মতো মানুষকে একটু অবাক হতেই হয়। এই দুটি খাদ্য আমেরিকায় জনপ্রিয়তার একেবারে শীর্ষে রয়েছে। ড্রেসিং হিসেবে এর সঙ্গে এক বাক্স আলুভাজা নিলে ব্যাপারটা আরও মুখরোচক হয়।

আমেরিকার আলুভাজার কথাটা এইবেলা বলে নেওয়া ভাল। একটা মোটা করে কাটা আলুর ফিঙ্গার চিপস আমেরিকার সর্বত্র সারাক্ষণ বিক্রি হচ্ছে। কোনও জিনিস এরকম ঝটিতি বিক্রি হয় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর সেই আলুভাজার গুণবর্ণনাই বা করা যায় কিভাবে। একটু চ্যাপ্টা মতো মাঝারি

মাপের একটা বাক্স ভর্তি করে উপচানো আলুভাজা একেবারে গনগনে গরম অবস্থায় পাওয়া যায়। তার স্বাদ আমাদের ঘরোয়া আলুভাজা বা পোট্যাটো চিপসের মতো নয়। সামান্য নুন ও যৎসামান্য মশলা ছিটোনো থাকে। খেতে অপূর্ব। খোঁজ নিয়ে দেখেছি এটি চর্বিতে ভাজা নয়। কর্ন অয়েল বা ওই জাতীয় ভোজ্য তেলে ভাজা। মজা হল, এটি অনেকক্ষণ মুচমুচে থাকে। নেতিয়ে পড়ে না। আমাকে বহুবার এই আলুভাজার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ভেবেছিলুম, এক প্যাকেট দেশে নিয়ে আসব। তা এরকম কত কী নিয়ে আসতে ইচ্ছে হয়েছে। আনতে হলে গোটা আমেরিকাই আনতে হয়। শুধু আলুভাজা এনে হবেটা কী? তাই শেষ অবধি আনা হয়নি।

গাড়িতে যখন উঠলুম তখন ঘামে জামা ভিজে গেছে। গাড়ির ভিতরে চমৎকার ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল। শরীরের ভিতরে ওত পেতে আছে তিন রাত্তিরের বকেয়া ঘুম। যখন তখন বাঘের মতো ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। বারবার চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসছেও। কিন্তু দুরন্ত নিউইয়র্ক আমাকে ঘুমোতে দিচ্ছে কই? আমার জাগ্রত চোখের সামনেই কে মেলে ধরছে নানা স্বপ্ন-দৃশ্য। যা দৃশ্যত বাস্তব বলে মনে হয় না। অথচ যা স্বপ্নও নয়।

সেভেনথ অ্যাভেনিউ ধরে টাইমস স্কোয়ার হয়ে টাউন হল ছাড়িয়ে আমরা চলেছি রকেফেলার সেন্টারের দিকে। এই অসাধারণ প্লাজাটির কথা অনেক শুনেছি। অবিশ্বাস্য। তবে আমাদের গেঁয়ো চোখে একটার সঙ্গে আর একটার সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা মুশকিল। আমাদের যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

ধ্রুব প্লেজার ও বিজনেস এক সঙ্গে মেশাচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে ঝট করে এ-গলি সে-গলিতে টুক করে গাড়ি থামিয়ে ঢুকে যাচ্ছে কোনও জয়েন্টে। রাস্তার ধারে ধারে মাঝে মাঝে জালিকাজ আছে—অর্থাৎ লোহার গ্রিল। সেখানে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ প্রলয়ংকর শব্দ উঠে আসে। আঁতকে উঠতে হয়। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শব্দটা পাতাল রেলের। আর জালিকাজটা হচ্ছে ভেন্টিলেশন। তবে গাড়ি পার্ক করার সময় এক জালিকাজগুলো এড়িয়ে রাখতে হয়। নইলে পুলিশ হয় ফাইন করবে, না হয় তো গাড়ি টেনে নিয়ে চলে যাবে।

ধ্রুব তার কাজে যায় আর আমিও নেমে পেভমেন্টে একটু ঘোরাঘুরি করি। এখানে দোকান সাজানোর ধরনটাই আলাদা, বড় দোকানগুলো এতই বড় যে আমাদের সব রকম পূর্ব ধারণা বা অনুমানকে নস্যাৎ করে দেয়। এক একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর মানে এক আশ্চর্য জগৎ। সেগুলোর কথা বাদ দিচ্ছি। ছোটোখাটো দোকানগুলোর ঐশ্বর্যই আমাদের থ করে দিতে পারে। কলকাতার সঙ্গে তুলনা করে লাভ নেই। কোনও দিক দিয়েই তুলনীয় নয়। তবে বাঁচোয়া এই যে, আমরা যারা কলকাতাকে ভালবাসি- তারা ঐশ্বর্যের কারণে কলকাতাকে ভালবাসি না।

থিয়েটার ডিস্ট্রিক্ট ছেড়ে ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রিট পেরিয়ে ব্রডওয়ে ধরে নিউ ইয়র্ক কলম্বিয়মের পাশ ঘেঁসে আমরা নাইনটি সিকস্থ স্ট্রিট অবধি গেলুম। অনেকটা রাস্তা। তারপর ধরলুম ফেরার পথ হেনরি হাডসন পার্কওয়ে। একদিকে হাডসন নদী, অন্য দিকে নিউইয়র্ক শহর। রাস্তাটা কিছুটা নিচে। ভারি মনোরম। নদীর ধারে ধারে জেটি, নৌকো-লঞ্চ-স্টিমার নোঙর করার বিশাল ব্যবস্থা। প্রশস্ত চমৎকার রাস্তা, স্বপ্নসম অবিশ্বাস্য। নদীর ধার ছেড়ে ফটি সেকেন্ড স্ট্রিট ঘুরে আসতে হল থার্টি নাইনথ স্ট্রিটে। তারপর টোল দিয়ে ঢুকে পড়লুম লিঙ্কন টানেলে। এক ডুবে নদী পেরোলেই নিউ জার্সি।

একটু ঘোর-ঘোর ভাব রইল অনেকক্ষণ। নিউইয়র্কের প্রথম দিন চাক্ষুষ করার একটা ধাক্কা আছে। যা চোখ ও মনকে খানিকটা বিমূঢ় করে দেয়।

ফিরে এসে বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ করছিলুম না। ধ্রুবকে বললুম, তুমি কাল কখন বেরোবে ?

নটা নাগাদ।

আমি কালও নিউইয়র্ক যাবো।

কোনও চিন্তা নেই। আমি তুলে নিয়ে যাবো।

ধ্রুব সাফার্ন নামে নিউইয়র্ক রাজ্যের একটি ছোটো শহরে থাকে। বেশ দূর। তবে এই দূরের দেশে দূরটাকে কেউ পাত্তা দেয় না। চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরত্বকে এরা এসপ্লানেড-গড়িয়াহাটের দূরত্ব বলে মনে করে। পেট্রলও যে বেজায় সস্তা।

আমেরিকার টিভি প্রোগ্রাম কেমন তা দেখতে বসে গেলুম বাড়িতে ফিরে। কিন্তু সেখানেও আর এক বিস্ময়। আমাদের ভারতবর্ষে একটিই মাত্র ন্যাশনাল চ্যানেল। শুধু চার মহানগরীতে দ্বিতীয় চ্যানেলে সবে কিছু সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। তাও কলকাতার দ্বিতীয় চ্যানেলের ছবি পরিস্কার আসতে চায় না।

ভবানী আলোলিকাদের টিভি আন্টেনা-নির্ভর নয়। এ কে বলা হয় কেব্‌ল্ টিভি। অর্থাৎ তার-সংযোগে প্রোগ্রাম আসে। অজস্র চ্যানেল। অজস্র অনুষ্ঠান। একটি চ্যানেল আছে যা শুধু বাচ্চাদের জন্য অ্যানিমেশন ছবি। অন্যটিতে বাচ্চাদেরই নানারকম ফিলম্ ও অনুষ্ঠান। একটি চ্যানেলে কেবল সংবাদ প্রচারিত হয়ে চলেছে। অজস্র বিজ্ঞাপনে ঠাসা আরও অসংখ্য চ্যানেলে ফিলম নাটক সংবাদচিত্র কত কি যে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে হয়ে চলেছে তার হিসেব নেই। সংবাদ প্রচারের পদ্ধতিটি ভারি অভিনব। যে মানুষটি খবর পড়ছিলেন তাঁর চেহারাটি পুরুষালি কিন্তু মুখচোখ ভারি শান্ত এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ভবানী বলল, এই লোকটিকে সংবাদ পাঠের জন্য এত বেতন দেওয়া হয় যা এই ধনী দেশের পক্ষেও ঈর্ষণীয়। সংবাদ পাঠক এক একটি খবর বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার সাক্ষাৎকারও নিচ্ছেন। দেখানো চলছে খবরের ছবিও।

টিভি প্রোগ্রামের এই বিশাল বৈচিত্র্যও অন্যত্র পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। অবশ্য এইসব টিভিতে যৌনতামূলক প্রোগ্রামও থাকে বিশেষ বিশেষ চ্যানেলে অন্তত হোটেলের ঘরে যে-সব টিভি থাকে তাতে তো আছেই। আমেরিকায় প্রায় সবকিছুই অবাধ। নৈতিকতার খাতিরে বিধিনিষেধের বালাই নেই। সেটা এদেশের কতটা উপকার করেছে জানি না। কিন্তু এই অত্যধিক উদারতাকে আমি মেনে নিতে পারিনি। এর প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয়নি।

রিমোট কন্ট্রোলে চ্যানেলের পর চ্যানেল বদলে হাতে ব্যথা হয়ে গেল। প্রোগ্রামের শেষ নেই। গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রী আমার কাণ্ড দেখে হাসছিলেন। বললেন, আমরা খুব বেছে বেছে দেখি। এখানে এত প্রোগ্রাম থাকে যে, মাথা খারাপ হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, ন্যাশনাল চ্যানেল ছাড়াও স্থানীয় চ্যানেলই অনেকগুলো রয়েছে। যে শুধু টিভি দেখে সময় কাটাতে চায় তার স্বর্গরাজ্য হল আমেরিকা। বয়স্ক বয়স্কারা, পঙ্গু বা নেই-কাজের লোক এভাবে সময় কাটায়ও। তাদের টিভি-নেশাখোর বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ঘণ্টাটাক টিভি সেট নিয়ে ধস্তাধস্তির পর ক্ষ্যামা দিতে হল। একটা মিনিট দশেকের অ্যানিমেশন ফিলম টুক করে দেখে নিলাম। বেশ লাগল।

ঘড়িতে রাত প্রায় পৌনে আটটা। বাইরে ঠা-ঠা রোদ্দুর। আমরা তার মধ্যেই নৈশভোজে বসে গেলাম। তারপর দীর্ঘ আড্ডা।

কথার মাঝখানে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, এখানে চুরি-ডাকাতি হয় না?

গৃহকর্তা মাথা নেড়ে বললেন, নিউ জার্সিতে চুরি-টুরি বিশেষ হয় না। তবে একেবারে নেই বলব না। আমাদের বাড়িতেই একবার চোর ঢুকেছিল। আমরা তখন বাইরে। জিনিসপত্র তো এরা নেয় না। নিয়ে গেছে শুধু ক্যাশ টাকা আর ভুল করে কিছু ঝুটো গয়না।

চোর ধরা পড়েনি?

গৃহকর্তা মাথা নাড়লেন, সাধারণত পড়েও না। তবে পুলিশ এনকোয়ারিতে এসেছিল। বলে গেল, এসব ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কাজ। নেশার পয়সা যোগাতে চুরি করে।

চুরি ঠেকানোর জন্য বার্গলার অ্যালার্ম ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। এখানকার সেয়ানা চোরেরা আমাদের দেশের চোরের চেয়ে বেশি চক্ষুষ্মান। তারা লক্ষ রাখে কোন বাড়িতে গেরস্ত অনুপস্থিত। গভীর রাত অবধি যে-বাড়িতে আলো জ্বলে না যে-বাড়ির লনের ঘাস বেশি বড় বড় হয়ে উঠেছে সেই বাড়িতে নির্ঘাত গেরস্ত নেই। ফলে তারা সেই বাড়িতে হানা দেয়।

চোরদের ঠেকাতে তাই বাড়িতে বাড়িতে টাইমার দেওয়া থাকে। গেরস্ত

দূরদেশে থাকলেও সন্ধের পর আপনা থেকেই ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে উঠবে এবং কয়েক ঘণ্টা পরে আপনা থেকেই নিবে যাবে। আর লনের ঘাস নিয়মিত কাটবার জন্য আজকাল এজেন্সি আছে। টাকা দিয়ে চুক্তি করে নিলে সপ্তাহে একবার তাদের লোক এসে ইলেকট্রিক যন্ত্রে ঘাস কেটে দিয়ে যায়।

তা সত্ত্বেও যে চুরি ঠেকানো যায় তা নয়। মাদকাসক্তরা তবু মাঝে মাঝে হানা দেয়। সুতরাং আকছার না ঘটলেও চুরি এবং চোর সম্পর্কে একটা চাপা টেনশন আছেই। আমেরিকায় আগ্নেয়াস্ত্র প্রায় অবাধেই কেনা যায়। চোরেরা তাই সশস্ত্র হতেই পারে। সুতরাং আমেরিকা খুব নিরাপদ জায়গা বলে মনে করা ভুল হবে।

বেশ একটু রাত করেই বেসমেন্টে ঘুমোতে গেলাম। শরীর ভরা ঘুম। কিন্তু বিছানায় শোওয়ার দু তিন ঘণ্টা পরই আবার ঘুম ভেঙে গেল। জেট ল্যাগের ঠেলা বেশ বুঝতে পারছি।

এদিকে আমি এসেছি কি না তা জানবার জন্য বাড়িতে অনেকে টেলিফোন করে খোঁজখবর নিয়েছেন। নিচ্ছেন রোজ। দ্বিতীয় রাতে ঘুমোতে যাওয়ার কিছু আগে ফিলাডেলফিয়া থেকে ফোন করলেন ডঃ সুশীল দাশগুপ্ত। গলা শুনেই বুঝলুম, রসিক ব্যক্তি।

বললেন, একটু সময় করে ফিলাডেলফিয়া আসুন। এখানে অনেকেই মিট করতে চাইছেন। আমি বঙ্গ সম্মেলন থেকে আপনাকে নিয়ে আসব।

ফিলাডেলফিয়া সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিলই। কাজেই বললুম, রাজি। তবে বেশি আটকে রাখবেন না।

না, তা রাখব না। দিন দুই অন্তত থাকতেই হবে। এখানে যা দেখার তা দেখিয়ে দেবো।

সুশীলদার কথা আগেও লিখেছি। চমৎকার মানুষ।

ফোন এল তনুশ্রীর। সে বলল, আমি কলথাসে আপনাকে আনবই।

আরও নানাজনের ফোন এল। সবাই তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। আমরাও আগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু আমেরিকায় খুব বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। দেশে ফিরে আমাকে পুজোর লেখা শেষ করতে হবে। আছে আরও নানা দায়িত্ব। তবু কাউকে সরাসরি না করতে পারলুম না। 'চেষ্টা করব' 'দেখা যাক' ইত্যাদি বলে ঝুলিয়ে রাখলুম।

দ্বিতীয় রাতে মাঝপথে ঘুম ভাঙলেও ভাঙা ঘুম আবার জোড়া লাগল। তবে ঘুম ভাঙল বেশ ভোরে। প্রাতঃকৃত্য এবং পুজোপাট সেরে প্রথম দিনের মতোই আবার বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরেটায় যতবার এসে দাঁড়াই ততবারই ছবি-ছবি ভাবটা ঘিরে থাকে।

খবরের কাগজটা আজও কুড়িয়ে নিলুম। আজকের কাগজ আরও মোটা। এর পাতা ওল্টাবার সময়টুকুও তো এদের নেই।

ব্রেকফাস্টের জন্য গৃহকর্ত্রী ডাকলেন। আজ তাঁর রান্নাঘরটা ভাল করে লক্ষ করলুম। বলাই বাহুল্য এখানে রান্নার গ্যাস আসে পাইপ লাইনে। সিলিন্ডারে নয়। কলকাতাতেও পাইপ লাইনে গ্যাস আসত। সে ব্যবস্থা প্রায় লাটে উঠে গেছে। এই রান্নাঘরে চারটে মুখওলা গ্যাস উনুন কিন্তু চাবি ঘুরিয়ে দেশলাই জ্বালানোর ঝামেলা নেই। চাবি ঘোরালে গ্যাস আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। ছোট্ট রান্নাঘরটিতে এ ছাড়াও আছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেকট্রিক ওভেন, বাসনমাজার যন্ত্র ইত্যাদি। গরম হাঁড়ি কড়াই ধরবার জন্য আমাদের মেয়েরা কাপড় বা কাগজ ব্যবহার করেন। এখানে দস্তানাই রয়েছে। মোটা ফায়ারপ্রুফ দস্তানা। ঘরকন্নার আরও যে কত খুঁটিনাটি সুখসুবিধার বন্দোবস্ত আছে তা বলতে গেলে আলাদা বই লিখতে হয়।

ধ্রুব এল সময়মতোই। এ দিন আমরা দু জনেই বেরোলাম। আবার নিউইয়র্ক তবে আজ প্রমোদ-ভ্রমণ নয়। ধ্রুব তার ব্যবসার কাজ করবে, আর আমি শুধু সঙ্গে থাকব।

আজ আমরা নিউইয়র্কে ঢুকলাম হল্যান্ড টানেল দিয়ে তারপর ক্যানাল স্ট্রিট ধরে সোজা চায়না টাউন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে জাহাজঘাটের পাশের রাস্তা ধরে যখন যাচ্ছি তখন মার্কিন বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ দেখে চোখ বুজে ফেললুম। আমি আর কত অবাক হবো ?

আমেরিকানদের বৃহতের প্রতি ঝোঁক বড্ডই বেশি। যা-ই বানায় তা বিশাল করে। যেমন তার হ্যামবার্গার তেমনই তার যুদ্ধজাহাজ। লিলিপুটের দেশ থেকে আমি যেন উড়ে এসে পড়েছি ব্রবডিংন্যাগদের দেশে।

ধ্রুব বলল, চলুন, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংটা দেখিয়ে আনি আপনাকে। যদিও ওটা এখন নিউইয়র্কের উচ্চতম বাড়ি নয়। ওকে মেরে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার।

নিউইয়র্কে রাস্তায়-ঘাটে যথেষ্ট মারপিট হয়ে থাকে। শিকাগোতে আরও হয় বলে শুনেছি। মাঝে মাঝে সাধারণ মারপিট খুন-জখমে দাঁড়িয়ে যায়। মারপিটে যদি অংশভাগী না হতে হয় তাহলে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ব্যাপারটা দেখতে মন্দ লাগে না, অবশ্য যদি রক্তপাত না ঘটে। মারপিটের ভিতরে হিংস্রতা অবশ্যই আছে, কিন্তু পৌরুষও আছে। আর ব্যাপারটা আদিম ও ধারাবাহিক বলেই বোধহয় মানুষকে আকর্ষণও করে।

নিউইয়র্কে দ্বিতীয় দিনে আমার চোখের সামনে একজন জম্পেশ মারপিট ঘটে গেল। আমার সঙ্গী ধ্রুব ব্যাগের কারবারী। বিভিন্ন পাইকারি দোকানে সে ভারতবর্ষে তৈরি তার ব্যাগ সরবরাহ করে থাকে। এরকমই একটি দোকানে সে যখন বাণিজ্যিক কথাবার্তা বলতে ঢুকেছে তখন আমি নিউইয়র্কের রাস্তাঘাটের

দৃশ্য দেখতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। অদূরে একটা ডেলিভারি ভ্যান থেকে শ্বেতাঙ্গ কুলিরা জিনিসপত্র নামাচ্ছে। আমার সামনে কয়েকজন চীনা মানুষ ফুটপাতেই বসে আড্ডা মারছে। পাড়াটি চীনা অধ্যুষিত এবং পুরোপুরি ব্যবসায়িক পরিবেশ। চারদিকে যথারীতি দীর্ঘ দীর্ঘ অট্টালিকা। তবু দুপুরের খাড়া রোদ একেবারে সোজাসুজি এসে ভাজা ভাজা করছে, এদিককার ফুটপাত। তুমুল গরম আর রোদে ঘেমে যাচ্ছি। কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে হাঁ করে যতদূর এবং যতটা দেখা যায় দেখে নিচ্ছি।

আচমকাই মারামারিটা লাগল। ডেলিভারি ভ্যানের লোকদের সঙ্গে দোকানদারদের। দু' পক্ষই বিশেষ রকমের স্বাস্থ্যবান। ফলে হুড়োহুড়িটা মুহূর্তের মধ্যে সুঙ্গ-উপসুঙ্গের লড়াইতে দাঁড়িয়ে গেল।

মনে পড়ে, বেশ কিছুকাল আগে কলেজ স্ট্রিটে একটা মারপিট দেখেছিলাম। একজন লোককে আরও তিনজন পেটাচ্ছে। কিন্তু মারকুট্টারা এতই ক্ষীণতনু এবং দুর্বল যে, দশ বারোটা ঘুসিতেও লোকটার কিছু হল না। অর্থাৎ তেমন কিছু হল না। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা—অর্থাৎ যারা গুণ্ডা বা মস্তান নয় বা যারা মুষ্টিযুদ্ধ-টুদ্ধ জানে না—তাদের মারপিটের কৌশলও অধিগত নয়। উপরন্তু শরীর দুর্বল বলে তাদের মারেরও জোর নেই। নিউইয়র্কের মারকুট্টারা সেই অর্থে দুর্বল নয়। এটা ঘুমোঘুসির তীর্থক্ষেত্র। স্ট্রিট ফাইটিং মার্কিন জীবনধারার একটি অংশবিশেষ। কালো মানুষদের বসতি অঞ্চলে শরীরেরই প্রাধান্য বেশি। হারলেম বা ফোরটিনথ স্ট্রিটে আচমকা মারপিট, ছুরি বা আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকাশ সহজেই ঘটে।

মারকিন মারপিটটা আমি খানিকটা সভয়ে এবং খুব মনোযোগর সঙ্গে প্রত্যক্ষ করলুম। ভয় এই কারণে, দেশটা আমেরিকা, চট করে যদি বন্দুক পিস্তল বেরিয়ে পড়ে তাহলে ক্রস ফায়ারে বিপদ আমারও ঘটতে পারে। তাছাড়া মারপিট জিনিসটা ভারি ছোঁয়াচে, চট করে ছড়িয়ে পড়ে চারধারে এবং নির্দোষ লোকেরা খামোখা ঝাড় খেয়ে বাড়ি ফেরে।

আমার সামনে আড্ডারত চীনেরা মারপিট দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওদিকে লড়াইতে তিন-চারজন শ্বেতাঙ্গকে রাস্তায় গড়িয়ে পড়তে দেখলুম। একটা কালো লোক বনবন করে একখানা রড ঘোরাচ্ছে। কাঁকালে চোট পেয়ে একজন ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে রণভূমি ছেড়ে পালাচ্ছে।

গা বাঁচাতে আমি দোকানে ঢুকে পড়তে পারতুম। কিন্তু এ দৃশ্যটা তাহলে আর দেখা হয় না। কাজেই দেয়ালে শরীর সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলুম। যা হওয়ার হবে।

মিনিট দশ-বারো ধরে লড়াইটা চলল। রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা হয়ে গেল। আমার সামনের চীনা আড্ডাবাজরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেও আর এগোয়নি। নিজেদের মধ্যে চীনা ভাষায় উত্তপ্ত কথাবার্তা বলতে লাগল, কিন্তু মারপিট করতে এগোল না।

লক্ষ করলুম লড়াইটা মাল্টিন্যাশনাল। অর্থাৎ সাদা বনাম চীনা বনাম কৃষ্ণাঙ্গ নয়। কুলিদের মধ্যে সাদা, কালো দুরকমই আছে। আর বিপক্ষেও আছে চীনা ছাড়া অন্য জাতীয় লোক। সুতরাং একটা প্রবল রকমের হুচপচ।

মারপিটটা থামল, যেমন লেগেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই। আচমকা।

তারপরই দেখলুম, কুলিরা ধপাধপ গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে দোকানে ডেলিভারি দিচ্ছে, যেন কিছুই ঘটেনি।

রক্তারক্তি কাণ্ড চোখের সামনে দেখতে হল না, এই যা সান্ত্বনার কথা।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংস দেখবার একটা ইচ্ছে বহুকালাবধি বুকে পোঁতা আছে। শেষ অবধি সেই স্পর্ধিত নির্মাণের চরণসমীপে যখন উপনীত হলুম তখন বিস্ময়ের স্টেজটা পার হয়ে এসেছি। নিউইয়র্কেই এখন এর চেয়ে উচ্চতর বাড়ি রয়েছে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। তার চেয়েও উঁচু শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার সুতরাং এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংসের সেই ইজ্জত অরা নেই।

তবু এই বিশাল বাড়িটির একটি ঐতিহ্য আছে। স্ট্যাচু অফ লিবার্টি যেমন এক মহান প্রতীক এম্পায়ার স্টেটও প্রায় তাই।

যখন এই মহতী নির্মাণের সামনে পৌঁছোলাম তখন আর দশটা উঁচু বাড়ির সঙ্গে এটির পার্থক্য কী তা চট করে বোঝা গেল না বাড়িটা যে বেশ পুরনো হয়েছে তারও কিছু কিছু লক্ষণ ধরা পড়ছিল চোখে। আর এর স্থাপত্যটিও ঈষৎ পুরনো।

ধ্রুব জিজ্ঞেস করল, উঠবেন নাকি?

ইচ্ছে করছিল, তবু ঘড়ির দিকে চেয়ে লোভ সংবরণ করতে হল। বললুম, না, থাক। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে তো উঠবই। উচ্চতরটিতেই বরং ওঠা ভাল।

ওপরে না উঠলেও বাড়িটির আশেপাশে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলুম। দেখলুম তার তলায় কোনও দর্শনার্থীর ভিড় নেই। বাড়ির অরণ্যে হারাই-হারাই ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংস।

আজ রাতে আমার থাকার কথা ধ্রুবর বাড়ি স্যাকার্নে। এ শহরটি নিউ ইয়র্ক রাজ্যেই। বেশ কয়েকটা ছোটো ছোটো চিত্রার্পিত শহর পার হয়ে যেতে হয়।

আমেরিকার এই সব ছোটো শহরগুলো আমাকে সম্মোহিত করছে সবচেয়ে বেশি। আগেও বলেছি এই ক্ষুদে শহরগুলিতে লোকজনের ভিড় দেখাই যায় না। পথঘাট প্রায় সবসময়েই ফাঁকা হা-হা করছে। এক অতীব গভীর সবুজে আধডোবা এই সব স্বপ্নসম শহর তৈরি করতে অনেক মেহনত চাই, চাই প্রখর সৌন্দর্যচেতনা আর শিল্পবোধ।

আমরা চলেছি দক্ষিণে, একটু দক্ষিণ-পূর্বে। মসৃণ চওড়া রাস্তা। বাধাহীন গতি। দুধারে সমৃদ্ধ প্রকৃতি। মাঝে মাঝে ঝাঁ করে চলে আসছে এক একটা শহর।

কত হবে এই সব শহরের জনসংখ্যা? নিশ্চয়ই বেশি নয়। কিন্তু তবু প্রতিটি

শহরেই প্রধান রাস্তার আশেপাশেই চোখে পড়বে অতিকায় একাধিক সুপারস্টোর। অন্তত পাঁচ ছ'খানা গাড়ির দোকান। প্রতিটি দোকানেই অন্তত এক দেড়শো নতুন ও পুরনো গাড়ির ডিসপ্লে। পুরনো গাড়ির সারিতে ভোকস্‌ওয়াগেন থেকে আধুনিকতম মার্সিডিজ বেঞ্জ সবই পাবেন। সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি বেজায় সস্তা। ভদ্রলোকেরা সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি কিনতে চায় না।

কথা হল, এই সব ছোটো শহরে এত গাড়ি কেনে কে ? এই সব সুপার স্টোরে এত জিনিসের খদ্দেরই বা জোটে কি করে ?

কিন্তু জোটে। পরে একদিন সুপারস্টোরে গিয়ে দেখেছি, গড়পড়তা মার্কিনরা কী পরিমাণে জিনিস কেনে তা চোখে না দেখলে প্রত্যয় হয় না। আর গাড়ি ! আমেরিকা গাড়ির দেশ বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই অন্তহীন চলমান গাড়ি আর গাড়ি। কোনও হাইওয়েই বোধহয় কোনও সময়ে ফাঁকা যায় না। অটোমবিল বাহিত আমেরিকার প্রগতি শতধা ধাবিত।

স্যাকার্ন শহরটিতে যখন পৌঁছোলাম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধে।

একটি অরণ্যসংকুল নডিউবা পাহাড়ের সানুদেশে বিশাল একটি হাউসিং কমপ্লেকস—একেবারে আনকোরা গড়ে-ওঠা।

গায়ে গায়ে লাগালাগি, অথচ ভারি চমৎকার পরিকল্পনার এই সব অ্যাপার্টমেন্ট। সামনে পার্ক করার জন্য খানিকটা জমির ছাড় আছে। সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দোতলার উচ্চতায় উঠলে বাড়ির প্রবেশ পথ। বেশ বড়-সড় এবং চোখ-ধাঁধানো একটি লোডিং রুম। তলায় বেসমেন্ট। ওপরে শোওয়ার ঘর। পিছনে অর্থাৎ যেদিকে পাহাড় সেদিকে একটি কাষ্ঠনির্মিত চাতাল। এখানে বেশির ভাগ বাড়িতেই বাড়ির পিছনে এইরকম খোলা চত্বরে একটি করে বার-বি-কিউ-এর যন্ত্র বসানো। মাংস বা মাছ ঝলসে খাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক বা গ্যাস-প্রজ্বলিত বিশেষ উনুন।

খোলা জায়গায় এরা এমন অনেক কিছু এত অবহেলায় ফেলে রেখে দেয় যে, আমাদের অনভ্যস্ত চোখে অস্বাভাবিক ঠেকে। অথচ বাইরে রাখাই নিয়ম। চুরিটুরি হয় না।

বাড়ির পিছন দিক থেকেই পাহাড়ের ঢাল বেশ খাড়া উঠে গেছে। বিশাল বিশাল গাছের অরণ্য। ওর যে-কোনও একটি গাছ ঝড়ে বা দুর্যোগে উৎপাটিত হলে সপাটে এসে পড়বে বাড়ির ওপর। আর আমেরিকার এই সব পুতুল-বাড়ি এমন ফঙ্গবেনে জিনিস দিয়ে তৈরি যে ওই কয়েক টন গাছের গতিময় ওজনকে সামাল দেওয়ার সাধ্যই নেই। ধসে পড়বে। আর শুধু গাছই বা কেন, প্রবল বৃষ্টিতে জলের ঝোরা বা ধসও নেমে আসতে পারে।

কথাটা ধ্রুবকে বলতেই তার মুখ শুকোল। বলল ব্যাপারটা যে আমি ভাবিনি

তা নয়। ওপরে উঠলে দেখবেন আমার বাড়ির সোজাসুজি কয়েকটা গাছের গোড়া বেশ আলগা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে বলেছিলাম গাছ কটা কেটে ফেলতে। ওরা বলল, ওসব হবে না। তুমি বরং নিজের খরচে মোটা তার দিয়ে গাছগুলিকে বেঁধে রাখো। গাছ কাটা চলবে না।

এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটি কেন এরকম বিপজ্জনক জায়গায় তৈরি করা হল সেটা আমার মাথায় এল না।

ধ্রুবর বউ মধ্যমগ্রামের মেয়ে, এখানে একটি মস্ত গুজরাতি ফার্মে বেশ উঁচুদরের চাকরি করে। তার নিজস্ব কমপিউটার আছে। ভারি হাসিখুশি আর শান্ত স্বভাবের এই মেয়েটির মানসিক দৃঢ়তার খানিকটা পরিচয় পেয়েছি। বেশ একটু সাহসী লড়াই করেই সে আমেরিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ধ্রুবর শ্বশুরমশাই আর শাশুড়িঠাকরুণও বেড়াতে এসেছেন। আজকাল ছেলে বা মেয়ে আমেরিকায় থাকার সূত্রে শ্বশুর-শাশুড়ি বা মা-বাবাকে পর্যায়ক্রমে এদেশে আসতে হয়। আমাকে পেয়ে ভারি খুশি হলেন এঁরা। সারাদিন মেয়ে-জামাই ঘরে থাকে না, বাঙালির মুখ দেখা যায় না। কাউকে পেলে ভাল লাগবেই।

বেশ বিশাল ভোজের ব্যবস্থা করেছে বৃতি। তার ডাইনিং টেবিলটি দেখবার মতো। ওপরটা একটি অখণ্ড কাচ।

মুশকিল হল, আমি নিয়ামিষ খাই বলে আজ এ বাড়ির সবাই নিরামিষ খাচ্ছেন। বন্দোবস্ত চমৎকার।

গল্প করতে করতে খাচ্ছি। লক্ষ করছি, ধ্রুব কেমন অস্বস্তির সঙ্গে খাচ্ছে। খাওয়ার শেষে দেখি সে একবার খানিকটা নুন মুখে পুরল, খানিকটা লঙ্কাগুঁড়োরও। তারপর চারদিকে তাকাতে লাগল অসহায়ভাবে।

আমি হেসে বললুম, তুমি মাছ-মাংস খেলেই পারতে। তাহলে এই অস্বস্তিটা হত না।

ধ্রুব একগাল হেসে বলল, কী জানেন, আমি জন্মেও নিরামিষ খাইনি। নিরামিষ খেয়ে আপনি কি করে থাকেন বলুন তো!

তোমার পেট ভরেনি তো?

না, তা নয়। তবে মনে হচ্ছে, কী যেন একটা হল না। মানে ঠিক বোঝাতে পারব না।

বৃতি ধ্রুবকে একটু ধমকাল, আমরা সমবেতভাবে হাসতে লাগলুম।

স্যাকার্ন শহরটি দেখলুম সকালে। আর পাঁচটি মার্কিন শহর যেরকম অবিকল তা-ই। তবে এখানে পাহাড় আছে।

নতুন নতুন নানা শহরের পত্তন আমেরিকায় নিয়তই ঘটছে। পাশাপাশি আছে পরিত্যক্ত ভুতুড়ে শহরও। এক সময়ে যেখানে লোকবসতি ছিল, তারপর

বাস উঠে গেছে। পড়ে আছে ফাঁকা সব বাড়ি। আমেরিকার এসব গোস্ট টাউন নিয়েও কত গল্প আছে।

আমাদের দেশে শহর পত্তন হলে তা আর উঠে যায় না। কিন্তু আমেরিকানদের যায়। কারণ তারা নিত্য নতুনের অভিসারী।

স্যাকার্ন শহরটি অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও সেখানেও কিছুরই অভাব রাখা হয়নি। সমৃদ্ধ, ঐশ্বর্যময় তার পরিবেশ।

নিউইয়র্কে আবার এলুম। তৃতীয়বার। নিউইয়র্ক যে কেন একঘেয়ে লাগে না, কেন নিত্য নতুন ছবি চোখের সামনে মেলে ধরে তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। তৃতীয় দিনেও নিউইয়র্কের সেই সব পাড়াতেই ঘুরেছি যেখানে বাণিজ্যের বাহুল্য।

আজ অবশ্য নিউইয়র্কে আসার সময় আমরা ওয়েন হয়ে আলোলিকাকে নিয়ে এসেছি।

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হতে শুরু করার পর থেকেই নানা জন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন আমেরিকা যাওয়ার উপায় বলে দেওয়ার জন্য। বেড়ানোর জন্য নয়। অনেকেই সেখানে চাকরি বা স্থায়ী কিছু করতে চান। এই চাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এদেশে যখন আমরা জীবিকার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছি, বেকারত্ব যখন বুকে হাঁটু গেড়ে বসেছে জগদ্দলের মতো তখন এই দুর্ভাগ্য দেশ থেকে সব পেয়েছির দেশে কে না যেতে চাইবে ? কিন্তু স্থায়ীভাবে আমেরিকায় চলে যাওয়ার কোনও সহজ উপায় আমার জানা নেই। কন্যাদায়গ্রস্ত এক পিতা লিখেছেন তাঁর মেয়ের জন্য আমেরিকার বাঙালি পাত্র জোগাড় করে দিতে। আর একজন লিখেছেন তাঁদের মার্কিনপ্রবাসী ছেলের জন্য বাঙালি পাত্রী জোগাড় করে দিতে। এসব আবদারও ভারি ন্যায্য। বিবাহসূত্রে যদি বা বঙ্গললনারা আমেরিকায় যেতে পারেন চাকরি বা কর্মসূত্রে যাওয়াটা তত সহজ নয়। বিশেষ করে বহিরাগতদের ভিড় কমানোর জন্য অভিবাসন আইনের কড়াকড়ি এখন জোরদার।

তবে নিছক বেড়ানোর জন্য যাওয়া সম্ভব হলেও তাতে ঝুঁকি অনেক। আগেই বলেছি, আমেরিকা বিশাল দেশ, পথপ্রদর্শক বা উপযুক্ত সঙ্গী ছাড়া ওই বিশাল জটিল দেশে ভাল করে কিছুই দেখে ওঠা সম্ভব নয়। এক ভদ্রলোক পাঁচশো কুড়ি ডলার সম্বল করে একা ওই অচিন দেশে হাজির হয়েছিলেন। ঘটনাটা বেশি দিন আগেকারও নয়। নিউইয়র্কে পৌঁছে তিনি হোটেলে আশ্রয় নেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছিল তখন খুব। ভদ্রলোক হোটেল থেকে বিশেষ বারও হতে পারেননি। তিনি চারদিন কাটতে না কাটতেই ডলার উবে গেল। অগত্যা তিনি ফের ফিরতি প্লেনে চেপে ফিরে এসেছিলেন। চেনা জানা না থাকলে শুধু সীমিত ডলারের ওপর নির্ভর করে মার্কিন মুলুকে বেড়াতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মার্কিন মুলুকের হাতছানি বড়ই মারাত্মক। এই ফাঁদে পা দেওয়ার জন্য ব্যাকুলতা যতই থাক, বাস্তববুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া উচিত হবে না।

নীলা নামে একটি মেয়েকে আমি চিনতুম। গরিব ঘরের লক্ষ্মীশ্রীযুক্তা মেয়ে। স্বভাবটিও ভারি ভাল। লেখাপড়ায় তেমন দড় নয়, ইংরিজি মিডিয়মে পড়েওনি, গ্রামের বাইরের জগৎ তার কাছে অচিন দুনিয়া। ভারি ভীতুও বটে। তার মতো মেয়ের বিয়ে হওয়ার কথা কোনও স্কুল শিক্ষক বা নিদেন কেরানির ঘরে। অথবা গ্রামেরই কোনও গেরস্তর ছেলের সঙ্গে।

ভাগ্যের ফেরে তা হল না। নীলার কাকা কলকাতার লোক। খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে মার্কিন মুলুকে এক পাত্রের 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দেখে তিনি উত্তেজিত হলেন। বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে 'স্বল্প শিক্ষিতা হলেও চলবে, গ্রামের মেয়ে হলে অগ্রাধিকার।' মার্কিন মুলুকের পাত্র ওরকম পাত্রী কেন চাইছে সেটা একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু খুড়োমশাই ভাইঝির আমেরিকা যাত্রার সুবর্ণ সুযোগের কথা ভেবে অন্য কথাটা আর ভাবেননি।

চিঠিপত্র চালাচালি হল। নীলার ফটো দেখে পাত্র লিখল, মেয়ে পছন্দ। দু মাস বাদে সে মাসখানেকের জন্য দেশে আসবে। মুখোমুখি দেখে পছন্দ হলে বিয়ে করে রেখে যাবে। তারপর ভিসা ইমিগ্রেশন ইত্যাদির পর পাত্রী রওনা হবে মার্কিন দেশের পতিগৃহে।

গরিব ঘরে এ প্রায় আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতো ঘটনা। পাত্রের কোনও দাবি-দাওযাও নেই। তবে এদেশে পাত্রের বাড়ি কোথায়, আত্মীয়-স্বজনই বা কে আছে তা জানা যায়নি। কিন্তু নীলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবাই এত মশগুল যে, এত সব খতিয়ে দেখাটা বাহুল্য বলে বর্জিত হল।

পাত্র হল। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, ঐশ্বর্যের ছাপ সর্বাঙ্গে।

দুদিন ধরে নীলার ইন্টারভিউ হল। ভীতু, সরল, গ্রাম্য নীলা ভয়ে মরে। কিন্তু তারও বুকের মধ্যে মার্কিন ঢেউ উঠছে, রোমহর্ষ হচ্ছে।

পাত্র সাত দিন বাদে জানাল, সে বিয়ে করবে।

গরিবের সঙ্গে যতটা সম্ভব ঘটা করেই বিয়ে হল। নীলাকে হীরের আংটি দিল তার বর। নেকলেসও। আর দিল মার্কিন দেশে যাওয়ার বিমান-ভাড়া। নীলার বাবা আর কাকাকে তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বলে পাত্র বিদায় নিল।

বিয়ের আগে অবশ্য আত্মীয়রা প্রশ্ন করতে ছাড়েনি পাত্রকে। তার কে কে আছে, কোথায় আছে ইত্যাদি এবং এদেশেই বা সে কোথায় এসে উঠেছে। পাত্র সবিনয়ে জানাল, তার মা বাবা ভাই ও বোন সবাই আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় থাকে। এখানে তার কেউ নেই। এক বন্ধুই তার সম্বল। তার বাড়িতে থেকেই বিয়ে করে যাবে।

বিয়ের পর প্রোষিতভর্তৃকা নীলা শকুন্তলার মতোই দুস্মন্ত মিলনের জন্য ছটফট করছিল। তার চেয়েও বেশি আকর্ষণ মার্কিন মুলুকের। তার বর বেশ ভাল চিঠি লেখে, তাতে ভালবাসা জানায়। আর পাঠায় সে-দেশের কত না ফটোগ্রাফ।

এদিকে পাসপোর্ট হাতে এল। ম্যারেজ সার্টিফিকেটসহ ভিসার দরখাস্ত জমা পড়ল। টিকিট হয়ে গেল প্রতীক্ষার দিন শেষ হতে চলল।

নীলাকে যেতে হবে একা। নিউইয়র্কে তার বর তাকে রিসিভ করবে। ভয়ের কিছু নেই।

মা-বাবা ভাই-বোনকে চোখের জলে ভাসিয়ে এবং নিজেও ভেসে নীলা একদিন সত্যিই রওনা হয়ে গেল। বারো হাজার মাইল উড়ে এক শীতের অপরাহ্ণে সে পৌঁছোলো তুষারাচ্ছন্ন নিউইয়র্কে। ভ্যাবাচ্যাকা, কাঁদো কাঁদো মুখ, ভয় সব নিয়ে।

কিন্তু রিসেপশন বে-তে তার বর অপেক্ষা করছিল। এক লহমায় কেটে গেল ভয়-ভীতি উদ্বেগ। এই তো সে এসে গেছে তার দয়িতের কাছে। আর ভয় কী?

বরের জন্য তার মা তৈরি করে দিয়েছে গোকুল পিঠে, নাড়ু, আমসত্ত্ব। কাস্টমসে ধরতে পারলে সব বাজেয়াপ্ত। কী ভাগ্যিস, দেখেনি।

তার বর যে গাড়িখানা নিয়ে তাকে নিতে এসেছে সেটা দেখে তাজ্জব হল নীলা। কী বড় আর কী সুন্দর গাড়ি! এখন এ গাড়ি তো তারও। এ লোকটাই এখন তার। এর যা কিছু সবই এখন তাদের দুজনের। এক অহংকারী আনন্দে তার বুক ভরে উঠল।

নীলাকে পাশে বসিয়ে তুষারবৃত পথে গাড়ি চালাতে চালাতে নীলার বর কত না সুন্দর সুন্দর কথা বলতে লাগল। একটু ইয়ার্কি, একটু তোয়াজ, একটু ঠিসি। আনন্দে ডগোমগো নীলা লজ্জায় লালও হল একটু।

নিউ জার্সিতে ঢুকে গাড়ি যখন হু-হু করে এগোচ্ছে তখন তার বর গলা খাঁকারি দিয়ে হঠাৎ অন্যরকম গলায় বলল, নীলা, একটা কথা।

বলো না।

একটা প্রবলেম হয়েছে।

কিসের প্রবলেম।

শুনে রাগ কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে অবশ্য। কিন্তু ফর দি টাইম বিয়িং তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

সামান্য উদ্বিগ্ন হল নীলা, বরের গলার স্বরটা তার ভাল ঠেকছে না। বড্ড গম্ভীর যেন।

বর বলল, কী জানো, দু বছর আগে আমি একটি মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেছিলুম।

বিয়ে! নীলার চোখ থেকে হঠাৎ দিনের আলো মুছে গেল। বুকের আনন্দের

সমুদ্রে থেমে গেল ঢেউ। হাত পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এল। গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ঠিক শুনছে তো।

বর বলল, ঘাবড়ে যেও না। এরা বেশি দিন বিয়ে টিকিয়ে রাখে না। আমাদেরও কিছুদিন পর ডিভোর্স হয়ে যাবে। তখন তুমি আর আমি।

নীলা এসব কথার আর মানে করতে পারছিল না। পাশ ফিরে সে তার বরের দিকে চেয়ে যেন মহাকাশের জীব দেখতে লাগল। নারায়ণ শিলা সাক্ষী করে মন্ত্রপাঠ করে যে বিয়ে তার হল সেটা কি নিছক প্রহসন মাত্র ?

বর বলল, মার্কিন মেয়েরা ভীষণ পজেজিভ হয়। তাই আমাকে আপাতত তোমার কাছে ঘেঁসতে দেবে না। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই। তুমি বেসমেন্টের ঘরে আলাদা থাকবে। ভেরি কমফোর্টেবল। আর সারাদিন বোরও হবে না তুমি। কারণ আমাদের একজোড়া যমজ বাচ্চা আছে।

নীলা বুদ্ধি রাখে। চেঁচিয়ে লাভ নেই সে জানে! দেশ থেকে বারো হাজার মাইল দূরবর্তী অচিন দেশ থেকে তার চিৎকার কোথায় পৌঁছোবে ?

যখন বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামল তখন বাকেট সিটে এলিয়ে নেতিয়ে আছে নীলা। নিতান্ত সিট-বেল্টে বাঁধা বলে গড়িয়ে পড়ে যায়নি নিচে।

তার বর তাকে প্রায় ধরে ধরে নামাল। সদর দরজা খুলে তাকে সস্নেহে তাড়াতাড়ি ভিতরে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির মেমসাহেব গিন্নি। বলল, হাউ সুইটি হাউ কিউট শি ইজ!

ঘণ্টাখানেক নীলা জড়বুদ্ধি হয়ে রইল। পোশাক ছাড়ল না, কিছুই করল না বেসমেন্টের ঘরে চুপচাপ বসে রইল। ওপরে কাঠের মেঝেতে চলাফেরার আওয়াজ পাচ্ছিল। কিন্তু মাটির তলাকার সমাধির মতো নিস্তব্ধ ঘরে নিজেকে তার নিজের মৃতদেহ বলেই বোধ হচ্ছিল।

অঙ্কটা কষতে এবং মেলাতে অনেক সময় লাগল তার। আসলে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পার্থক্য ঘোচানো তো বড় সহজ নয়। সহজ নয় বহুদিন ধরে গড়ে তোলা স্বপ্ন ও কল্পনার ইমারতকে এক লহমায় গুঁড়িয়ে দেওয়া।

তবে শেষ অবধি সত্যের উপলব্ধি ঘটেই! নীলা বুঝতে পারল, সে এ বাড়ির কর্ত্রী নয়, সে তার বরের আদুরে বউ নয়, বিবাহের একটি প্রহসন করে তাকে সুদূর আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছে নিতান্তই বেবি-সিটার করে।

মানুষের চরিত্র অদ্ভুত এবং বিচিত্র। নীলা যখন সত্যকে উপলব্ধি করল তখন অস্তিত্বের ঘোর সংকট সত্ত্বেও সে উঠল। তার বর লজ্জিত মুখে এসে তার হাত ধরে বলল, ঘাবড়াচ্ছো কেন, দুদিন শুধু ধৈর্য ধরো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

নীলা কথা বলতে জানে না গুছিয়ে। সে তত স্মার্ট নয়। তার ঠোঁট শুধু কাঁপল। ব্যস।

বর-অর্থাৎ লোকটা তাকে বাথরুম দেখিয়ে দিল। গরম জল ঠাণ্ডা জল বোঝালো, বড় বাইরে ছোট বাইরের নিয়ম শেখাল।

যন্ত্রের মতো ধীরে ধীরে কয়েকদিনে সবই শিখল নীলা। বেসমেন্টের ঘরে নিজেকে ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিল। ভাব করল বাচ্চা দুটির সঙ্গে। তাদের খাওয়ানোর কায়দা শিখল। শিখতে হল রান্নাও।

বাড়ির কাজের লোক ছাড়া সে তো আর কিছুই নয়।

ওয়েন শহরের শপিং সেন্টারে ম্যাসির দোকান ঘুরতে ঘুরতে আমি নীলার কাহিনী শুনছিলুম। নীলার জবানিতেই।

তারপর কী হল নীলা ?

নীলা উজ্জ্বল মুখে হাসল, আর একদিন বলব। শপিং করতে করতে এত কথা একসঙ্গে শোনা ঠিক হবে না। আপনি সিরিয়াসলি শুনছেনও না।

ভীষণ সিরিয়াসলি শুনছি।

না। আরও কোজি অ্যাটমসফিয়ারে বসে বলব। বলতে বলতে একটু কান্নাও তো আসবে। দোকানে কি কাঁদা যায়, বলুন !

আমি নীলার দিকে তাকালুম। পরনে জিনস, গায়ে কুর্তা। চুল টান করে বান-খোঁপায় বাঁধা। ডান হাতে একখানা বালা আর বাঁ কব্জিতে ঘড়ি ছাড়া কোনও আভরণ নেই। মুখে চোখে কেজো মেয়ের ছমছমে ভাব। এই নীলা কাঁদবে ?

মাসির দোকানের কথা আর কী বলব ? গোটা দুই চার নিউ মার্কেটকে জড়ো করলে এরকম একখানা ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু না, নিউ মার্কেটেও এত জিনিস নেই। একতলা দোতলা মিলিয়ে এই বিশাল বিপণটিতে খুঁজলে বাঘের দুধও পাওয়া যেতে পারে।

একটি ট্রলি নিয়ে ঢুকে যান। দোকানের বাইরেই সার সার ট্রলি সাজানো। পার্কিং লটে গাড়ি ভিড়িয়ে একটি ট্রলি ঠেলে দরজার কাছে নিলেই কাচের স্লাইডিং ডোর আপনা থেকেই খুলে যাবে। ভিতরে ঢুকে প্রথমে চলুন সব্জির কাউন্টারে। সব্জির পাহাড়, সব্জির বন্যা কাকে বলে তা দেখতে হলে এখানে আসতে হয়। প্রথমে কী নেবেন। আলু ? চার থেকে ছয় রকমের আলু সাজানো আছে। না পোকা পচা ধসা আলু বেছে বাদ দিতে হবে না। কারণ কানা পচা পোকা-লাগা কোনও জিনিস দোকানে আসে না। সুতরাং ওপরে গোছা করে রাখা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে একটা টেনে নিয়ে আলু ভরে ট্রলিতে রাখুন।

ঐ যে সবুজ ফুলকপি দেখছেন ও হল ব্রকোলি। বাঙালি পদ্ধতিতে রান্না করে খেতেও চমৎকার। আবার ব্যাগ নিন। ভরুন।

মেথি শাক চাই ? ওই তো রয়েছে। ধনে পাতা ? দেখুন, দেশের চেয়েও পুরুষ্টু এবং সতেজ ধনেপাতা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

এগোতে থাকুন, পুদিনাপাতা, পালং, লেটুস, বাঁধাকপি, ফুলকপি সবই যে আপনি কিনবেন এমন নয়। কিন্তু জিনিসগুলো দেখুন। ফুলকপিগুলো ঘন সবুজ পাতার ছাউনিতে কিরকম ফটফটে সাদা। একটিও পোকা পাবেন না। বাঁধাকপি দেখতে মনে হবে কেউ রং করে রেখে গেছে সদ্য।

সীড বা বীজ আমরাও খাই বটে। যেমন কাঁঠালবিচি বা শিমবিচি. আমেরিকায় সীড বা বীজ পাবেন অসংখ্য রকমের। সে সবও সাজানো রয়েছে।

আস্তে আস্তে এগোন। সবই আপনার নিতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু নেবেন না বেছেগুছে নিন। গাদা গুচ্ছের জিনিস হাঘরের মতো নিতে থাকলে পরে সেগুলো কাজে লাগবে না বাড়তি হবে।

মাস মাংসের সেকশনে চলে আসুন ট্রলি ঠেলে ঠেলে মস্ত মস্ত কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামে ওই যে অতিকায় কালচে প্রাণীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে দাঁড়া নেড়ে সেগুলো আপনার নিতান্তই চেনা জীব। কলকাতায় জ্যান্ত গলদা চিংড়ি বিক্রি হয় না বটে, কিন্তু এখানে তা পাবেন। সাইজ একটু বেশিই বড়।

চিংড়ি ছাড়া আরও যে সব মাছ আছে সেগুলো বাঙালি রসনায় অভ্যস্ত নয় বটে কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করে কিনলে বাঙালি রসনার পক্ষে গ্রহণীয় কার্প বা স্যাড, স্যালমন বা ইত্যাকার অনেক মাছই পেয়ে যাবেন।

নীলা মৃদু ধমক দিয়ে বলল, খান তো নিরামিষ, তবে হাঁ করে মাছ দেখছেন যে!

দেখছি। মার্কিন মাছের ব্যাপারটাও বুঝে যেতে চাই।

ড্রেস এবং ক্লিন করা মাছ কাচের বাক্সে বরফের শয্যায় শুয়ে আছে। এত বিচিত্র সমাবেশ একটা জায়গায় দেখলে হকচকিয়ে যেতেই হয়।

আর প্যাক করাটাও দেখার মতো। ওজন যন্ত্রে চাপিয়ে মাছ এমনভাবে প্ল্যাস্টিকে মুড়ে দেবে যে কোনও রস বা রক্ত হাতে বা কাপড়ে লেগে যাওয়ার ভয় নেই।

শূকর ও গোমাংসও রকমারি। আমি এ ব্যাপারে নিতান্তই আনাড়ি, তবে মার্কিন সংবাদপত্রে একটি ষাঁড়ের ছবি ছাপা হতে দেখেছি। তার শরীরের নানা অংশে নম্বর দেওয়া এবং ভাগ করা। কোন অংশের মাংসের কী নাম তা নম্বর ধরে লেখা আছে। বাছুরের মাংসকে ভিল বলা হয় শুনেছি। শূকর মাংসেরও এরকম রকমফের আছে। মার্কিন মুরগি ভুক্তভোগীদের মতে বিস্বাদ। তবে বাচ্চা মুরগির কদর আছে।

মাছ-মাংসের জায়গাটা আমাকে একটু তাড়া দিয়েই পার করে আনল নীলা

এরপর আমরা ফলের রসের রাজ্যে হারিয়ে গেলুম। বোতলবন্দী সেই সব

রস কিছু কিছু আমি পান করেছি। চমৎকার। আর ফলের রসের কাছাকাছিই দুধের রাজ্য। প্ল্যাস্টিকের ক্যান সাজানো আছে। আপনি যদি মেদ বর্জন করতে চান তাহলে ক্যানের গায়ে দেখে নিন কত পারসেন্ট ফ্যাট আছে। রোগা মোটা সব মানুষের জন্যই নানা রকমের দুধ আছে। ঠাণ্ডা দুধ। এখানে দুধ জ্বাল দিয়ে কেউ খায় না। ঠাণ্ডা খাওয়াই নিয়ম।

দুধের রাজ্যের পাশেই পাঁউরুটির জগৎ রয়েছে। লাল, কালো, সাদা, রোগাদের জন্য, মোটাদের জন্য, অন্তত ত্রিশ রকমের পাঁউরুটি সাজানো রয়েছে।

থেমে পড়বেন না। এগিয়ে যান। এখনও আপনি কিছুই দেখেননি। দেখতে দেখতে আপনরা চোখ ছানাবড়া হবে, তবে না।

বুশকিল জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে চলল ধ্রুব। বুশকিলকে বলা হয় নায়াগ্রা অফ দি পোকোনোজ। ধ্রুব রুটি এইট্টি ধরল। এই হাইওয়েটি পূর্ব-পশ্চিম হাইওয়ে। কম করেও এর দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাজার মাইল। নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেসে বা সান ফ্রানসিস্‌কো টানা চলে যেতে পারবেন। স্যাফার্ন থেকে বুশকিলের দূরত্ব কম নয়। আমাদের দেশে হতে হয়তো একদিনে বুশকিল দেখে ফিরে আসা সম্ভব হত না। কারণ আমাদের দেশে রাস্তার অভাব রয়েছে। কিন্তু এদেশের রাস্তা সর্বত্র বুকে পেতে আছে। উত্তর-পূর্ব পেনসিলভানিয়ার পোকোনো পর্বতশ্রেণীর মধ্যে বুশকিল জলপ্রপাতে যাওয়ার পথেই পড়বে ডেলাওয়্যার ওয়াটার গ্যাপ। প্রকৃতির এক আশ্চর্য খেয়ালে একদা সমভূমি এই অঞ্চলে ভূমিক্ষয় ও ভূমি-উত্থানের ফলে তৈরি হয়ে গেছে উচ্চাবচ ভূমি, জলাশয়, উপত্যকা। ডেলাওয়্যার নদীটি তারই ভেতর দিয়ে ইংরিজি এস অক্ষরের মতো বাঁক খেয়ে গেছে।

রাজপথটি ধরে এগোলে হঠাৎ চোখে পড়বে একটি পাহাড়, যা হঠাৎ যেন কুড়ুলের কোপে দু ভাগ হয়ে গেছে। এ হল নিউ জার্সির কিট্টাটিনি মাউনটেনের এক অংশ। রুট এইট্টি তাকে ভেদ করে ডেলাওয়্যার পেরিয়ে ঢুকে গেছে পেনসিলভানিয়ায়। ওই ফাটলের ভেতর দিয়ে খানিক দূর এগোলেই চোখে পড়বে ডেলাওয়্যার ওয়াটার গ্যাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বহু বিস্তৃত নানা নির্মাণ। পার্ক, হোটেল, পিকনিক এরিয়া ইত্যাদি। পর্যটক আকর্ষণের সামান্যতম সুযোগ থাকলে সেটাকে শতকরা একশ ভাগ কাজে লাগানোই বাণিজ্যমনস্ক মার্কিনদের ধাত। পর্যটকদের জন্য আরাম, বিলাস, অবসর বিনোদন, শরীরচর্চা, সাঁতার, অশ্বারোহণ থেকে নৌকাবিহার অবধি বিবিধ ক্রীড়া মিলিয়ে এমন এলাহি ব্যবস্থা গড়ে তোলে এরা যে, বড্ড বাড়াবাড়ি মনে হয়। স্বদেশে আমাকে কিছু পর্যটন

করতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা বলেই জানি, আমাদের দেশে পর্যটন ক্লেশদায়ক। গাড়ি আস্তে চলে, বিলম্বে চলে, খাবার সন্দেহজনক, সর্বত্র ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকে না। বেড়াতে গেলে যে কষ্ট করতে হয় সেটা আমরা মেনেই নিয়েছি কিন্তু ধনী আমেরিকানরা অসুরের মতো খাটিয়ে-পিটিয়ে হলেও আরাম বিলাস ব্যসনের ব্যাপারটায় ভারি খুঁতখুঁতে। ডলারের পরোয়া নেই, সুতরাং ফুর্তি চাই ষোলো আনা। এই মানসিকতা ও চাহিদার প্রতি নজর রেখেই পর্যটনস্থলগুলিকে রচনা করা হয়েছে।

পর্বত মধ্যবর্তী জলাশয়টির ধারেই বিশাল পার্কিং লট এবং বাগান-টাগান যেখানে গাড়ি ভিড়িয়ে নামা হল। কিট্টাটিনি রিজ নিউ জার্সিতে। পেনসিলভানিয়ার গায়ে। এই ছবির মতো সুন্দর উপত্যকার ভিতরে ওয়াটার গ্যাপকে কেন্দ্র করে দুশো মাইল রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই রাস্তা এঁকে-বেঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে নানা ঐতিহাসিক বাড়ি, অরণ্য, জলপ্রপাতকে। কিছু বুনো জানোয়ারও দেখা যাবে। জুলাই মাসে যখন রডডেনড্রন ফোটে তখন গোটা উপত্যকাই হয়ে ওঠে নন্দনকানন। পুবের নদীগুলির মধ্যে ডেলাওয়ারের খ্যাতি তার দূষণমুক্ত জল ও তীরবর্তী সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যাবলীর জন্য।

অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড়, জলে মৎস্যশিকারী ও ভ্রমণকারীদের অজস্র নৌকো দেখলুম। জঙ্গলের সুড়িপথে অশ্বারোহণ, সাইকেলবাজদের নিঃশব্দ সঞ্চার দেখে বেড়ালুম। প্রকৃতি যেটুকু করার করেছে। কিন্তু তাতে খুশি না থেকে মার্কিন কর্মবীরেরা যোগ করেছে বহু মাত্রা। আর এই যে নতুন মাত্রা যোগ হল তাও খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে শিল্পবোধ, সুরুচি এবং প্রকৃতিকে ধ্যানে রেখেই। গোটা জায়গাটাকে গড়ে তোলা হয়েছে যেন প্রকৃতিরই অনুকরণে। উনিশ শতকে ডেলাওয়্যারের জলবায়ুর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ যখন আসতে শুরু করেছিল তখন এখানে গড়ে উঠেছিল বিশাল বিশাল হোটেল। আজকাল আর কেউ এখানে এক দুদিনের বেশি থাকতে আসে না। ফলে সেইসব হোটেল লোপাট হয়েছে। মার্কিনরা বাড়ি ভেঙে ফেলায় ওস্তাদ। খুব বেশি দিন তারা কোনও কিছুই সহ্য করতে পারে না, বদলে ফেলতে ভালবাসে।

নদী পেরিয়ে পেনসিলভানিয়া। রুট এইট্টি ধরে স্ট্রুডসবার্গের কাছাকাছি আমরা ধরলুম রুট দুশো নয়।

কোন জায়গা আসছে তার সাইন রাস্তায় অনেক আগে থেকেই দেওয়া হতে থাকে। সুতরাং রুট দুশো হয় ধরে এগোনো শুরু হতেই বুশকিল জলপ্রপাতের আগমনবার্তা ঘোষিত হবে দেখা যেতে লাগল।

হনিমুনারদের জন্য বুশকিল চিহ্নিত জায়গা। কাছাকাছি তাই নববিবাহিতদের থাকবার ও মধুময় দিবস-রজনী যাপন করার ব্যবস্থা রয়েছে। বুশকিল

লপ্রপাতকে কেন্দ্র করে বেশ অনেকটা আগে থেকেই শুরু হয়েছে বসতিরও
্যবস্থা।

আমেরিকার কোনও দ্রষ্টব্য স্থানই আপনি দর্শনী ছাড়া দেখতে পাবেন না। ার দর্শনীটা খুব ফেলনাও নয়। গড়পড়তা পাঁচ ডলার করে ধরে রাখুন। প্রশ্ন ঠতে পারে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখব, তার জন্য টিকিট কাটব কেন মশাই ? এ ক থিয়েটার, না যাত্রা ? সঙ্গত প্রশ্ন। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন থোড়াই আপনাকে বাবদিহি করতে বসে আছে ! তা ছাড়া পকেটে ফালতু ডলার যাদের নেই তাদের ন্য তো এ দেশ নয়।

তবে জবাব একটা অবশ্য আছে। যে কোনও দ্রষ্টব্য স্থানকেই এরা বিস্তর েহনত এবং পয়সা খরচ করে দ্রষ্টব্যতর করে তোলে। আরও আছে রক্ষণা- ক্ষণের খরচ। একগাদা মাইনে করা লোক দিয়ে ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। খরচা ঠবে কোত্থেকে ? মার্কিন রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে পদে পদে টোল, ব্রিজ েরোতে টোল, টানেল পেরোতে টোল। এ হল টুলো দেশ। টোল দেওয়াটাকে রা তেমন গায়েও মাখে না।

ধীরে ধীরে পোকানো পর্বতমালার ভিতর এঁকে বেঁকে রাস্তা ওপরে উঠছে। র্বত বলতে যা বোঝায় তেমন বিশাল সু-উচ্চ ব্যাপার নয়। নাতিউচ্চ বললেই য়।

যাঁরা হুড্রু দেখেছেন বা হিমালয়ের ঝোরা, তাঁদের কাছে বুশকিল কোনও স্ময়কর ব্যাপার নয়। এই কিছুকাল আগে মধ্যপ্রদেশে একটা জলপ্রপাত দেখতে য়ে প্রায় হাজার ফুট নামতে হয়েছিল। এবং সেই হাজার ফুট নামা ও ওঠার রিশ্রম ভারি সার্থক হয়েছিল সেই পতনশীল জলধারা দেখে। বুশকিলকে াকোনোর নায়গ্রা বা ভিন্ন মতে পেনসিলভানিয়ার নায়গ্রা বলে অভিহিত করা য়ে থাকে। বুশকিল দেখার দিনকুড়ি বাদেই আমি খোদ নায়গ্রায় গেছি। কোথায় ায়গ্রা, আর কোথায় বুশকিল ! বুশকিলকে নায়গ্রার ছায়াও বলা যায় না। তবে াবলিসিটির খাতিরে কত মিথ্যা বাক্যই তো মানুষকে রচনা করতে হয়।

তা বলে বুশকিল কিছু হ্যাকছিও নয়। পার্কিং লটে গাড়িটি রেখে আগে ারদিকটা একটু ঘুরে দেখুন। চারদিকে পাহাড় ও অরণ্যের মাঝখানে কিছুটা মতল ভূমি। রেস্ট রুম, পিকনিক প্যাভিলিয়ন, গিফট শপ, স্ন্যাক বার সবই য়েছে। চারদিকে নিবিড় স্নিগ্ধ অরণ্য। ফলে আবহাওয়াটি আর্দ্র এবং উষ্ণ। প্রবল ামে শার্ট ভিজে গেল।

স্ন্যাক বারে ঢুকে প্রবল তৃষ্ণায় এক ক্যান সেভেন আপ পান করা গেল। ামনেই স্মারক দ্রব্যাদির দোকান। কোনও জিনিসেই আমাদের মতো লোকের াত দেওয়ার উপায় নেই। সাংঘাতিক দাম।

বুশকিল প্রবেশ পথের মুখেই একটা ট্যাক্সিডার্মি করা প্রমাণ সাইজের ভালুক সেই ভালুকের প্রসারিত হাতের মধ্যে আমাকে সাঁধ করিয়ে ছবি তোলা হল।

"ওই দেখুন শীর্ষেন্দুদা, নবদম্পতি।"

নবদম্পতি দেখে একটু দাঁড়িয়ে গেলুম। পুরুষটি হাফ প্যান্ট এবং রঙি স্যান্ডো গেঞ্জি পরা, মহিলাটির পরনে একটা উলোঝুলো গাউন বা ফ্রক। পুরুষ বিশাল থলথলে মোটা, সর্বাঙ্গে টস টস করে ঘাম ঝরে পড়ছে। মহিলাটি টি পেপার দিয়ে পুরুষটির ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে। ভঙ্গিটা একটু আদিখ্যেতার। ঘা মুছতে মুছতেই একটু ঠোঁটে ঠোঁট হয়ে গেল। মহিলাটির চেহারায় লাবণ্যহী একটা রুক্ষতা, পুরুষালি ভাব প্রবল। দুজনেরই বয়স চল্লিশের আশেপাশে নবদম্পতি বলে, এঁদের মনে হয় না। তবে এটা মার্কিন দেশ, সবই সম্ভব। হয়তো ওর তৃতীয় স্বামী, ও হয়তো এর চতুর্থ বউ, কিংবা কেউ কারও বর বউ নয়। এক সঙ্গে থাকে। জুটে গেছে।

পাঁচ ডলারের টিকিট কেটে অবরোধ পার হয়ে বুশকিল অ্যাপ্রোচে প্রবে করা গেল। অনেকটা ঢালু জমি ধরে নেমে সামনেই খাদ। কাঠের সিঁড়ি, কাঠে মজবুত রেলিং। খাড়া অংশে সিঁড়ি, ঢালু জায়গায় পায়ে চলার সরু পথ। বুশকি নামছে দুটি বা তিনটি ধারায়। চওড়ায় বিশ-ত্রিশ ফুটের বেশি নয়। খাড়া অনেকটা হলেও বুশকিল নামছে কয়েকটি ধাপে। সুতরাং তার চেহারায় তটিনী ভাবটাই বেশি, প্রপাতের ভয়ঙ্করতা একেবারেই নেই। গুরুগম্ভীর তর্জনগর্জন শোনা যাচ্ছে না।

চমৎকার সব ক্যাটওয়াক তৈরি করা আছে পতনশীল জলধারার ওপর দিয়ে নানা উচ্চতা থেকে এবং বহু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য খাঁড়ির ভিতরে ক না পথ আর সাঁকো! সামান্য একটি প্রপাত ঘিরে এত চমকপ্রদ ব্যবস্থা দেখে অবাক হতেই হয়।

ভেবে দেখলুম, আসলে এসবের পিছনে কাজ করছে ধুরন্ধর ব্যবসায়ি মস্তিষ্ক। বুশকিল যে আহামরি কোনও জলপ্রপাত নয় তা এরা জানে। কিন্তু ত এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়েই মাথা থাকলে প্রচুর ব্যবসা সম্ভব।

ভাবলুম আমাদের দেশে যত্রতত্র এরকম যত ঝোরা রয়েছে। তা নিয়ে ব্যবস করার কথা তো আমাদের মাথায় আসে না। টিকিট কেটে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার নিয়মও সেখানে নেই। তাহলে আমরা কি পিছিয়ে আছি?

বুশকিলের একটি ধারার নাম পেনেল কলম, অন্যটির ব্রাইডসমেইডস ফল্‌স। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত শীর্ণকায়া। জলধারা একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করেছে বিগ বুশকিল ক্রিক। এই ধারা গিয়ে মিশেছে ডেলাওয়্যার নদীতে।

লাভরস লুক-এ দাঁড়িয়ে ঘামতে ঘামতে বুশকিলের কেরদানি খানিকক্ষ

দেখলুম। ক্যামেরা ঝলসাচ্ছে। বুশকিলে আমার অজস্র ছবি তুলছে ধ্রুব।

আদিখ্যেতা বলি আর যাই বলি, প্রকৃতির প্রতি এদের ভালবাসার প্রকাশটিকে তো শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই। এরা অরণ্যেরও পরিচর্য্যা করে। ইচ্ছেমতো গাছ কাটে না, সাধ্যমতো রক্ষা করে বনভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ।

অনেকখানি উঠতে হবে। একটু ক্লান্তি লাগছিল। গরমে ঘাম হয়ে শরীরের জল বেরিয়ে গেছে। তেষ্টায় গলা কাঠ।

ওপরে উঠে খানিকক্ষণ জিরিয়ে প্রচুর জল খেয়ে রওনা হওয়া গেল।

কয়েকদিন হয়ে গেল আমেরিকায়। এখন আমার আর ফ্রন্ট সিটে বসলে সিট-বেল্ট বাঁধার কথা ভুল হয় না। রোড সাইন এত চেনা হয়ে গেছে যে, গাড়ির চালককে জায়গামতো লেন বদল করার কথা স্মরণ করিয়ে দিই।

বকুল আমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে বলল, বাঃ আপনি তো কয়েক দিনেই দিব্যি আমেরিকান হয়ে গেছেন দেখছি।

আসলে আমি এ দেশটা প্রথম দেখছি বলে সব কিছুই নজরে রাখছি। সাবধান বকুল, এখানে গাড়ি পার্ক কোরো না। এটা টো অ্যাওয়ে জোন।

বকুল সবিস্ময়ে বলল কি করে বুঝলেন ?

ঐ দেখ সাইন।

বকুল হাসল। দেখেছি মশাই। আপনি শুধু সাইনই লক্ষ করলেন, পাশে বসা বকুলকে নয় ?

ভারি লজ্জা পেলুম। ভুলেই গিয়েছিলুম বকুলের একটা পা যন্ত্রের। কতকাল আগেকার কথা। যখন আমেরিকায় সে প্রথম এসেছিল তখন স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে হাইওয়ের মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ে। আপ-ডাউন রোডের বেরিয়ার ভেঙে উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ি মুখোমুখি মেরেছিল তাদের গাড়িকে। বকুলের নতুন বিয়ের বর শুভ্রজ্যোতি কোনওদিনই সিট-বেল্ট বাঁধত না। উইন্ডস্ক্রিন ভেঙে তার শরীরটা উড়ে গিয়ে পড়েছিল বনেটের ওপর, ছিন্নভিন্ন। বকুল সিট বেল্টের জোরে বেঁচে গেল। তবে মাস খানেক হাসপাতালে যমে-মানুষে টানাটানির পর।

বকুল সেই দুর্ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করল। এ দেশে বলেই বেঁচে গিয়েছিল বকুল। যেসব জোড়াতাপ্পি দিতে হয়েছিল তার শরীরে তা ভারতবর্ষে সম্ভব ছিল না। এই দুর্ঘটনায় আরও একজন গেল। সে বকুলের গর্ভের অনাগত সন্তান।

তবু সব সর্বনাশের পরও ধ্বংসস্তূপ ঠেলে মানুষ উঠে দাঁড়ায়, বাঁচে।

আপনাকে কী একটা উপহার দেওয়া যায় বলুন তো।

আমি ম্লান মুখে বললুম উপহার। হায় বকুল, আমেরিকায় আমি এত গরিব যে, প্রত্যুপহার দেওয়ারও যে সাধ্য নেই।

আচ্ছা ছোটোলোক তো আপনি। উপহার কি লেনদেনের জিনিস। আমি দিলুম আর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও উল্টে দিলেন। ভারি ব্যবসাদারদের মতো কথা বলছেন। ছিঃ!

আমতা আমতা করে বললুম, আমার যে ভীষণ লজ্জা করছে। তুমি কত লড়াই করে বেঁচে আছো এখানে! কত বিরুদ্ধতার সঙ্গে অচেনা এক দেশে তোমাকে টিকে থাকতে হয়েছে। তোমাকে আমরা কী দিয়েছি বলো!

বকুল ঠোট টিপে হেসে বলল, আর কারও কথা জানি না, তবে আপনি আমাকে ঢের দিয়েছেন। কী দিয়েছেন তা আপনিও জানেন না।

অবাক হয়ে বলি, কী বলো তো!

আপনি আমার একটা চিঠির জবাব দিয়েছেন। অচেনা একটি মেয়ের কাছ থেকে চিঠি—তাও অনেক কটুকাটব্য ছিল তাতে—ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে না দিয়ে জবাব দিয়েছিলেন। মনে আছে?

যে উপলক্ষে আমেরিকায় আমার আগমন সেই বঙ্গ সম্মেলনের নির্ধারিত তারিখ এগিয়ে এল। প্রবাসী বাঙালিদের কাছে এই সম্মেলনের গুরুত্ব কতটা, এই অনুষ্ঠান কিরকম হয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। আমাকে লালমোহন হোড় অর্থাৎ লালুদা চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, একটি আধ ঘণ্টার বক্তৃতা দিতে হবে মাত্র। তিন দিনের অনুষ্ঠানে মাত্র আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হবে এবং মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যই আমাকে আমেরিকায় উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জেনে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত। কারণ বক্তৃতা দিতে আমি ভালবাসি না, শুনতেও না। মাত্র আধ ঘণ্টা চোখ কান বুজে বক্তৃতা দিতে পারলেই আমার মুক্তি ঘটবে, এটা ভেবে কোন অকর্মণ্যের না আহ্লাদ হবে?

কিন্তু এটা লক্ষ করছিলাম, বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিটি বাঙালিরই বেশ একটা আগ্রহ বা চাপা উত্তেজনা। যেন পুজো আসছে। যে-সব বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আমি থাকছি সব বাড়িতেই ঘন ঘন ফোন আসছে আর অনেকটা সময় নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা হচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গেও কথা বলতে চাইছেন অনেকে। অনেক অচেনা কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কুণ্ঠিত বাক্য বিনিময় করতে হচ্ছে। বুঝতে পারছি আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিরা বেশির ভাগই তৃষিতের মতো অপেক্ষা করছেন। কয়েকদিনের বঙ্গ সম্মেলনে তাঁরা আসলে স্বদেশেই ফিরে যাবেন এক মানস-ভ্রমণে।

তবু সব বাঙালিই নয়। ব্রুকলিনের যামিনী মুখার্জি আমেরিকার বাঙালিদের কাছে এক সুপরিচিত নাম। যামিনীদাকে আমি আগে থাকতেই চিনি। 'দেশ' পত্রিকার দফতরে গিয়ে তিনি অনেক আড্ডা দিয়ে এসেছেন আমাদের সঙ্গে

যামিনীদা আমার সঙ্গে সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারেননি। তার কারণ আমি কবে কার-বাড়িতে থাকছি তার তো ঠিক নেই। তবে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। কে যেন বলল, যামিনীদা ! উনি কক্ষনো বঙ্গ সম্মেলনে আসেবেন না। বাঙালিদের মচ্ছব ওঁর পছন্দ নয়।

পরে যামিনীদা নিজেও আমাকে বলেছেন, বাঙালিরা আমেরিকার মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে একদম মিশতে পারে না। ফলে চিরকাল অ্যালিয়েন হয়ে থাকে। আমেরিকায় বসবাস করব, অথচ বাঙালিয়ানা নিয়ে গলা শুকোবো এটা আমার পছন্দ নয়। এদেশ্রেরও শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ক'জন তার খোঁজ রাখছে বলো !

কথাটা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। তবে আমেরিকার অভিবাসী বহিরাগতদের মধ্যে দুই প্রবণতার মানুষই আছে। বাঙালি বলে নয়, সব বহিরাগতদের মধ্যেই এই দুই প্রবণতা লক্ষ করা যাবে। এক ধরনের মানুষ চান মার্কিন জীবনধারার সঙ্গে এক হয়ে যেতে। কিন্তু মানুষ চান নিজের ভাষা শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ সে বিচার করতে যাওয়া বৃথা। এ বিতর্কের শেষ নেই।

তবে বহিরাগতদের মধ্যে গুজরাতি বা শিখ, চীনা বা জাপানিরা সহজে নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেন না। বাঙালির জাতীয় ব্যক্তিত্ব ভীষণ দুর্বল। তাঁরা ভাবপ্রবণ, আবেগপ্রবণ এবং অনেকটা উদারচেতা বলেই বোধহয় তাঁরা তেমনভাবে খুঁটো ধরে রাখতে পারেন না।

আমেরিকার কথা দূরে থাক। দেখবেন কলকাতায় বসবাসকারী মাড়োয়ারি বা গুজরাতি পাঁচ সাত পুরুষ বাংলায় বসবাস করেও জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায়নি। অথচ এলাহাবাদ, ভূপাল বা ওরকম সব জায়গায় প্রবাসী বাঙালিরা তিন চার পুরুষ পরে আর মাতৃভাষায় কথাই বলতে পারে না।

একবার বেলগাঁওয়ের বিখ্যাত অ্যালুমিনিয়াম কারখানার এক পদস্থ বাঙালির বাড়িতে কয়েকদিন ছিলুম। তিনি একদিন তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়ে সহকর্মী কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এরা সব মহারাষ্ট্র বা মধ্যপ্রদেশ বা অন্ধ্রের বাঙালি। অতিশয় কষ্ট করে তাঁরা মাত্র কয়েকটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন।

অত কথার দরকার কী ? এই কলকাতাতেই কত বাঙালি আছেন যাঁরা বাংলার চেয়ে ইংরিজিতেই কথা বলতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

কিছু বাঙালি যদি ভোগে চলে গিয়ে থাকে তাহলেও আমার দুঃখ নেই। ধরে নেবো বাঙালির সংখ্যা কিছু কমল। সংখ্যা দিয়ে হবেই বা কী ? কোয়ালিটি বাঙালির সংখ্যা এত কমে গেছে যে কোয়ান্টিটি সে অভাব পূরণ করতে পারবে না।

সুতরাং উদ্যোক্তরা ধরেই নিয়েছেন আমেরিকার অভিবাসী বাঙালিদের টোটাল ইনভলমেন্ট বঙ্গ সম্মেলনে সম্ভব নয়। অনেকেই আলগোছে উদাসীন ও নির্বিকার থেকে যাবেন। আমেরিকায় স্বদেশকে খুঁচিয়ে তুলতে তাঁদের আগ্রহ নেই। আবার অনেকে সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করতে চাইবেন স্বদেশকে।

টেলিফোনের এরকম ব্যাপক ব্যবহার আমি আর দেখিনি। এখানকার মানুষদের এর ওপর এত বেশি নির্ভর করতে হয় যে, যন্ত্রটি বিশ্রাম পায় কমই। টেলিফোনেই বাঙালিরা আড্ডা মারে অম্লানবদনে। কর্ডলেস টেলিফোন থাকায় ঘরের যে-কোনো জায়গা বা বাগান থেকেও টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব। অবশ্য এসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আজকাল কলকাতাতেও পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমেরিকায় যেমন মাত্র একবারের চেষ্টাতেই যে-কোনও লাইন পাওয়া সম্ভব, হায়, আমাদের কলকাতায় তেমনটি কল্পনাও করা যায় না। আর টেলিফোন যন্ত্রটি পাওয়ার জন্য আমেরিকার কাঠখড় পোড়ানো বা দীর্ঘ প্রতিক্ষার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। চাওয়ামাত্র পাওয়া যায়। আর আমি কিছুকাল আগে কলকাতায় একটি টেলিফোনের দরখাস্ত জমা দিয়েছি। খোঁজখবর করে জেনেছি সাত আট বছরের আগে কোনও আশা নেই। ততদিনে ধরাধামে আমি যদি কোনও কারণে না থাকি তাহলে একটু দুঃখ থেকে যাবে। কী আর করা! এদেশটা তো মার্কিন মুলুক নয় যে, সেই নিয়মে চলবে।

বলা বাহুল্য, বঙ্গ সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই আমি নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি এবং পেনসিলভ্যানিয়ার অনেকটা অঞ্চল ঘুরে ফেলেছি। মাত্র এই কয়েকদিনের আমার পালে দিব্যি মার্কিন হাওয়া লেগে গেছে। নিজেকে আর নতুন, উজবুক বা আনকোরা লাগছে না। মনে হচ্ছে, মার্কিন দেশে আমি সচ্ছন্দ ও সাবলীল। রাস্তাঘাটের জটিল ঘাঁতঘোঁত বুঝে ফেলেছি। কোথায় কী করতে হবে এবং কী করা উচিত নয়। সে বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছি। বিস্ময়কর কিছু দেখে আর তেমন বিস্মিত হচ্ছি না। সবচেয়ে বড় ভয় ছিল মার্কিন উচ্চাণের এবং অ্যাকসেন্টের ইংরিজি বুঝে উঠতে পারব কি না। কিন্তু পথেঘাটে দোকানপাটে কথা বলতে এবং বুঝতে তেমন কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

হলিউডে আমার এক প্রিয় অভিনেতা আছেন। জেম্‌স্ স্টুয়ার্ট। দুঃখের বিষয় বিবিধ ছায়াছবিতে তাঁর উচ্চারণ বুঝতে আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এরকমতরো ইংরিজিই বলে বুঝি মার্কিন সাহেবরা? তবে তো হয়ে গেল। অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর আমার দশা কি তাই হবে আমেরিকায়? সে ভয় কেটে গেছে। আমেরিকায় যাঁরা আসেন বা যাঁরা বসবাস করেন তাঁরাও অনেকে ইংরিজি জানেন আমার চেয়েও খারাপ। আসলে হয়তো তাঁরা ভাষাটাকে

অন্তর থেকে গ্রহণই করতে পারেন না। শুনেছি লন্ডনে একদঙ্গল সিলেটি আছেন, তাঁরা কস্মিনকালেও ইংরিজির তোয়াক্কা করেন না। আমার এক কাঠ-বাঙাল আত্মীয় লন্ডনে থাকেন। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, বোঝলা, সিলেটিরা তো ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু ইংরাজি কইতে পারে না। শ্যাষে একদিন ঠিক কইরা ফালাইল না! এইভাবে আর কাম চলে না। একজন মেমসাহেবরে যদি চাকরি দিয়া রাখন যায় তা হইলে সেলস প্রোমোশনও হইব আবার আমরাও মেমসাহেবের কাছ থিক্যা ইংরাজিটা শিখ্যা ফ্যালামু। তো বোঝলা, এক মেমসাহেবরে তো চা'করি দিয়া রাখল, ছয় মাস পরে গিয়া কী দেখলাম শোনবা? গিয়া দেখি সেই মেঁমসাহেব চুটাইয়া সিলেটি কইত্যাছে, আর সিলেটিরা যেমন আছিল তেমনই রইয়া গেছে।

এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রতিরোধ। মানুষের মধ্যে অনেক সময়ে নানা কারণেই বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই তো কয়েকদিন আগে পূর্ব্ববঙ্গের এক অভিবাসী বাঙালিকে ইংলন্ডের এক বিচারক খুব ভর্ৎসনা করেছিলেন, পঁচিশ বছর ইংল্যান্ডে থেকেও তিনি ইংরিজি জানেন না বলে। খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল খবরটি।

অল্পবিস্তর এই প্রতিরোধের ব্যাপারটি আমেরিকার বাঙালিদেরও অনেকের মধ্যে লক্ষ করেছি। তাঁরা ইংরিজিতে কথা বলতেই ভালবাসেন না।

অবশ্য আমেরিকার মতো কুম্ভীপাকে তাতেও অসুবিধে হয় না। নানা জাতি নানা মত নানা পরিধানের লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানে। সকলে সকলের ভাষা বুঝবে এমন কথা নেই। সুতরাং আকারে-ইংগিতে ভাঙা ভাঙা শব্দে কাজ সবাই চালিয়ে নেয়। চৈনিক, তিব্বতি, ভিয়েতনামি সকলেরই কাজ চলে যায়। ভয়েস অফ আমেরিকার দীপংকর চক্রবর্তী যখন প্রথম জার্মানিতে গিয়েছিল তখন সস্ত্রীক এক দোকানে ঢুকে সে একটি পাজি সেলস উওম্যানের পাল্লায় পড়ে। ভদ্রমহিলা কালো এবং নবাগত দেখে দীপংকরকে একটু অগ্রাহ্য করেছিলেন। ভাষাও এক মস্ত বাধা। ভদ্রমহিলার ভাষা জার্মান, দীপংকরের দৌড় ইংরিজি অবধি। ঘটনা এমনই গড়াল যে, দীপংকর ভীষণ রেগে গেল। আর রেগে গেলে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের জন্য মাতৃভাষার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা আর কিছুই হয় না। সুতরাং দীপংকর একেবারে নিকষ্যি ভেজালহীন বাংলায় তুড়ে গালাগাল দিতে লাগল। আর এক বর্ণও দোকানের কর্মচারীরা বুঝল না বটে, কিন্তু কাজ হল। দোকানের মালিক বা ম্যানেজার ছুটে এলেন, সেলস উওম্যানটিকে সরিয়ে নেওয়া হল এবং অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় সমাধা হল। এই ঘটনাই সাক্ষ্য দেয় যে ভাষা কোনও বাধা নয়, ভাব প্রকাশ ভাবভঙ্গিতেও হয় এবং বার্তা ঠিকই পৌঁছোয়।

বঙ্গ সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল নিউ জার্সির সমারভিলে। র‍্যারিটান ভ্যালি কলেজে। শুক্রবার বিকেলে শুরু, রবিবার রাতে শেষ। উইক এন্ড ছাড়া আমেরিকায় কোনও অনুষ্ঠান করা মুশকিল। এখানে দুর্গাপুজাও হয় উইক এন্ড ধরে। তাতে সপ্তমী থেকে দশমী অবধি ঠিক ঠিক নাও পড়তে পারে। যদি সোম থেকে বৃহস্পতিবার অবধি পুজো হয় তবে আমেরিকার বাঙালিদের পুজোটা করতে হবে শুক্রবার বিকেল থেকে রবিবার অবধি। নান্য পন্থা। তবে কথায় আছে প্রবাসে নিয়মো নাস্তি। চাকরি বাঁচিয়ে তবে না পুজো। দিনক্ষণ না মানলে কী হল, ভক্তি-ভালবাসার তো অভাব হয় না ?

সুতরাং উইক এন্ড। উইক এন্ড ছাড়া কিছুই সম্ভব নয় আমেরিকায়। সাপ্তাহিক দিনে হাড়ভাঙা খাটুনির পর সাহেব বা স্বাস্থ্যবান অন্যান্যরা নানা আমোদফুর্তি করে থাকে। গড়পড়তা বাঙালির আর জোস থাকে না, তারা নেতিয়ে পড়ে বিকেলে ভোরের ফুলের মতো।

শুক্রবার দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা যাত্রার প্রস্তুতি নিলাম। ভবানী-আলোলিকার সঙ্গে। আলোলিকা এক টিন বিস্কুট, দু প্যাকেট কিসমিস, এক ছড়া কলা এবং আরও সব শুকনো খাবার আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন, ওখানে আপনার বরাতে প্রথম দিন যে কী জুটবে কে জানে। এগুলো রেখে দিন, কিছু না জুটলে এসব খেয়েই কাটাতে হবে।

আলোর দূরদর্শিতার তুলনা নেই। কারণ প্রথম দিনটায় সব হিসেব উল্টে দিয়ে বঙ্গ সম্মেলনে এত লোক এসেছিল যে খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল অর্ধেক লোকের উদরপূর্তিতেই। বাকিদের হরিমটর। তার মধ্যে আমিও পড়েছিলুম, তার কারণ নিরামিষাশী বলে। যাও বা জুটত তাও জুটল না। তাঁদের আমন্ত্রিত অতিথি অভুক্ত রয়েছেন দেখে কর্মকর্তারা হায় হায় করলেন। আমি অবশ্য পেটে খিদে এবং মুখে হাসি নিয়ে দিব্যি সন্ধেটা কাটিয়ে দিতে পেরেছিলুম।

যাই হোক, সমারভিলে যাওয়ার মনোরম পথটি আমাকে প্রায় জাগরণেই মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। সম্পূর্ণ সম্মোহিত।

আগেই বলেছি আমেরিকার কোথাও যেতে হলে সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশিকা এবং সম্ভব হলে ম্যাপ থাকা একান্ত দরকার।

পথনির্দেশিকা এবং মানচিত্র না থাকলে এই জটিল রাস্তার দেশে বেভুল ঘুরে মরতে হবে। শুধু ঠিকানায় কোথাও পৌঁছানো অতীব কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ঠিকানার চেয়ে ফোন নম্বর দেওয়াই ওখানকার রেওয়াজ। কারও বাড়ি যেতে হলে আগে তাকে ফোন করে পথের হদিস নিতে হয়। প্রত্যক্ষ না দেখলে এই জটিলতার স্বরূপ বোঝা যাবে না।

বঙ্গ সম্মেলনের কর্মকর্তারাও তাই সমাভিলের হদিস, পথনির্দেশিকা এবং

মানচিত্র বিলি করেছেন সবাইকে। হোটেল ম্যারিয়ট এবং অন্যান্য হোটেল ও রুমিং হাউসে বিশেষ কনসেশনে ডেলিগেটদের থার্কবার ব্যবস্থা হয়েছে। শহর থেকে কলেজ বেশ খানিকটা দূরে। মাইল কুড়ি হবে। আমেরিকায় এ দূরত্ব নস্যি।

ভবানী গাড়ি চালাচ্ছে। প্রকাণ্ড ভারি গাড়ি। গাড়িটি ভারি বলেই খুবই আরামদায়ক। এই গাড়িটি আমার চোখে আদ্যন্ত আধুনিক হলেও আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ডে পুরনো মডেল। লজ্জায় এই গাড়িটি এরা ফেলে রাখে। বেশি বের টের করে না। সামনে ভবানীর পাশে বাকেট সিটে আমি, পেছনে আলোলিকা আর তার মেয়ে। ঝঞ্ঝাটহীন রাস্তা বলে এবং এয়ার কন্ডিশনিং-এর জন্য কাচ বন্ধ থাকায় গাড়ির অভ্যন্তর শব্দহীন বলে আড্ডা মারার খুব সুবিধে। মাঝে মাঝে প্রকৃতির সম্মোহন থেকে মুখ ফিরিয়ে কথাবার্তা হাসি মস্করায় যোগ দিচ্ছি। কিন্তু আমার তৃষিত অভ্যন্তর সারাক্ষণ আমেরিকার সব কিছুকে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করছে।

ঘণ্টা তিনেকেরও বেশি পথ অতিক্রম করে আমরা সমারভিলে পৌঁছোলাম। ম্যারিয়ট হোটেলের বিশাল চত্বরে যখন গাড়ি ঢুকল তখন দেখি প্রায় একই সঙ্গে সামান্য আগে-পরে বঙ্গ সম্মেলনের অতিথিরা এসে পৌঁছেছেন। রিসেপশনে প্রবল বাঙালি-ভিড়।

অনেকগুলি উইং নিয়ে ম্যারিয়ট এক বিশাল হোটেল। এটি চেইন হোটেল, অন্যান্য জায়গাতেও ম্যারিয়ট হোটেল দেখেছি। এটি অবশ্য পাঁচতারা হোটেল নয়, কিন্তু বসবাস করার সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই রয়েছে। আর কী ঝকঝকে। মহার্ঘ সব জিনিসপত্রে সাজানো।

রিসেপশনেই অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রঞ্জিত দত্ত, সুপ্রিয়, লালুদা, স্বদেশবাবু, প্রশান্তবাবু। এতদিন এঁদের কারও কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে মাত্র।

এত অতিথি এক সঙ্গে হাজির হওয়ায় রিসেপশনের অতি সুদর্শনা কর্মচারীটি ভারি ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মুখে এতটুকু বিরক্তি নেই। অতি আন্তরিক ও খাঁটি একটু হাসি মুখে লেগে আছে। বচন বিনম্র, ধৈর্য অপরিসীম।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ঘরের চাবি পাওয়া গেল। কিন্তু এমনই বিশাল ও জটিল এই হোটেলের নিজস্ব স্থাপত্য যে ঘর খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। করিডোরে করিডোরে অবশ্য নির্দেশিকা দেওয়া আছে। তবু উইং গুলিয়ে ফেলি।

তিনতলায় আমার ঘর। চিন্তামণি কর এবং আমার থাকার ব্যবস্থা এক ঘরে হয়েছে।

প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণিদা প্যারিস ও লন্ডনে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। এখনও প্রায়ই তাঁকে লন্ডনে যেতে হয়। কিন্তু আমেরিকায় এলেন এই প্রথম, একটু বেশি

বয়সেই। কথায় বার্তায় বুঝলুম, আমেরিকা তাঁর বিশেষ পছন্দের দেশ নয়। আসলে ইতিহাস ও ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ ইওরোপের তুলনায় আমেরিকা তো বড্ড লাগামছাড়া।

ম্যারিয়টের মতো হোটেলে স্নানঘরে সাবান নেই দেখে আমি অবাক। এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

ফোন করতেই রুম সার্ভিস ভারি মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, মে আই হেল্প ?

সাবান নেই যে !

ও পাশের মিষ্টি গলাটি সবিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল, সাবান নেই ? টয়লেটে সাবান নেই ! কী আশ্চর্য ব্যাপার ! স্যার, ক্ষমা করুন। এক্ষুনি, এক্ষুনি সাবান পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

হোটেলের করিডোরে নীলার সঙ্গে দেখা। পরনে সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি, মস্ত পাড়। গাঢ় বাসন্তী রঙের পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। কপালে পূর্ণিমার চাঁদের মত মস্ত টিপ। একটু গয়নাও আছে গায়ে। সবচেয়ে বড় গয়না অবশ্য তার হাসি।

সেই বিখ্যাত হাসিটা হেসেই বলল, কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাবেন ?

তটস্থ হয়ে বললুম, এখন হারালে যে কর্মকর্তারা আমাকে খুঁজতে পুলিশ লাগাবেন।

বড্ড গেরস্ত মানুষ আপনি। আচ্ছা যদি আমার গাড়িতেই র‍্যারিটান ভ্যালি কলেজে নিয়ে যাই আপনাকে আপত্তি করবেন ?

যেতে পারি। তবে সুপ্রিয়কে একটা খবর দিতে হবে। ওর গাড়িতে যাবো বলে রেখেছি।

আপনাকে নিয়ে আর পাবি না। ঠিক আছে, কাল কিন্তু সময় চুরি করতে হবে। সারাদিন বঙ্গ সম্মেলনের ঠাসা প্রোগ্রাম। ওর মধ্যেই এক ফাঁকে আমি ঠিক বের করে আনব আপনাকে। কথা হয়ে রইল কিন্তু।

নীল এখন গাড়ি চালায়। গেঁয়ো অবুঝ বোকা মেয়েটা এখন আমেরিকার মেইন স্ট্রিমের তীব্র স্রোতে পাল্লা টানছে অবলীলায়। নীলার কথা ভাবতে ভাবতেই নেমে এলুম নিচে।

রঞ্জিত দত্তর সঙ্গে পার্কিং লটে দেখা। দীর্ঘদিন আমেরিকায় আছেন। এখান থেকেই 'বাংলা বিচিত্রা' নামে একটি কাগজ বের করেন। কথায় সুস্পষ্ট বাঙাল টান। রঞ্জিতবাবু এবং তাঁর স্ত্রী নিকষ্যি বাঙালি হলেও তাঁদের বারো তেরো বছরের মেয়েটি একটুও বাংলা জানে না। মেয়ে তার মাকে মার্কিন ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল, মা, তুমি তো বললে ইনি একজন রাইটার ? হাউ ফেমাস ইজ হি ? ইউ মিন পিপল রিকগনাইজ হিম হোয়েন দে সি হিম অন দি স্ট্রিট ?

আমি হেসে বললুম, না আমি ততটা বিখ্যাত নই। আমার দেশের অনেক লোক এখনও পড়তেই জানে না। আর তাদের সংখ্যাই বেশি। তুমি দেশে যাও না ?

মেয়েটি তার স্বভাবসিদ্ধ মার্কিন ইংরিজিতে বলল, মাঝে মাঝে যাই।

ভাল লাগে ?

সো সো।

তার ভাষা ইংরিজি হলেও তার হাসিটি বাঙালি। আর ভারি লাজুকও সে। এ হল আমেরিকার দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি, যাদের নিয়ে মা-বাবাদের মাথাব্যথার অন্ত নেই।

রঞ্জিতদা বললেন, আপনি আমার গাড়িতেই চলুন না।

পার্কিং লট-এ যত গাড়ি সবই বাঙালিদের। রঞ্জিতবাবুর সঙ্গে গেলুম না, তার কারণ অনুষ্ঠানের এখনও ঢের দেরি। চারদিকটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিই, তার পর যাওয়া যাবে।

একে একে ধুতি-পাঞ্জাবি এবং শাড়ি পরা বাঙালি বাবু ও বিবিরা বেরিয়ে আসতে লাগলেন। একে একে গাড়ি ছেড়ে যেতে লাগল। প্রত্যেকেই আমাকে পৌঁছে দিতে চাইলেন। আমি 'একটু পরে' বলে সময় হাতে রাখলুম।

হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আকাশ মাটি গাছপালা দেখতে লাগলুম। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে আসছে। স্বদেশের জন্য কেমন যেন মন খারাপ লাগছিল। বারো হাজার মাইল দূরে প্রবাসী বাঙালিদের মন তাহলে কেমন উথাল-পাথাল হয় ?

ধনী দেশ বটে, কিন্তু ডলার আয় করা বড়ো সহজসাধ্য ব্যাপার তো নয়। এ দেশে কাজেরই আদর, কাজে গলতি হলেই এক লহমায় আদর ভালবাসা শেষ হয়ে যায়। চাকরিতে কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে সবসময়ে চাপা টেনশন থাকে। ভাবাবেগ বর্জিত, চাঁছাছোলা কাজের দেশে ভাবপ্রবণ আবেগপ্রবণ অলস বঙ্গসন্তানও শেষ অবধি মানিয়ে নেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটা খুব সুখকর সকলের ক্ষেত্রে হয় না। এখানে অসুখী বাঙালিও আমি অনেক দেখেছি।

সুপ্রিয় ডাকছিল, দাদা ! আর দেরি নয়, চলুন।

চলো।

সুপ্রিয় ভারি সরল সোজা ছেলে। ভারি সাহিত্যপ্রাণ। তার মধ্যে সাহেবিয়ানার ব্যাপারটা একেবারেই নেই। তার বউ ভারতীও ভারি আটপৌরে এবং সহজে মেয়ে। নিউইয়র্কের কুইন্স অঞ্চলে সুপ্রিয় একখানা বাড়ি কিনেছে। পরে সেই বাড়িতে গিয়ে দেখেছি উঠোনের লাউমাচায় রাশি রাশি লাউ ফলে আছে, চমৎকার বেগুন আর মস্তমস্ত লঙ্কা।

অনেকটা ঢেউ খেলানো জমির ওপর বিশাল চত্বর নিয়ে র‍্যারিটান ভ্যালি কলেজ। কলেজ এমন জায়গায় যেখানে গাড়ি ছাড়া পৌঁছোনো অসম্ভব কাছেপিঠে লোকবসতিই নেই। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেস্ব গাড়িতেই যাতায়াত করতে হয়। ফলে কলেজের সামনেই বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে পার্কিং লট। সেই জায়গাও আজ গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। সুপ্রিয় পার্ক করার জায়গাই পাচ্ছিল না। কয়েকবার চক্কর দিয়ে তবে খুঁজেপেতে একটি জায়গা পাওয়া গেল। গাড়ি পার্ক করার সমস্যা গোটা আমেরিকাতেই বেশি কঠিন। কিন্তু গাড়ি ছাড়া চলবেও না।

সন্ধে হতে এখানে অনেক সময় লাগে। আমরা যখন অনুষ্ঠানে পৌঁছোলাম তখনও দিনের আলো ঝকঝক করছে। কলেজের প্রাঙ্গণে, লবিতে, করিডোরে উচ্চকিত উল্লাস শোনা যাচ্ছে। পরস্পরের সঙ্গে অনেকদিন বাদে দেখাসাক্ষাৎ তো! ভারি ভাল লাগল এই পুনর্মিলনের আবহাওয়াটি, হাসি, আনন্দ, হৈ হট্টগোল একেবারে বাঙালির বিয়েবাড়ি।

এত পরিচিতদের পারস্পরিক মিলনমেলায় আমরা—অর্থাৎ বহিরাগত দু-তিনজন কিন্তু বেমানান। তবে প্রাথমিক জড়তা এবং অপরিচয়ের দূরত্ব সামান্যক্ষণ মাত্র স্থায়ী হল। একে একে অনেকেই এসে পরিচয় করতে শুরু করলেন নিজে থেকেই। হহর্ষ বিস্ময়ে পেলুম কয়েকজন পূর্বপরিচিতকেও।

অনুষ্ঠান শুরু হল আরও ঘণ্টাখানেক বাদে। ততক্ষণে বেশ কয়েকজন পাকড়াও করলেন আমাকে। অধ্যাপক কল্যাণ রায়, তনুশ্রী আর প্রভাত দত্ত আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া বাহুল্য হবে। বঙ্গ সম্মেলন সম্পর্কে পৃথক প্রতিবেদন অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। যেটা বলা হয়নি তা হল এই সম্মেলনের নেপথ্যে যেসব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। যে আকুলতা আর আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ করলেন সেটা আমাকে ভারি গভীরে স্পর্শ করেছে।

বেশির ভাগ মানুষেরই সমস্যা তাঁদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। আর ছেলেমেয়েদেরও সমস্যা তাদের অতি-বাঙালি মা-বাবা নিয়ে। মার্কিন জীবনধারা চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে ছেলেমেয়েদের। মা-বাবা প্রাণপণে উজানে নৌকো বাওয়ার চেষ্টা করছেন। সমস্যা গভীর। সমস্যা চিন্তা-উদ্রেককারী। অনেকেই আমার কাছে সমাধান জানতে চাইছিলেন।

কিন্তু আমি কী বলব? আমেরিকায় আমার অভিজ্ঞতা ক'দিনের? এই সমস্যা নিয়ে আমার তো এখানে আসার আগে অবধি কোনও মাথাব্যথাই ছিল না।

বাইরের লনে মনোরম বিকেলে চুটিয়ে আড্ডা হচ্ছিল তনুশ্রী আর কল্যাণের সঙ্গে। তনুশ্রীর সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের। আর কল্যাণের সঙ্গে পূর্বপরিচয় না থাকলেও চলে, প্রথম পরিচয়ের পরই তাকে অনেক দিনের চেনা বলে মনে হতে থাকে।

কল্যাণ কথায় কথায় বলল, শীর্ষেন্দুদা, ফিরে গিয়ে আমেরিকা ভ্রমণের কথা লিখছেন নাকি ?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, না। কোথাও গেলেই তা নিয়ে এক ভ্রমণকাহিনী ফেঁদে বসার পক্ষপাতী আমি নই।

না লেখাই ভাল। প্লিজ ! কিন্তু যদি লিখতেই হয় তবে ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে লিখবেন। এখানে বেড়িয়ে গিয়ে অনেকেই হাস্যকর রকমের ভুলভাল সব কথা লেখে। পড়ে আমরা হাসি।

আমি লিখব না, নিশ্চিন্ত থাকো।

কল্যাণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্য রাখতে পারিনি। সম্পাদকের নির্বন্ধে সেই বিবরণ লিখতেই হচ্ছে। আর কল্যাণ যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল তাও অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তথ্যঘটিত গণ্ডগোল বেশ কয়েকবার পাকিয়ে ফেলেছি। গৌতম ও নীলাঞ্জনা গুপ্ত ফ্লোরিডা থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, মার্কিন ভিখিরিদের নিয়ে আমি যে কথা লিখেছি তা সত্য নয়। সেখানকার মানুষ বিস্তর দুরবস্থার মধ্যেও রয়েছে। ভিখিরি ভিক্ষে করে দিনে ৫০ ডলার আয় করে, এটা অসম্ভব ব্যাপার ইত্যাদি।

তবে এগুলো তেমন গুরুতর ব্যাপার নয়। মার্কিন দেশে কিছু লোক সুখে আছে, কিছু দুঃখে এ তো আমাদের দেশের শিশুও জানে। এর জন্য হোম ওয়ার্কেরও দরকার হয় না। তবে, মনে রাখতে হবে এই প্রতিবেদন লেখা হচ্ছে আমাদের দেশের জীবনযাত্রার মান ও ধারার প্রতিতুলনা হিসেবে। মার্কিন গরিব আর ভারতীয় গরিবের মধ্যে যে তফাত আছে তা কারই বা অজানা আজকাল ? আমেরিকায় 'গেট্টো' বা গরিবদের জীবন-যাপন কেমন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্য হলেও আমার আছে। তাই বলি, আমাদের দেশের মতো নাঙ্গা সর্বহারা ভিখিরি আমেরিকায় কেউ নেই।

নানাজনের সঙ্গে বঙ্গ সম্মেলনেও আমেরিকা নিয়েই কথা বলছি।

এর মধ্যেই ভারি যুবক চেহারার সুশীল দাশগুপ্ত এসে ধরলেন, মশাই, আপনাকেই খুঁজছি। পরশুদিন আমার সঙ্গে আপনাকে ফিলাডেলফিয়া যেতেই হচ্ছে।

সুশীলদার কথা আগেও লিখেছি। এমন ফুর্তিবাজ, আমুদে, মিশুকে, রসিক মানুষ পেলে যে কোনও জায়গাই সহনীয় হয়ে ওঠে। পাল্লা দিয়ে পূর্ণিমা বউদিও স্বামীর

প্রতিচ্ছবি যেন। আর ওই আমুদে স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ওদের প্রাণশক্তিও। টেম্পল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক সুশীলদা একসময়ে যাদবপুরেও পড়তেন। তাঁর ছাত্ররা এখন আমেরিকার নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে।

আমি বললুম, দু-তিন দিনের জন্য যেতে পারি।

জানি মশাই যে, আপনার সময় কম। ঠিক আছে দু-চার দিনের মধ্যেই যতটা পারি দেখিয়ে দেবো। আটলান্টিক সিটিতে যাননি তো।

না। যাওয়ার কথা আছে।

ওটা দেখানোর ভার আমি নিচ্ছি।

তনুশ্রী এসে বলল, কলম্বাসে কিন্তু যেতেই হবে। না গেলে ছাড়ব না। ভীষণ দুঃখ পাবো।

ঠিক আছে যাবো। তবে—

তবে টবে নয়। আমি কথা দিচ্ছি নায়াগ্রা দেখিয়ে দেবো।

তাহলে আর কথা কী ?

রাত্রি বারোটা একটা অবধি অনুষ্ঠান এবং আড্ডা চলতে লাগল। কারোরই হোটেলে ফেরার বিশেষ তাড়া নেই। খাবারের অনটনের কথা আগেই বলেছি। তবে শেষ অবধি আমার ভাগ্যে সিঙ্গাড়া জাতীয় কী যেন এবং চকোলেটের তৈরি কিছু মিষ্টি জুটেছিল। গোগ্রাসে তাই গিলে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করলুম। তবে খাদ্যের অভাব অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে গেল। এত মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য এবং আন্তরিকতা তো প্রাপ্তি হিসেবে কম নয়।

নীলার টিকির নাগালও পাওয়া যাচ্ছিল না। বঙ্গ সম্মেলনে সে ভীষণ ব্যস্ত। চুল ঝুঁটি করে বেঁধে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে সে বিস্তর ছোটাছুটি করছে। অবশ্য এক ফাঁকে এসে কানে কানে বলে গেল, কাল কিন্তু হারিয়ে যেতে হবে।

কতক্ষণের জন্য ?

হারিয়ে যাওয়া মানে কি অফিস করা নাকি ? টাইম বেঁধে তো হবে না।

আমার বক্তৃতা আছে না !

সেটা বাঁচিয়েই হারিয়ে যেতে হবে। মনে থাকবে ?

মাথা নেড়ে বললুম, ঠিক আছে।

রাত দেড়টা নাগাদ বেশ ক্লান্তবোধ করছিলুম। কে যেন দয়া করে বলল, চলুন তো আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিই। ভারি কষ্ট হচ্ছে, আপনার।

আপনারাও তো রাত জেগে আছেন।

আমাদের কথা বাদ দিন। আমরা তো আর সদ্য বারো হাজার মাইল উড়ে আসিনি। তাছাড়া এখানে আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। আপনার তো তা নয়। চলুন।

হাই তুলতে তুলতে গাড়িতে গিয়ে বসলুম।

চিন্তামণি কর দরজা খুলে দিলেন, এসে গেছেন ?

আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?

আরে না।

কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে ঘুমিয়ে পড়লুম। এক টানে ভোর।

সকাল হতে না হতে পর পর কয়েকটা টেলিফোন এল। সকলেরই বক্তব্য এক। আমি যেন হোটেল থেকেই ভারি জলখাবার খেয়ে যাই। আমার খাওয়া নিয়ে সবাই চিন্তিত, উদ্বিগ্নও। এ লোকটা যে না খেয়ে বেঘোরে মারা পড়বে।

ঘরে যে টিভি রয়েছে তাতে ন্যাশনাল চ্যানল এবং কেব্‌ল টিভি দুরকমই দেখা যায়। মজা হল যৌনতামূলক ছবি দেখার চ্যানেলও রয়েছে আলাদা। বোতাম টিপলেই তা দেখা যায়, তবে তার জন্য আলাদা পয়সা দিতে হয়। আমেরিকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা একটু বাড়াবাড়ি রকমেরই বেশি বলে ব্লু ফিলম প্রকাশ্যেই প্রদর্শিত হচ্ছে। নিউইয়র্কে একবার আমার সঙ্গী আমাকে পেভমেন্টে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে সামান্য কোনও কাজে গিয়েছিল অল্পক্ষণের জন্য। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম সেখানে নাকের ডগায় একটি ব্লু ফিলমের প্রেক্ষাগৃহ। বাইরে রগরগে পোস্টার। বুকিং কাউন্টারে অবশ্য কোনও ভিড় নেই। একটি লোককেও হল-ঘরে ঢুকতে বা বোরোতে দেখলুম না। এক মেমসাহেব কাউন্টারে বসে বসে হাই তুলছিল।

হোটেলের ঘরে আবার বিভিন্ন চ্যানেলে ব্লু ফিলমের কাটিং দেখাচ্ছিল। উদ্দেশ্য, মানুষকে ব্লু ফিলম দেখতে প্ররোচিত করা। ব্যাপারটা এত ন্যক্কারজনক যে, ভারি ঘেন্না হয়েছিল দেশটার ওপর। এই স্বাধীনতা যে খুব সুখকর এবং শুভ হয় না, তা বুঝতে গভীর চিন্তারও প্রয়োজন নেই। শিশুরাও যে এর দ্বারা প্রভাবিত ও প্ররোচিত হচ্ছে তা বোঝবার মতো মগজ কি এই অতিমস্তিষ্কে দেশে নেই ? কিন্তু শরীরী ব্যাপারটিকে এরা ভারি জলভাত মনে করে। আর সেই জন্যই আজকাল অধিকাংশ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের ও মেয়েদের হোস্টেল আর আলাদা নয়। তারা একসঙ্গেই থাকে। স্কুল থেকেই শুরু হচ্ছে ডেটিং, টাওয়েল পার্টি এবং আরও নানা রকমের মেলামেশা, যা শরীরের সমস্ত নীতিবোধ ও অনুশাসনকে ভেঙেচুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিচ্ছে। বাঙালি মা-বাবারা এই কারণেই সন্তান নিয়ে আমেরিকায় নিরন্তর দুশ্চিন্তা ভোগ করেন। বিশেষ করে সন্তান যদি মেয়ে হয় তা হলে তো মাথায় চাপল দুশ্চিন্তার পাহাড়।

কিন্তু আমেরিকা ওরকমই। কথায় কথায় শোনা যাবে "ইটস এ ফ্রি কান্ট্রি, অ্যান্ড ইট্স্ ইওর লাইফ।" অর্থাৎ এ দেশটা স্বাধীন এবং তোমার জীবনটা একান্তই তোমার নিজস্ব, সুতরাং তুমি তোমারটা বুঝবে।

এই ব্লু ফিলমের দৌরাত্ম্যের ফলে টিভি খুলে সাহস করে খবরটাও শোনা হল না। তার বদলে সকালে বসে বসে চিন্তামণিদার সঙ্গে গল্প করতে লাগলুম। চিন্তামণিদার অভিজ্ঞতা বিশাল এবং বিচিত্র। কথার ঝুলি খুলে বসলে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারেন।

আমি একটু আলস্যে সকালটা কাটাচ্ছিলুম, কিন্তু লালুদা—অর্থাৎ লালমোহন হোড় এসে তাড়া দিয়ে গেলেন। তাড়া আসতে লাগল টেলিফোনেও। নানা জন তাগাদা দিচ্ছিলেন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেওয়ার জন্য।

অগত্যা উঠতে হল। স্নান করে তৈরি হয়ে যখন নিচে নামলুম তখন ডাইনিং হল-এ ব্রেকফাস্টের জন্য বেশ ভিড় জমে গেছে। এ-দেশে রেস্তরাঁয় চেয়ার খালি না থাকলে ঢুকতে দেয় না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় লাইন দিয়ে। জায়গা হলে এক এক করে ঢুকতে দেয়।

আমরা পাঁচ সাতটি বাঙালি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আধ ঘণ্টাটাক পরে ভিতরে ঢোকা গেল।

ব্রেকফাস্টের আয়োজন বিপুল এবং বৈচিত্র্যময়। বুফে ব্যবস্থা। বিশাল লম্বা কাউন্টারে কত যে ফল, দুধ, খাদ্যের আয়োজন, তা না দেখলে প্রত্যয় হয় না। নিরামিষ ব্যবস্থাও প্রচুর। হাঘরের মতো খেলেও কেউ কিছু বলবে না। আর গড়পড়তা আমেরিকানরা হাঘরের মতোই খায়।

আমাকেও হাঘরের মতোই খেয়ে নিতে হবে। কর্মকর্তারা আমাকে বেশি করে খেয়ে নিতে উৎসাহ দিচ্ছেন। কারণ লাঞ্চের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চিত নন। লাঞ্চ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু নিরামিষের ব্যবস্থা কী হবে বা নিরামিষে পেঁয়াজ রসুন থাকবে কি না, এ-সব দুশ্চিন্তাও আছে।

দুঃখের বিষয় সকালবেলায় আমার মোটেই খিয়ে পায় না। সাধারণত সকালের দিকে আমি জল আর চা ছাড়া কিছুই খেতে পারি না। বেলা দশটা সাড়ে দশটায় ভাত খেয়ে অফিস যাই। এত সকালে আমার পক্ষে পেট ঠেসে খেয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

তবু ঠাণ্ডা দুধ, সিরিয়াল, কয়েকটা টোস্ট, ফলের রস, ফল ইত্যাদি নিয়ে বসলুম। যথাসাধ্য হা-ঘরের মতোই খাওয়ার চেষ্টা করলুম। শেষ অবধি ফলটল আর গলা দিয়ে নামল না।

লালুদা অনুযোগ করলেন, আপনি তেমন কিছু খেলেন না তো!

যথেষ্ট হয়েছে। আর পারা যাবে না।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বাইরে চলে এলুম। বিশাল লবিতে বাঙালিদের ভিড়। একদিনেই অনেক মুখ চেনা-মুখ হয়ে গেছে। হাসি, কুশল-প্রশ্ন, অভিনন্দন বিনিময় যান্ত্রিকভাবে হয়ে যেতে থাকে।

বঙ্গ সম্মেলন আজ শুরু হবে সকাল থেকে। চলবে সারাদিন এবং প্রায় বিরামবিহীন। তবু আমেরিকায় যত বাঙালি শিল্পী বা সংস্থা এতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলকে সুযোগ দেওয়া যাবে না। যখন র‍্যারিটান ভ্যালি কলেজে পৌঁছোলাম তখন এইসব নিয়ে কর্মকর্তাদের ব্যতিব্যস্ত দেখতে পেলুম।

এইদিনের অনুষ্ঠানে সব চেয়ে অভিনব ছিল, ভারতীয় তথা বাঙালি মা-বাবার আমেরিকান সন্তানদের বক্তব্য। কিশোর-কিশোরীরা যখন মুখের কাছে মাইক টেনে নিয়ে নির্ভুল মার্কিন ইংরিজিতে তাদের মা-বাবাদের তুড়ে দিতে লাগল আর দর্শক আসন থেকে মা-বাবার যখন উঠে দাঁড়িয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের কথার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকলেন তখন পুরো অনুষ্ঠানটি প্রাণ পেয়ে গেল। বাইশজন কিশোর-কিশোরীর একজনও সেদিন বাংলায় বলেনি, অথচ পরে ব্যক্তিগত আলাপের সময় সবিস্ময়ে জানলুম তাদের অনেকেই ভালই বাংলা বলতে পারে।

প্রবীর রায়ের ছেলেকে পরে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেন না হলে সেদিন ইংরিজিতে বললে ?

সে ভারি লাজুক হেসে বলল, ইচ্ছে করেই।

বুঝলুম, ওটাও তার প্রতিবাদ। ব্যাপারটা অর্থাৎ সমস্যাটা যারা মাতৃভাষার অমর্যাদা বলে মনে করেন বা সমস্যাটিকে ভাষাগত পর্যায়ে দেখেন, তাঁরা হয়তো ভুল করেন না। ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষা ভুলে যাবে বা শিখবে না এটা তো কাম্য নয়। কিন্তু মূল সমস্যাটা আরও একটু গভীরে। ছেলেমেয়েদের যে ব্যাপক আমেরিকানাইজেশন ঘটছে তার নিদান বের করা তো সহজ নয়। উইক এন্ডে বাংলা স্কুল খুলে বা বাংলা গল্পের বই পড়িয়ে ভাষাটা না হয় গেলানো গেল, কিন্তু বাদবাকি সংস্কৃতিচর্চার কী হবে ? মার্কিন কালচারের করাল প্রভাবের গ্রাস থেকে তাদের বের করে আনবার মতো কী আকর্ষণ আছে বাঙালি সংস্কৃতির ?

আমার ভাষণ ছিল সম্ভবত বিকেল পাঁচটার সময়। কিন্তু টাইম স্লট নিয়ে এত সমস্যা দেখা দিচ্ছিল যে, সেই ভাষণের সময় এগিয়ে এল তিন ঘণ্টা। অর্থাৎ যখন আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা তার ঘণ্টা তিনেক আগেই ব্যাপারটা সেরে ফেলা গেল।

বাইরে যখন এলুম তখন আমাকে ছেঁকে ধরেছিলেন কয়েকজন। তার মধ্যেই কী কৌশলে নীলা আমাকে বের করে আনল কে জানে। বলল, ভারি হাঁদা তো আপনি। ওই ভিড়ের মধ্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কী করব ! এঁরা সব কথাটথা বলতে চাইছেন, এঁদের উদ্যোগেই আস

আপনার মতো লোককে পেলে সবাই অমন লোফালুফি করবে। দেঁতো হা হেসে সবাইকে অমন আপ্যায়িত করার দরকার কী আপনার ? গম্ভীর হতে শিখু এবার। গাম্ভীর্য ছাড়া পুরুষকে মানায় নাকি ?

ভারি লজ্জা পেলুম। মাথা চুলকে বললুম, তা বটে। গম্ভীর হতে পারি না বলে আমার ছেলেমেয়েরাও আমার সঙ্গে বেশ ইয়ার্কি দেয়।

দেবেই। আসুন, ওদিকে একজিবিশন হল-এর ভিতর দিয়ে পালাই। সদর দিয়ে বেরোতে গেলে আরও অনেকে ছেঁকে ধরবে।

একজিবিশন হলটিতে শাড়ির একটি ছোটোখাটো হাট বসেছে, আর দেশজ কিছু শিল্প। কিন্তু চোখের নিমেষে যা বিক্রি হয়ে গেছে তা হল বাংলা বই। বোধহয় শ পাঁচেক বই এসেছিল, তার মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক পড়ে আছে। তাও উড়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমেরিকার বাঙালিদের এই একটা প্রবণতা আছে, তাঁরা বই কেনেন পাগলের মতো।

নীলার গাড়িটা ছোটো একটি ডাটসান। পার্কিং লট থেকে সাঁ করে বেরিয়ে সে সোজা বড় রাস্তায় এনে ফেলল আমাকে।

সভয়ে বললুম, খুব দূরে যাচ্ছি না তো ! ওঁরা যদি আমাকে খোঁজেন ?

খুঁজলে পাবেন না। তো কী হয়েছে ? দাসখৎ তো লিখে দেননি।

না, মানে—

দোহাই, একটু সাবালক হোন তো এবার।

নীলা এই রকম ছিল না। ভারি ভীতু ছিল, কথা কম বলত, লাজুকও ছিল খুব কিন্তু কঠিন জীবন তার সেইসব বাহুল্যকে কবে ছেঁটেকেটে বাদ দিয়েছে

পার্ক বললে ভুল হবে। আমরা পার্ক বলতে একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দি বুঝি খুব বেশি বড় নয়, রেলিং দিয়ে ঘেরা, বেঞ্চটেঞ্চ আছে, যেখানে দুপুরে দেহাতির ঘুমোয়, বিকেলে বৃদ্ধেরা বেড়ান এবং বাচ্চারা খেলে, রাতে বেকারেরা আড্ডা মারে, অধিক রাতে যেখানে মদ বা জুয়ার আড্ডা বসে। আমেরিকার পার্ক অতিকায় এবং অরণ্য, হ্রদ, নৌকাবিহারের বিশাল বন্দোবস্ত, অশ্বারোহণ সাইকেল চালানো ইত্যাকার নানা এলাহি ব্যাপার। অঢেল নির্জনতা।

গাড়ি পার্ক করে পার্কের মধ্যে খানিকটা হাঁটলুম। বসলুম জলের ধার ঘেঁষে গাছের ছায়ায় ঘাসে।

তোমার গল্পটা শেষ করোনি নীলা।

শেষ করতেই তো আনলুম আপনাকে। আমার স্বপ্নভঙ্গের কথা আ তো শুনতেই হবে।

বলো।

আমার স্বামীর বাড়িতে আমি তখন প্রায় ক্রীতদাসী। মিথ্যে বলব না, বাচ্চাটাকে রাখা ছাড়া আর মাঝে মধ্যে ঘরদোর গোছানো ছাড়া আর তেমন কোনও কাজ আমাকে দিয়ে করানো হয়নি কখনও। মেমসাহেব নিজেই করত সব কিছু। এমন কি ওদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতেও ডাকত।

তুমি খেতে ?

না। আমি ওই লোকটার চোখের সামনে যেতে ঘেন্না পেতুম। তাই নিজের খাবারটা আলাদা করে ঘরে নিয়ে আসতুম আগেই।

লোকটা—অর্থাৎ তোমার প্রাক্তন স্বামী তোমাকে অ্যাপ্রোচ করেনি কখনও ?

না। হয়তো সাহস পেত না। হয়তো প্রয়োজনবোধ করত না। তাছাড়া বাড়িতে থাকত কতক্ষণ বলুন! সারাদিন অসুরের মতো খাটত, উইক এন্ডে কোথাও চলে যেত গাড়ি নিয়ে। আমাকেও নিয়ে যেতে চাইত মেমসাহেব। আমি যেতুম না। তবে শনি আর রবিবারটা বাচ্চাটা থাকত না বলে আমি ছুটি পেতুম একা থাকার।

ভাল লাগত ?

ভাল ? ভাল লাগার মতো একটা সেকেন্ডও তখন আমার জীবনে আসেনি। এক সেকেন্ডও নয়। মাথাটা পাগল-পাগল লাগত সব সময়। বাড়িতে কিছু জানাতেও পারিনি। জানালে বাবার হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে, মা হয়তো পাগল হয়ে যাবে। কী হবে কে জানে। মাঝে মাঝে চিঠি লিখে জানাতুম, আমি বেশ আছি, খুব বেড়াচ্ছি, এই সব মিথ্যে কথা। মাস কয়েক এইভাবে কেটে গেল। কীভাবে কাটল সেও এক আশ্চর্যের কথা। মরলুম না, পাগল হলুম না, অত বড় জোচ্চুরি হজম করে নিলুম ধীরে ধীরে এবং ওই লোকটার ভাতও তো খেয়ে বেঁচে থাকতে হল। আমেরিকায় কাউকে চিনি না, ইংরিজিতে কথা বলতে পারি না, কী যে করি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। মাঝে মাঝে ফাঁকা বাড়িতে টেলিফোন তুলে পাগলের মতো নম্বরের চাবি টিপতাম। কখনও কখনও কেউ কেউ বিকট গলায় হ্যালো বলে উঠত। আমি জিজ্ঞেস করতুম, আপনি কি বাঙালি ? বিকট গলাটা হয়তো 'হোয়াট' বা 'পার্ডন' বলে উঠত। আমি ফোন রেখে দিতুম।

টেলিফোন ডিরেক্টরি ছিল না ?

সেটা কখনও খুঁজে পাইনি। আর কখনও কোনও বাঙালি বাড়িতে আসতও না। পরে জেনেছি এখানকার বাঙালিদের সঙ্গে লোকটার যোগাযোগ একরকম নেই-ই।

তুমি ঝগড়া করোনি কখনও ?

না। ঝগড়া করব কী, লোকটার দিকে তাকাতেও ঘেন্না হত যে। তবে

অপমানটা তো আর আমি ভুলিনি। শুধু পরিস্থিতিটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছলুম মাত্র। তবে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলুম। একদিন—ভাগ্য ভাল, ওরা উইক এন্ডে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি একা। জানেন তো এখানকার শহরগুলো। কেমন নির্জন, সারাদিন একটা দুটো লোকও দেখা যায় না রাস্তায়।

জানি। আমি এখন আমেরিকা এক্সপার্ট।

কচু। আমেরিকায় সারা জন্ম থেকেও এ-দেশকে বুঝে ওঠা কঠিন মশাই।

তাও জানি। আর সেইজন্যই এক্সপার্ট।

খুব পাজি হয়েছেন। মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে লিখতে লিখতে স্বভাবটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

হ্যাঁ উইক এন্ডের কথা বলছিলে নীলা। কী হল সেদিন ?

ওই দিনই ব্রেক পেয়ে গেলুম। ওরা স্বামী-স্ত্রী বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে গেছে। আমি সকাল থেকে একা বোরিং দু দুটো দিন কাটানোর জন্য তৈরি হচ্ছি মনে মনে। বলছি বোরিং কিন্তু আসলে ওই দুটো দিনই—অর্থাৎ উইক এন্ডটাই আমার সবচেয়ে ভাল কাটত। মনে আছে, সেদিন শনিবার। আজ ঠিক করলুম, একা-একাই বেরবো। কয়েকটা নিজস্ব জিনিস কিনব বলে সাহস করে পোশাক পরে বেরিয়েছি। স্টোর খুব দূরে নয়। দূরে হলে একা যেতে পারতুম না। মাইলখানেক হবে। রাস্তাটাও মোটামুটি চিনে গেছি। কারণ মেমসাহেবের সঙ্গে কয়েকবার যেতে হয়েছিল। ঘটনাটা ঘটল স্টোরেই। ঘুরে ঘুরে জিনিস দেখছি আর সস্তা খুঁজছি। আমার পুঁজি সামান্য। লোকটা আমাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ ডলার করে হাতখরচ দিত।

তুমি হাত পেতে নিতে ?

না। হাতে হাতে দিত না। হয়তো লোকটার অপরাধবোধই বাধা হয়ে দাঁড়াত। কোনও একটা ফাঁকে অর্থাৎ যখন আমি ঘরে থাকতুম না বা টয়লেটে গেছি সেই সময় আমার ঘরে টাকাটা রেখে যেত, সঙ্গে বাংলায় একটা চিরকূট থাকত। 'তোমার হাতখরচ'। টাকাটা প্রত্যাখ্যাত করতে পারতুম। কিন্তু তাতে লাভ কী বলুন ! আমাকে তো কোনও না কোনওভাবে টিকে থাকতে হবে। তাই টাকটা রাখতুম। নিজের কোনও জিনিস দরকার হলে ওই টাকায় নিজেই কিনে নিতুম। ওদের কাছে মুখ ফুটে চাইতে হত না।

বুঝেছি। তারপর বলো।

স্টোরে গিয়ে সেদিন অনেকক্ষণ সময় কাটাচ্ছিলুম। এ-দেশের স্টোরগুলো যে কী ভাল, দেখেছেন তো। চোখ-ধাঁধিয়ে যায়। আর জিনিস দেখতে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে থাকে। সেদিনও এইভাবে কাটাছিল। হঠাৎ কসমেটিক্স সেকশনে শাড়ি পরা একটি মেয়েকে দেখে সন্দেহ হল, এ বাঙালি।

মুখখানায় বাঙালি-ভাব বেশ স্পষ্ট। আর দেখে ছলবলে বলে মনে হয় না। আমেরিকায় আসবার পর এই প্রথম আমি একজন বাঙালি-চেহারার মানুষকে দেখলুম। আমি সোজা গিয়ে মেয়েটিকে বললুম, আপনি কি বাঙালি ? শুনে কিন্তু মেয়েটা তেমন কোনও উৎসাহ বা খুশির ভাব দেখাল না। বেশ গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ, সো হোয়াট ?

অবাক হয়ে বলি, এভাবে বলল ?

হ্যাঁ। আসলে এখানে এত বাঙালি আছে এবং নিত্য নিত্য তাদের এত দেখা সাক্ষাৎ হয় যে, বাঙালি শুনে কেউ আর খুব আহ্লাদ বোধ করে না।

বুঝেছি। এরকম এক-আধটা ঘটনার কথা আমিও আগে শুনেছি। আমাদের যাদবপুরের বাসার যিনি ল্যান্ড লেডি—অর্থাৎ মাসিমা—তিনি মেয়ের কাছে নিউইয়র্কে বেড়াতে এসেছিলেন। একদিন সকালে পার্কে একটি বাঙালি মহিলাকে দেখে তিনি ভারি খুশি হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। মেয়েটি তাঁকে পাত্তাও দেয়নি। পরে তাঁর মেয়ে তাঁকে বলেছিল, বাঙালিদের সঙ্গে খবর্দার রাস্তায়-ঘাটে আলাপ করতে যেও না। অপমান করবে।

ব্যাপারটা ইউনিভার্সাল নয়। অর্থাৎ সবাই ওরকম নয়। তবে অনেকেই একটু ওরকম আছে বাবা।

তা তোমার বাঙালিনী শেষে কী করল ?

প্রথমে কাঠ-কাঠ জবাব দিল বটে, কিন্তু আমি ভারি করুণ মুখ করে কাঁদো-কাঁদো হয়ে তাকে বললুম, আমার ভীষণ বিপদ, আমি এ-দেশের বাঙালিদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে চাই। মেয়েটা খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে বলল, কিরকম বিপদ ? বেড়াতে এসে ডলার ফুরিয়েছে ? আমি বললুম, না। আমার ইমিগ্রেশন ভিসা আছে। ডলারও ফুরোয়নি। কিন্তু আমার বিপদের মাত্রা গভীর। মেয়েটা একটু যেন নরম হল। বলল, আপনার সব কথা না বললে তো বিপদের ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। আমি বললুম, কিন্তু সে তো এই স্টোরে বলা যাবে না। গোপনে বলতে হবে। মেয়েটা হেসে বলল, এখানে আমার আপনার কথা কেউ বুঝবে না। স্বচ্ছন্দে বলুন।

বললে ?

সব বললুম। কিছু বাকি রাখলুম না। এও বললুম, আমি ও-বাড়ি থেকে এক্ষুনি আজই পালিয়ে যেতে চাই, যদি মেয়েটি আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি থাকে। মেয়েটি কিন্তু সত্যিই ভাল। বলল, দেখুন, আপনাকে এ অবস্থায় আশ্রয় দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার হাজব্যান্ডকে না জানিয়ে যদি পালান তাহলে তিনি পুলিশে রিপোর্ট করতে পারেন। তাতে আপনি ভীষণ বিপদে পড়ে যাবেন। আমি অসহায়ভাবে বললুম, তাহলে কী করব। মেয়েটি অভয় দিয়ে

বলল, অত অস্থির হচ্ছেন কেন। এখানকার বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন খুব স্ট্রং। এসব ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই আপনার পক্ষ নিয়ে বুখে দাঁড়াবে। আমি আজই আপনার সব ঘটনা অ্যাসোসিয়েশনে জানাবো। আমার টেলিফোন নম্বরটা রেখে দিন আর আপনার নম্বরটাও আমাকে দিন।

তোমার স্বামীকে মেয়েটি কি চিনতে পারল ? পারল। বলল ভদ্রলোক তো বাঙালিদের সঙ্গে মেশেন না, কোনও সোশ্যাল মিকসিংও নেই। শুনেছি খুব হাই ব্রাউ লোক। নট এ ভেরি পপুলার টাইপ। এর বেশি আর কিছু বলল না। আমাকে অবশ্য নিজের গাড়িতে তুলে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিল আর বলল, চুপচাপ বসে থাকুন। অ্যাকশন নেওয়া হবেই। আর আজ টেলিফোনের কাছাকাছি থাকবেন, ইউ মে রিসিভ এ কল এনি মোমেন্ট ফ্রম নাউ। সেদিন যেন আমার বুক থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। সেদিন ইচ্ছেমতো রেঁধেবেড়ে দুপুরে পেট পুরে খেলুম। মনটা যেন ফুরফুরে লাগছিল। ফোন এল রাত আটটা নাগাদ। একজন গম্ভীর গলার মানুষ পরিস্কার বাংলায় বললেন, আমার ঘটনা তাঁরা শুনেছেন। আগামীকাল সকালে তাঁরা কয়েকজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। সে রাত্রিটা ছটফট করে কাটিয়ে দিলুম। পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ প্রায় বারো-চৌদ্দজন ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা সাত আটটা গাড়ি করে এসে হাজির। অত জন বাঙালি দেখে আমার যে কী বিহ্বল অবস্থা ! আনন্দে কেঁদেই ফেলেছিলুম। লিভিং রুমে সবাই আমাকে দেখে ফিরে বসলেন। ভেরি সিমপ্যাথেটিক, অল অ্যাটেনশন।

সেই মেয়েটিও ছিল ?

হ্যাঁ। জয়ন্তী। সে-ই তো লিডিং পার্ট নিচ্ছিল।

কী হল তারপর ?

যা হওয়ার তাই। আমার গল্প শুনে সকলেই তাজ্জব। এরকম ঘটনা দু-একটা যে ঘটেনি তা নয়। তবে এরা এরকম ঘটনার মুখোমুখি হলেন এই প্রথম। আমার তথাকথিত স্বামীটি সম্পর্কেও অনেক কথা সেদিন জানতে পারলুম। কেউই তার প্রশংসা করল না। কিন্তু সেকথা থাকগে। সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করল, সেইদিন রাতেই তাঁরা আবার দল বেঁধে আসবেন। আমার তথাকথিত স্বামী সস্ত্রীক বিকেলেই ফিরে আসবেন। তারপর যা করার তাঁরা করবেন। আর আমি যেন ভয় না পাই। মন দিয়ে শুনছেন তো !

হ্যাঁ। শো-ডাউনের সময় যত এগিয়ে আসছে তত আমারই হাত-পা হিম হয়ে আসছে।

আমারও হয়েছিল মশাই। এমনিতেই গেঁয়ো মেয়ে তার ওপর অচেনা বিদেশ বিভুঁই। লোকটা আমার সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করলেও একটা আশ্রয় তো

আমার আছে। যদি এটাও হারাই তা হলে কী হবে কে জানে ! বাঙালিরা একজোট হয়ে কী করতে পারবেন না পারবেন তা-ই বা কে জানে ! সাত-পাঁচ ভেবে আমিও কম ঘাবড়াইনি। তবু প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছেটা তো বুকে জ্বলুনি হয়ে ছিলই। সে এক লঙ্কাবাটার জ্বলুনি। লোকটাকে শিক্ষা দিতে না পারলে আমার শান্তি নেই। ওই প্রতিহিংসাই আমাকে শক্ত রেখেছিল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ লোকটা বউ-বাচ্চা নিয়ে ফিরে এল। মেমসাহেব এসে মাটির তলার ঘরে আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে গেল। কী বলব আপনাকে, মেমটিকে কিন্তু কখনও আমার খুব খারাপ লাগেনি। সে কখনও দুর্ব্যবহারও করেনি আমার সঙ্গে।

সে তো আর জানত না যে তুমি আসলে তার সতীন।

সে কথা ঠিক। তবে মেমসাহেব সম্পর্কে আমার ধারণা ভালই ছিল। সেটা যে ভুল নয় তার প্রমাণও পেয়েছি।

সেটা কিরকম ?

বলছি। ওরা ফিরে আসার পর আমার আর ডাক পড়েনি। সন্ধে সাতটা নাগাদ যখন লোকটা টিভি দেখছে আর মেমসাহেব রান্না করছে ঠিক সেই সময়ে কলিংবেল বাজল। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া এ-দেশে কারও বাড়িতে যাওয়ার রেওয়াজ নেই। তাছাড়া ওদের বাড়িতে ভিজিটর আসতই না। লোকটা ভীষণ বিরক্ত হয়ে রীতিমত ধমকে দিল, হু ইজ ইট ! তারপর যাই হোক গিয়ে দরজা খুলল। বাইরের সারি সারি দশ-বারোটার মতো গাড়ি দাঁড়িয়ে আর জনা কুড়ি বাঙালি। লোকটা এত ঘাবড়ে গেল যে বলার নয়। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুড়ি জন লোক ঘরে ঢুকল। পরে খবর পেয়েছি, এরা যে সবাই এই শহরের লোক তা নয়। টেলিফোনে আমার গল্প দু দিনে অনেক দূর অবধি প্রচারিত হয়েছে। খবর পেয়ে বহু দূর-দূর থেকেও অনেকে গাড়ি করে চলে এসেছেন। অর্থাৎ আমার পিছনে জনসমর্থন তখন সাঙ্ঘাতিক।

তোমার স্বামীর রি-অ্যাকশন কী হল ?

ওঃ সে মারাত্মক। প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও তারপর রাগে এমন চেঁচাতে লাগল। হু কলড ইউ ? হোয়াটস দা বিজনেস ? গেট আউট অফ হিয়ার। মেমসাহেব ওর চেয়ে বেশি ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে পুলিশ স্টেশনে ফোন করে দিল। কিন্তু দলবদ্ধ বাঙালিরা তাতে ঘাবড়াল না। উল্টে কেউ চেঁচামেচিও করল না। শান্ত কণ্ঠস্বরে একজন প্রবীণ সৌম্য বাঙালি লোকটাকে বলল, আমরা বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আপনার কাছে এবং আপনার মার্কিন স্ত্রীর কাছে এসেছি। আপনি উত্তেজিত হবেন্ না, হয়ে লাভ নেই।

তারপর কী হল তাড়াতাড়ি বলবে তো ! থামছো কেন ?

দম নিচ্ছি।

আর দম নিতে হবে না।

নীলা খুব হাসল, বলছি বাবা বলছি। লোকটা অগত্যা দরজা ছেড়ে দিল। সবাই অবশ্য ঘরে ঢুকল না। চার-পাঁচজন ঢুকল, বাদবাকিরা অপেক্ষা করতে লাগল। তখন গ্রীষ্মকাল, কাজেই কিছু অসুবিধে ছিল না বাইরে অপেক্ষা করতে। লিভিং রুমে লোকটা আর তার মেম বউকে বসিয়ে পুরো ঘটনাটা প্রকাশ করা হল। লোকটার অবস্থা তখন দেখার মতো। কখনও লাল হচ্ছে, কখনও সাদা হচ্ছে।

তুমি সামনে ছিলে না ?

ছিলুম। লিভিং রুমের দরজার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলুম। সবচেয়ে অবাক আর শকড হল মেমসাহেব। সে আকাশ থেকে পড়ে বলল, আমার স্বামী তো আমাকে বলেছিলেন তিনি দেশ থেকে একজন ঝি আনছেন। কখনও তো বিয়ের কথা বলেননি ! এটা কী করে সম্ভব। বলে স্বামীর দিকে ফিরে মেমসাহেব প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, তুমি বর্বর ? তুমি গুহামানব ? তারপর আর যা যা বলল তা আমার মুখে আসবে না। সেসব আমেরিকান গাটার ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানকার চালু মেয়েরা রেগে গেলে অনায়াসে সেসব শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।

লোকটার তখন অবস্থা কী ?

অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। বাইগামি এদেশে মস্ত অপরাধ। তার ওপর মেমসাহেবের এক মামা সেনেটর। বউয়ের আর পুলিশের ভয়ে লোকটার তখন কোণঠাসা অবস্থা। প্রথমে বিয়েটা অস্বীকার করার একটা দুর্বল চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার কাছে কাগজপত্র ছিল। ভিসা পাসপোর্টে পরিষ্কার স্বামীর নাম লেখা আছে। সেটা সৌম্য ভদ্রলোক বললেন, আপনি শুধু মেয়েটির প্রতিই অন্যায় করেননি, বিদেশে বাঙালি সমাজেরও অপমান করেছেন। আপনার বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপাতত নীলাকে আমরা এ বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে চাই।

পুলিশ কি এসেছিল ?

হ্যাঁ। কথাবার্তার মাঝখানেই এসে হাজির। তারাও ব্যাপারটা শুনল। খুব গম্ভীর মুখে। তারপর লোকটাকে ত্রিপক্ষীয় চাপে সমস্ত ব্যাপারটা স্বীকারোক্তির মতো লিখে সই করে দিতে হল। না করে উপায় ছিল না। মেমসাহেব এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। কাঁদে আর বার বার বলে, ওঃ ডিয়ার, ও সুইট ডিয়ার, তুমি কথাটা আমাকে বলোনি কেন ? তারপর মেমসাহেব বেসমেন্টে আমার ঘরে এসে যত্ন করে আমার সব জিনিসপত্র নিজের হাতে গুছিয়ে দিল। নগদ এক হাজার ডলার আর একটা সোনার ব্রেসলেট আমার ব্যাগে ভরে দিল জোর করে। বলল, আমার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দাও।

তুমি সেই রাতেই চলে গেলে ?

হ্যাঁ। রঞ্জনবাবু—অর্থাৎ সেই সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁর বউ আর তিন মেয়ে। বড়টি আমার বয়সী। তারা ভারি ভাল। ওদের বাড়িতে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তারপর কী হল ?

নীলা মিটিমিটি হেসে বলল, তারপর শুরু হল নীলার আমেরিকানাইজেশনের নতুন গল্প। কিন্তু জানেন, সেই মেমসাহেব কিন্তু এখনও আমার খোঁজখবর নেয়।

খানিকক্ষণ নীরবে কাটাবার পর নীলা মৃদুস্বরে বলল, বাইরে থেকে আমেরিকার যে ঝকমকে চেহারাটা দেখছেন, সুন্দর রাস্তাঘাট, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, দারুণ দারুণ সব বাড়ি-গাড়ি, এটা দেখেই দেশটাকে বিচার করবেন না। এদেশে বেঁচে থাকার একটা সাঙ্ঘাতিক লড়াই আছে। এখানে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি এমনিতে ছেড়ে দেয় না। বদান্যতা এখানে সস্তা নয়। এটা হল বাস্তবতার দেশ, কাজের দেশ, এখানে স্বপ্ন দেখার অবকাশ নেই।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললুম, সেটা খানিকটা জানি নীলা।

আমার জীবনেও সেটা এত দ্রুত দেখা দিয়েছিল আর এতই নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল যা বললে শিউরে উঠবেন। ওই লোকটার ঝি হয়ে বেসমেন্টের ঘরে কূপমণ্ডুক থেকে একটা জীবন হয়তো কাটত না। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে দিনগুজরান হতে পারত কিছুকাল। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে এসে অন্যের আশ্রয়ে থেকে যখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলুম তখনই বোঝা গেল আমেরিকা কী কঠিন দেশ !

তুমি দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবোনি ?

নীলা এ কথায় ভারি লাজুক ভঙ্গিতে হাসল, সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু ফিরে গেলে ভারি লজ্জার ব্যাপার হত। পাড়াপড়শী, আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখানোর জো ছিল নাকি ? এমনিতেই গরিবের মেয়ে আমেরিকায় বিয়ে হচ্ছে জেনে কত লোক হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছিল। তারা হাততালি দিত আমি ফিরে গেলে।

বুঝেছি।

তাই ঠিক করলুম, যেমন করেই হোক এই দেশেই ডেরা বানিয়ে নিতে হবে। কোনো গ্লানি নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারব না।

বাড়িতে ঘটনাটা জানাওনি ?

প্রথমদিকে জানাইনি। শুধু ঠিকানাটা চেঞ্জ করেছি বলে জানিয়েছিলাম। বলেইছি তো আমার জীবনে যা ঘটেছে সেই লজ্জার ভাগিদার আমার মা-বাবাকে করতে চাইনি।

তুমি খুব শক্ত মেয়ে নীলা।

ঠিক তা নয়। আমি শক্ত হয়েছি পরিস্থিতির চাপে পড়ে। শক্ত না হলে বাঁচতুম নাকি?

আমেরিকায় বাস করার লোভও কি কাজ করেনি এর মধ্যে?

নীলা তার সুন্দর দুখানা চোখ অপকটে আমার চোখে স্থাপন করে বলল, আপনাকে মিথ্যে বলে লাভ কী? সে লোভও ছিল। এদেশে পা দিয়েই মনে হয়েছিল, বাঃ এ তো ভারি সুন্দর দেশ! এখানে থাকতে কী ভালই না লাগবে! হ্যাঁ, আমেরিকায় থাকব, এই লোভও ভীষণ হয়েছিল মনে। আর তার দামও দিতে হয়েছে। এখানকার বাঙালিরা আমাকে ওই পাজি লোকটার খপ্পর থেকে উদ্ধার করে দিয়েই কিন্তু উধাও হননি। নানাভাবে আমাকে স্বনির্ভর করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, টাকা-পয়সার সাহায্য অবশ্য দরকার হয়নি। ওই লোকটার কাছ থেকে একটা মোটা মাসোহারা আদায় করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিন্তু ওই লোকটার বিরুদ্ধে একটা আইনগত ব্যবস্থাও তো তোমার নেওয়ার কথা। বাইগ্যামি তো মস্ত অপরাধ।

বাইগ্যামির চার্জ আনা গেলেও আমি আনতুম না। কারণ আইনের পথে গেলে কোর্ট-কাছারির ঝামেলা। বিদেশে ওসব ঝামেলা করার সাহস আমার ছিল না। তব বাইগ্যামির চার্জ আনা যেতেও না।

সে কী! কেন?

পরে জানা গিয়েছিল লোকটা মেমসাহেবকে বিয়ে করেনি। তারা এক সঙ্গে বাস করছিল। এদেশে ওরকম রেওয়াজ আছে। বিয়ের আগে এরা বেশ কয়েক বছর একসঙ্গে বাস করে, ছেলেপুলেও হয়। তারপর হয়তো বিয়েও করে। এ লোকটার ক্ষেত্রেও তাই। মেমসাহেব ওর আইনসিদ্ধ বউ নয়।

কিন্তু তুমি?

আইনগতভাবে আমিই ওর স্ত্রী।

তাহলে তো তোমাকে ডিভোর্সের মামলা করতে হয়েছিল।

হ্যাঁ। মেমসাহেব ওর আইনসিদ্ধ বউ না হলেও তার জোর অনেক বেশি। এখানে লিভিং টুগেদার করলেও তার একটা হ্যাপা আছে। আইনসিদ্ধ বউ না হলেও হুট করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া মেমসাহেবের বড় বড় আত্মীয়-স্বজন আছে। তারা ওকে ছিঁড়ে খেত। ফলে মেমসাহেবকে ছাড়ার উপায় ওর ছিল না।

তাহলে লোকটা তোমাকে বিনা বাধায় ডিভোর্স দিয়েছিল?

হ্যাঁ। মামলা লড়ল না।

পানিশমেন্ট হয়নি?

না। তাতে আমি খুশিই হয়েছিলাম। পানিশমেন্ট হলে লোকটা হয়তো খেপে উঠত, প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বুঝতেই পারছেন, বিদেশে আমি আর তখন বাড়তি কোনও বিপদ চাইছিলাম না।

লোকটার সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়নি?

হয়েছে।

কোথায়?

বার দুই ও বাড়িতে এসে দেখা করেছে।

তার বক্তব্য কী ছিল?

নিজের সাফাই গাওয়া। বোঝাতে এসেছিল যে আসলে তার ইচ্ছে ছিল মেমকে ছেড়ে আমাকে নিয়েই ঘর করার।

কথাটা তোমার সত্যি বলে মনে হয়নি?

কথাটা সত্যি হতেও পারে। কিন্তু তাতে আর কী লাভ বলুন। আমার তো আর কোনও আকর্ষণ ছিল না তখন ওর ঘর করার। তবে আমি খারাপ ব্যবহারও করিনি। বলেছি, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমি এখন মুক্তি চাই। আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না।

আর মেমসাহেব?

মেম প্রায়ই আসত। তার নাম ফ্লো। ফ্লো এসে আমাকে নানা উপহার দিত, ডলার দিত।

তুমি নিতে?

নিতুম। আমেরিকায় অবলম্বন তো কিছু ছিল না। নিতে হত। আর মেম খারাপ ছিল না, আগেই বলেছি।

তারপর কী হল?

কয়েকটা মাস একটু টেনশন গেল। তবে বসে থাকিনি। ট্রেনিং নিয়েছি একটা। তারপর নানা জনের চেষ্টায় চাকরি পেলুম। চাকরিটা করতুম ভীষণ মন দিয়ে। এখানে সিনসিয়ারিটির দাম সবচেয়ে বেশি। নিষ্ঠা নিজে কাজ করলে আর কাজে ভাল ফল করলে আয়ের অভাব হয় না।

সেটল করতে তোমার ক' বছর লেগেছে?

চার-পাঁচ বছর। আয় করতে শুরু করেই আমি চেষ্টা করেছি আশ্রয় ছেড়ে নিজের এসটাব্লিশমেন্ট তৈরি করে নিতে। কঠিন কাজ। কিন্তু যেহেতু আমার খরচ সামান্য তাই টাকা জমাতে পারতুম। অবসর সময়ে আরও ট্রেনিং নিতুম। ধকলে শরীরটা প্রথমে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবই সয়ে গেল শেষ অবধি। এখানকার জল-হাওয়া দারুণ ভাল। কাজেই শরীর সারতে দেরি হয় না। আর অসুরের মতো খাটতেও কষ্ট নয় না।

বাড়ির লোকেরা কবে ব্যাপারটা জানতে পারল ?

অনেক পরে। সেটল হওয়ার পর যখন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ছো একটা বাড়ি কিনলুম, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি, তিন-চারবার চাকরি বদ করে শেষে যখন বেশ ভাল একটা চাকরিতে ঢুকলুম তখন মনে হল, আর ভ নেই। আমেরিকা থেকে আমাকে আর কেউ সহজে উৎখাত করতে পারবে না যখন নোঙরটি ফেলে স্থিতু হয়েছি তখনই বাবা-মাকে চলে আসতে লিখলুম

তাঁরা কী লিখলেন ?

নীলা হাসল, বাবা-মা আগেই পাসপোর্ট করে রেখেছিলেন মেয়ে জামাইয়ে কাছে আসবেন বলে। আমি টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে চলে আসতে লিখলুম। তাঁ যখন এলেন তখন তাঁদের আমার বাড়ি-গাড়ি আর স্ট্যাটাস দেখালুম। তারপ ধীরে ধীরে বললুম সব কাহিনী।

রি-অ্যাকশন কী হল ?

কী হবে বলে আশা করছেন ? সেকেলে মানসিকতার বাঙালি বাবা আ মা একজন মেয়ের স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হওয়া এবং ঠকবাজ পুরুষের কবল থে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রামকে মোটেই ভাল চোখে দেখলেন না। তাঁরা কেমন যেন ভা অখুশি আর অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। মা তো বলেই ফেলল, স্বামী ছাড়লি কী যে হবে।

আর তোমার বাবা ?

বাবা বলতে লাগলেন, তিনি জামাইয়ের কাছে একবার যাবেন। গি বললেন, আমার মেয়েকে ক্ষমা করে দাও বাবা। আর মেমসাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে ওটা আমরা ধরব না, তুমি মেমসাহেবকে ছেড়ে দাও, আমর দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের দুটিকে মিলিয়ে দিয়ে যাই।

আমি হেসে ফেলে বললুম, তাই বুঝি !

নীলা হঠাৎ আমার দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে বলল, খুব ভালমানুষি দেখানে হচ্ছে, না ? আপনাকে হাড়ে হাড়ে চিনি মশাই ! বাইরে তো খুব মড পোশা পরে, প্রগতির মুখোশ লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান. ভিতরে ভিতরে আপনি একা সেকেলে, রক্ষণশীল। গোঁড়া, কুসংস্কারাচ্ছন্ন যাচ্ছেতাই এক বামুন। আপনাকে চিনতে আমার বাকি নেই।

আহা, এটা তোমার মস্ত একটা ভুল হচ্ছে।

থামুন মশাই। আপনার গল্প উপন্যাসে নায়ক যদি বামুন হয় তো নায়িকাও বামুন হবে, নায়ক কায়েত হলে নায়িকাও কায়েত। অসবর্ণ বিয়ে তো দূরের কথা আপনি অসবর্ণ প্রেমটাও কখনও দেখান না। তার ওপর এর হাতে খাবো না ওর ছোঁয়া খাবো না, চা খেয়ে পর্যন্ত হাত ধোবো, এসব কী মশাই ? খু

ভালমানুষি দেখানো হচ্ছে মুখে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনিও চান, নীলা তার ওই বদমাশ স্বামীটাকেই মেনে নিক। বলুন, চান কি না!

আহা, তুমি হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লে কেন?

এই আপনার মতো লোকগুলোর জন্যই দেশটা পচে গলে যাচ্ছে, আপনার মতো লোকের জন্যই মেয়েদের আজ এই দুর্দশা।

আমাকে বকবার জন্যই বুঝি আজ এত দূরে টেনে এনেছো?

বকব না আপনাকে? নিজে আলোচাল কাঁচকলা খেয়ে যত খুশি চোখ উল্টে ধ্যান করুন, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু নিজের বউ বাচ্চাদের পর্যন্ত মাছ মাংস খেতে দেবেন না, জোর করে সবাইকে বর্ণাশ্রম মানাবেন, জাতপাত নিয়ে পড়ে থাকবেন, আর আপনাকে ছেড়ে দেবো আমি? খুব চিনি আপনাকে। হাড়ে হাড়ে চিনি।

বলতে বলতে কেন যে নীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে, কে জানে। তবে এসব অবস্থায় মেয়েদের প্রথমেই বাধা দিতে নেই। একটু কাঁদুক। কাঁদলেই অনেক সময়ে মন পরিষ্কার হয়ে যায়।

মিনিট দশেক কাঁদবার পর নীলা স্থির হল। চোখ রুমালে মুছে, হাঁটুতে থুতনি রেখে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। আমি সাহস করে কোনও কথাই বলতে পারলুম না। অপেক্ষা করতে লাগলুম।

হঠাৎ নীলা আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। গাঢ় গলায় বলল, খুব বকলুম বুঝি আপনাকে?

না, ওটুকু বকাই নয়। তুমি যা দুর্ভোগ পুইয়েছো তাতে বোধহয় পুরুষ হিসেবে আমারও দায়ভাগ আছে। আরও বকলেও কিছু মনে করতুম না।

থাক। আর অত বীর হতে হবে না। পাজি লোক কোথাকার।

করুণ মুখ করে বললুম, অনেকেই আমাকে পাজি বলে বটে, কিন্তু লোকটা আমি তেমন খারাপ নই।

নীলার চিকমিকে চোখে হাসি নাচছে, খুব খারাপ লোক আপনি। মেল শ্যভিনিস্ট।

আমি নেহাতই তুচ্ছ লোক নীলা। কিন্তু তোমার বাবা কি শেষ অবধি জামাইয়ের কাছে গিয়েছিলেন?

না। যেতে দিইনি। টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন, তাও করতে দিইনি। বলেছি, তোমাদের সেকেলে ধারণা বদলাতে হবে। স্বামী ছাড়া মেয়েদের গতি নেই, একথায় যদি বিশ্বাস করতে হত তাহলে আজ মার্কিন সমাজে আমার স্থান হত একজন জোচ্চোর লোকের আশ্রিত ঝি বা উপপত্নী হিসেবে। তোমাদের মতো সেকেলে ধারণা বদলাতে পেরেছি বলেই এদেশে আমি এখন মাথা উঁচু রেখে বাস

করতে পারছি। তোমরা তোমাদের মেয়ের জয়টা দেখলে না ?

তাঁরা কী বললেন ?

পরিস্থিতিটা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন, কিন্তু তাদেরও দোষ দিই না। দে সমাজ আছে, আত্মীয়-পরিজন আছে, ঘটনাটা সেখানে চাউর হবে। লজ্জা ব্যাপার হবে। আমাদের দেশ তো এখনও দুশো বছর পিছনে রয়েছে মশাই

তা তো বটেই নীলা।

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, পুরুষ ছাড়া মেয়েদের জীবন সম্পূর্ণ বা সার্থ নয় ? মেয়েরা যে স্বনির্ভর হয়ে জীবন কাটাতে পারে একথা কি আপনার নিরে মাথায় আপনি কখনও বুঝবেন ? মেয়েদের কিরকম জীবন কাটাতে হয় তা ি আপনি কখন সিমপ্যাথেটিক্যালি ভেবে দেখা প্রয়োজন মনে করেন ? আপনি না সে-ই লোক যিনি লিখিতভাবে ছাপার অক্ষরে ঘোষণা করেছিলেন যে মেয়েদের চাকরি করা উচিত নয় ? তাহলে তাদের কী উচিত মশাই ? পো কুকুরের মতো, খাঁচার পাখির মতো বরাবর পুরুষের হাত থেকে দয়ার অন্নব গ্রহণ করে গৃহপালিতের মতো বেঁচে থাকা ?

দেখ নীলা—

আমি অনেক দেখেছি মশাই। দয়া করে চুপ করুন। আপনি আপনার স্ত্রী বিয়ের আগে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করেননি ? যাতে তিনি আপনার সম্পূ ক্রীতদাসী হতে পারেন, যাতে ডানা ঝাপটাতে না পারেন তার নিরেট বন্দোব আপনি প্ল্যানমাফিক করেননি ?

আমি একজন ভিলেন নীলা।

ভিলেনই তো।

বলে নীলা খিলখিল করে হেসে ফেলল, যাক আর অত দুঃখ-দুঃখ ক বসে থাকতে হবে না। এসব কথা শুনেও যে আপনার রি-অ্যাকশন হয় না আ প্রায়ই যে এরকম ধমক-ধামক মেয়েরা আপনাকে করে থাকে তাও আমি জানি চলুন, এবার ফেরা যাক। না ফিরলে বোধহয় কর্মকর্তারা সত্যিই পুলিশে খব দেবে। কিংবা ইলোপমেন্ট বলেও ভাবতে পারে।

ফেরার পথে গাড়িতে বসে বললুম,.নীলা, এদেশের মেয়েদের পক্ষে সম্পূ একা থাকা কতটা নিরাপদ ?

মেয়েরা আজ অবধি কোথাও একা থেকে নিরাপদ নয়। এদেশও যা ওদেশ তাই। তবে এদেশে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বেশি। কোনও মেয়েকে জো করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করানো যায় না। তাছাড়া কেউ কারও ব্যক্তিগত জীব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কিন্তু ধরো কেউ তো সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

এখানে সুযোগের তো অভাব নেই মশাই। আমি একা একটা বাড়িতে থাকি বলেই যে পুরুষেরা ছোঁক ছোঁক করবে চারধারে, তা নয়। এদেশে ওরকম হয় না। তা বলে রেপার, সাইকোপ্যাথ যে নেই তা বলছি না। অনেক আছে। কিন্তু দেশটাও বড়, মেলামেশার অঢেল সুবিধে। শরীরের চাহিদা মেটানোও এখানে কোনও সমস্যা নয়। তাই আজ অবধি আমার সেরকম বিপদ কিছু হয়নি। তবে আমার একটা ছোট্ট পিস্তল আছে। সঙ্গে থাকে।

আতঙ্কিত গলায় বললাম, পিস্তল।

কখনও ব্যবহার করতে হয়নি। বলে নীলা আমার দিকে চেয়ে একটু স্নিগ্ধ হাসল, যা ভীতু আপনি।

যখন ফিরলুম তখন র‍্যারিটান ভ্যালি কলেজে বঙ্গ সম্মেলনে সত্যিই আমার তল্লাশ হচ্ছে। হলঘরে তুমুল গান-বাজনা-নাটক অবিরাম হয়ে চলেছে।

লাউঞ্জেই পাকড়াও করলেন কয়েকজন। ধরে নিয়ে গেলেন ক্যান্টিনে। চা খেতে খেতে গল্প! আড্ডা।

একটা জিনিস লক্ষ করে অবাক হয়েছি এবং সেকথা আগেও বলেছি। বাঙালিদের মধ্যেও ধূমপানের রেওয়াজ এখানে একরকম উঠেই গেছে। বলতে গেলে এখানে আমিই একমাত্র ধূমপায়ী বলে দেখতে পাচ্ছি। এদেশের সাহেবরাও সিগারেটকে জীবন থেকে একরকম তুলেই দিয়েছে। খুব কম সংখ্যক লোক সিগারেট খায়। নানা জনের মুখে শুনলাম এখানকার বাঙালিদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাসও খুব কম। অনেকে আড্ডায় বসলে একটু আধটু খায়, কিন্তু নেশাটেশা একেবারেই করে না।

এমনটা কেন হল তা নানা জনকে জিজ্ঞেস করেছি। কোনও মোটা কারণ নেই। মদ খাওয়াটা আমাদের দেশে যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এদেশে তত কমে যাচ্ছে। সিগারেট এবং মদ দুটোই বোধহয় হৃদযন্ত্রের যথেষ্ট ক্ষতিকারক। স্বাস্থ্য-সচেতন আমেরিকায় তাই এই দুটির বিরুদ্ধেই মনোভাব গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

আমেরিকার ভবঘুরে, উচ্ছৃঙ্খল, ছন্নছাড়া, পাঙ্কদের জীবন নিয়ে বিস্তর লেখাজোখা হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ মিলিয়ে এদের সংখ্যা বড়ো কম নয়। নিউ ইয়র্কের হারলেম-বা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এবং বড় শহরে মার্কামারা এলাকায় এদের বাস। পরিত্যক্ত বাড়ি, গাড়ি বা যেমন-তেমন একটা আশ্রয় হলেই হল। আবর্জনা কুড়োনো, ছোটোখাটো চুরি, ভিক্ষে ইত্যাদিই এদের জীবিকা। স্মরণীয় কিছু চলচ্চিত্রও হয়েছে এই সব মানুষকে নিয়ে। সবাই যে নিরুপায় হয়ে বা জীবনের হাতে মার খেয়ে এই জীবন-যাপন করছে এমনটাও হলফ করে বলা

যাবে না। তবে এদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা গবেষণা যথেষ্ট হয়ে থাকে। অনেক সময়ে মনে হবে ঐশ্বর্যের দেশে এই জীবন অনেক স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে প্রতিবাদ হিসেবে। অনেককে মনে হবে মানসিক ভারসাম্যহীন, অনেককে ড্রাগ-নেশাগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা যাবে। অনেককে জীবন-যাপনে নিরুৎসুক ও হতাশাগ্রস্ত বলে আবিষ্কার করা যাবে। কারণ যাই হোক, তারা সাধারণীকরণ সম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে গোষ্ঠী হিসেবে এরা বাইরে থেকে একই চরিত্রের বলে মনে হবে। কোনও সুস্পষ্ট নীতিবোধ, কোনও ইচ্ছাশক্তি, কোনও লক্ষ্য এদের জীবনে নেই। অদ্ভুত এক নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে জেবড়ে বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে এরা। এক সময়ে হিপিরা সারা পৃথিবীর আলোচ্য বিষয় ছিল। ভারতবর্ষেও পথেঘাটে সর্বত্র তাদের দেখা যায় আজও। আছে স্কমস্ক-রাও। এই সব গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তবে সে বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা আমার জানা নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, এই মানুষগুলিকে আমেরিকায় ভদ্রলোকেরা এড়িয়ে চলে। আর এরা এই উন্নত অর্থনীতির দেশে উন্নতভাবে বেঁচে থাকার খেসারত বা টেনশন ঘাড়ে নিতে নারাজ। এদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং অনেকটাই স্বাধীন।

শুনেছি আমেরিকায় ন্যুডিস্ট কলোনি আছে। যেসব জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। আবালবৃদ্ধবনিতা নিরাবরণ হয়ে বাস করছে—এটা দেখতে আগ্রহ হয়নি আমার। তবে কুম্ভমেলায় নাগা সন্ন্যাসীদের ডেরায় আমি বিস্তর থানা গেড়েছি। প্রথমটায় একটু সংকোচবোধ করলেও পরে আর ব্যাপারটা অস্বস্তিকর মনে হত না। সবটাই অভ্যাসের ব্যাপার। তবে নাগা সন্ন্যাসীদের কাছে নগ্ন থাকাটা সাধনার অঙ্গ। ন্যুডিস্টদের কাছে প্রাকৃত হওয়ার বাসনা বা বাহুল্য বর্জনের ইচ্ছা।

তবে আমেরিকায় যে বিচিত্র সব জীবনধারণা ও জীবনধারা আছে তাতে সন্দেহ নেই। এসবের পিছনে নানা প্রবণতাই কাজ করে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলেই বোধহয়, ব্যাপকভাবে এসব প্রবণতাকে শোধন করার চেষ্টা হয় না।

ভবঘুরে ছন্নছাড়াদের আমি নিউইয়র্কে প্রথম চাক্ষুষ করি। আমি ভিখিরির দেশের লোক। বিস্তর নোংরামি নিয়ত চাক্ষুষ করে থাকি, তবু নিউইয়র্কে এদের দেখে একটু অস্বস্তি হয়েছিল। তার কারণ, আমাদের দেশের ভিখিরিদের মধ্যে উগ্রতা নেই, তাদের দেখলে ভয়-ভয় করে না। কিন্তু এদের মধ্যে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন উগ্রতা রয়েছে। সুযোগ পেলেই যেন ফেটে পড়বে। এদের নিয়ে আমেরিকায় কিন্তু ঝামেলার অন্ত নেই। পুলিশ ও প্রশাসনকে প্রায়ই উদ্ব্যস্ত হতে হয়।

এই পাঙ্ক ও ভবঘুরেদের সঙ্গে একটু পরিচয় করার হচ্ছে ছিল। ইচ্ছের কথা

শুনে বকুল চোখ কপালে তুলে বলল, নিরামিষ লোকের এরকম আমিষ ইচ্ছে তো মোটেই ভাল লক্ষণ নয়!

ইচ্ছেটার মধ্যে আমিষ কী দেখলে?

ওঃ হোঃ, আপনি তো আবার লেখক, ভুলেই গিয়েছিলুম।

লেখবার জন্য নয়, এদের সম্পর্কে অনেক শুনেছি, তাই।

ক'দিনের জন্য এসেছেন, কেন ওসব ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাওযা? পরে যখন হাতে সময় নিয়ে আসবেন তখন নিয়ে যাবো।

তুমি নিয়ে যাবে?

কেন, অবাক হওয়ার কী আছে? আমেরিকায় আমার কত বছর হয়ে গেল জানেন? এদেশের নাড়িনক্ষত্র জানা হয়ে গেছে।

বকুলের মধ্যে একটা ছদ্ম-ঝাঁঝ আছে, আর ক্যাট ক্যাট করে কথাও বলে বটে, কিন্তু সে ভারি আবেগপ্রবণ। জীবনে একটা দুর্ঘটনার স্মৃতি তার ভিতরে এমন একটা স্থায়ী ক্ষত দৃষ্টি করে রেখেছে যে, কারণে অকারণে সে কেঁদে ফেলে। বকুলের সঙ্গে তাই খুব সাবধানে কথা বলতে হয়।

সে নিউইয়র্কের কুইন্স অঞ্চলের বাসিন্দা। স্বামীর মৃত্যুর পর আহত ও শোকাচ্ছন্ন বকুল যে দুঃসময় কাটিয়েছে আমেরিকায় তা ভয়াবহ। তবে সে প্রচুর ডলার পেয়েছিল ক্ষতিপূরণ বাবদ, বীমা বাবদ। আর তার স্বামীর রোজগার ভাল ছিল বলে তাকে আমেরিকায় কোনও অর্থনৈতিক সংকটে পড়তেই হয়নি। বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, শুধু আপনার জন কেউ ছিল না। তবে খবর পেয়ে তার পুত্রশোকাতুর শ্বশুর এসেছিলেন আর এসেছিল বকুলের মা। শ্বশুর ফিরে গেলেন। মাকে যেতে দেয়নি। বকুল। নিজেও ফিরে যায়নি।

কেন ফিরে যাওনি? এই প্রশ্ন করলে বকুলের একটাই জবাব, কেন যাবো? দেশে কী আছে? অত দেশ-দেশ করবে না তো! আপনার সুজলাসুফলা শস্যশ্যামলা দেশকেও চিনি মশাই। এখানে আমি যত সুবিধে পাই তত সুবিধে দেবেন ওদেশে?

দ্বিতীয় দিনের বঙ্গ সম্মেলন অধিক রাতে শেষ হয়েছিল। তৃতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার আবার শুরু হল সকালে। ইতিমধ্যেই বাঙালিদের মুখে চোখে রীতিমতো বিষণ্ণতার গভীর ছাপ! আজই শেষ। তারপর যে যার জায়গায় ফিরে যাবেন, কাল থেকে শুরু হবে রুটিনে বাঁধা জীবন।

বঙ্গ সম্মেলনে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে যে ঘরে ফেরারই উৎসব তা বহিরাগত হয়েও খুব টের পাচ্ছিলুম। প্রতিটি বাঙালিকেই মনে হচ্ছে ভীষণভাবে 'হোমসিক'।

আমাদের বাল্যে-কৈশোরে বাংলা সাহিত্যে একটি উত্তাল তরঙ্গ তুলেছিল

একখানা বই। "দৃষ্টিপাত"। রিপোর্টাজ ধরনের লেখা। কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে সুখপাঠ্য। খানিকটা ইতিহাস, খানিকটা খবর, খানিকটা ভ্রমণ, খানিক উপন্যাসের এমন অসাধারণ ককটেল এবং তার সঙ্গে একটি শানিত বাংলা গ এই গ্রন্থটিতে এমন একটা বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল যা ইতিপূর্বে বাংলা সাহি ঘটেনি। ফলে 'দৃষ্টিপাত' বাংলা বইয়ের বিক্রির সব রেকর্ড ভেঙে কলকাতা মফস্বলে ঝড় তুলে দিয়েছিল। সবচেয়ে করুণ ছিল লেখক 'যাযাবরে অকালমৃত্যু। ভূমিকায় ঘোষণাটি ছিল, গ্রন্থের লেখক আর বেঁচে নেই। তাঁ আসল নামটিও আমরা জানলুম, বিনয় মুখোপাধ্যায়। যাযাবর মারা গেছেন এ আর কোনওদিনই দৃষ্টিপাতের মত আর কোনও লেখা আমরা পাবো না এটা জে ভারি বিষণ্ণ বোধ করতুম তখন।

এখনকার পাঠকেরা হয়তো জানেন না, আমাদের দৃষ্টিপাত গ্রন্থটির বহু পং এবং স্তবক মুখস্থ ছিল। কথায় কথায় দৃষ্টিপাত থেকে উদ্ধৃতি মুখস্থ বলাটা হ দাঁড়িয়েছিল রেওয়াজ। আমরা এও জেনেছিলুম, গ্রন্থটির আখ্যান অংশ পুরোট কিছু চিঠির সংকলন। লেখক দিল্লির প্রবাসকালে তাঁর প্রেমিকাকে চিঠিগু লেখেন। তা থেকে দৃষ্টিপাত গ্রন্থের জন্ম।

কয়েক বছর পর অবশ্য জানা গিয়েছিল, যাযাবর মারা যাননি। বহা তবিয়তে বেঁচে রয়েছেন। দিল্লিতে অবস্থান। যাযাবর তার পরেও কয়েকটি গ্র প্রকাশ করেছেন, তবে দৃষ্টিপাতের জনপ্রিয়তা সেগুলো পায়নি।

যাযাবরকে একবার চোখের দেখা দেখবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এতকাল ঘটে ওঠেনি। আকস্মিক এই আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনে প্রবীণ যাযাবরকে পে আমার সেই কৈশোর যেন উথলে উঠল।

বললুম, আপনাকে দেখবার ভারি ইচ্ছে ছিল।

যাযাবর বিনয়ে যেন গলে গেলেন। মুখে সরল একটু হাসি। খুব নম্র ক বললেন, কলকাতাতেই এখন আছি।

যাযাবর বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষে আমেরিকায় আসেননি। এসেছেন কোন আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে। বঙ্গ সম্মেলনের কর্তারা তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন সস্ত্রীক। একটি ভাষণও দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু আড্ডাবাজদের কবলিত আ সেটা শোনার অবকাশ পাইনি।

তবে দেখা তো হল। আমার কাছে এই দেখা হওয়াটার মূল্য অনেক।

জিজ্ঞেস করলুম, আর কিছু লিখছেন?

ভারি বিনয়ী স্বরে বললেন, একটু আধটু।

যাযাবরকে এ যুগের বাঙালি পাঠক হয়তো ততটা চিনবে না। তা দৃষ্টিপাতেরও দিন চলে গেছে। তবু দৃষ্টিপাতের আমলে গ্রন্থটি যে জনপ্রিয়

পেয়েছিল তা আর কোনও গ্রন্থ কখনও পেয়েছে বলে জানি না। দৃষ্টিপাত ছিল একটা ট্রেন্ড সেটার।

বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষে আরও কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁরা বিখ্যাত কেউ নন, কিন্তু আলাপ করে আমি লাভবান হয়েছি। লালমোহন হোড়, স্বদেশবাবু, সলিলবাবু, সুশান্তবাবু। লাভবান হয়েছি, তার কারণ দূরের প্রবাসে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর এদের মানসিকতায় যে স্বদেশ প্রীতির গভীর দহ সৃষ্টি হয়েছে তা যে স্বদেশে বাস করলে হত না তা বুঝতে পেরেছি বলেই। আজকাল অনেকেই দেশপ্রেমের ভাবাবেগকে বেশি প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁরা ভাবেন স্বদেশ-স্বদেশ করে গলা শুকোনোর কিছু নেই। আবার অন্যদিকে এক চিলতে স্বদেশভূমির জন্য কত লোক ঘাম-রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছে।

স্বদেশ সম্পর্কে আমার নিজের ব্যক্তিগত দুর্বলতা গভীর। তাই কারও স্বদেশপ্রীতি দেখলে আমি খুশি হই।

স্বদেশদা আমাকে একান্তে ডেকে বললেন, দেখুন, এখানকার বাঙালিরা অনেকেই মুখে বলবে বটে যে, একদিন তারা দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু আসলে কেউই যাবে না। এদেশ ছেড়ে যাওয়া অত সহজ নয়।

কেন বলুন তো!

এদেশের মতো এত সুবিধে কোথায় আছে বলুন! কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, আর কেউ যাক না যাক আমি কিন্তু যাবোই। সল্ট লেকে আমি বাড়ি করে রেখেছি। আপনি দেখবেন, আমি ফিরবই।

স্বদেশবাবুর এই দৃঢ়তা দেখে ভাল লাগল খুব। কিন্তু এও জানি, ফিরলে দুটো জীবনের মধ্যে এক বিশাল অসঙ্গতিজনিত অসুবিধেও তাঁকে পোহাতে হবে। মাত্র গত বছরই স্বদেশে ফিরে আসা এক ভদ্রলোককে ফের আমেরিকায় প্রস্থান করতে দেখলুম! তাঁর আক্ষেপ ছিল, এদেশে কাজ করার সুযোগই যে পাই না।

যাঁরা কাজ করতে চান, কাজ ভালবাসেন ভারতবর্ষে তাঁরাই সবচেয়ে বড় ধাক্কা খান। আর আমেরিকা কাজের মানুষ দেখলে কোলে তুলে নেয়, খুলে দেয় হাজারো সম্ভাবনার দরজা। তা ছাড়া আরও উন্নত হয়ে ওঠার জন্য পড়াশুনা এবং গবেষণার ঢালাও ব্যবস্থা। এমনকি জড়বুদ্ধি বা পঙ্গুদেরও পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার নেই। তারাও যাতে কাজ করে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে পারে তারও ব্যবস্থা করেছে আমেরিকা। ওয়াশিংটনে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের ছেলেটি রিটার্ডেড। কিন্তু সেও চাকরি করে, উপার্জন করে। এসব দিক দিয়ে আমেরিকা এক মহান দেশ। অভ্যন্তরে তার নরকও আছে বটে. কিন্তু প্লাস পয়েন্ট অনেক বেশি।

এই আমেরিকার হাতছানিতে আমার স্বদেশের কত মানুষ যে মোহগ্রস্ত হয় তার ঠিকানা নেই। আর এই হাতছানির মারাত্মক কুফলও কতজনকে পোয়াতে হয়।

আমার এক গুরুভাই মার্কিন নাগরিক। তাঁর মেয়েটি বিবাহযোগ্যা হওয়ায় তিনি স্বদেশে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পাত্র চাইলেন। দেশে পাত্রের অভাব হয় বটে, কিন্তু মার্কিন নাগরিক মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ভাল ভাল পাত্র হামলে পড়ে। সুতরাং এই মেয়েটির জন্যও অনেক পাত্রপক্ষের দরখাস্ত জমা পড়ল। ভদ্রলোকের স্ত্রী পাত্র যাচাই করতে কলকাতায় এলেন। অনেক দেখেশুনে একটি পাত্র পছন্দও হল। কিন্তু মুশকিল হল, ঠাকুরবাড়ি থেকে এই সম্বন্ধ অনুমোদন পেল না। তাঁরা পাত্র নাকচ করলেন। তখন কিন্তু পাত্রপক্ষ দমলেন না। তাঁরা ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে লাগলেন, কেন, আমাদের ছেলে তো ফেলনা নয়। ইলেকট্রিকাল ইনজিনিয়ার। দেখতে শুনতেও ভাল...ইত্যাদি।

পাত্রপক্ষের এত আগ্রহ দেখে সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডাবে? সুতরাং অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েও তাঁরা অবশেষে সেই পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন।

এই বিয়ের ফল যে কী মারাত্মক হল তা আজ মেয়েটির মুখের দিকে একবার তাকালেই যে-কেউ বুঝতে পারবেন।

পাত্রপক্ষের আগ্রহাতিশয্যে এবং চাপাচাপিতে এঁরা বিয়ের প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন, বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রী যেহেতু মার্কিন নাগরিক, সুতরাং জামাই বাবাজীবনের মার্কিন দেশে প্রস্থানের পথ খুলে গেল। তার অবশ্য ইনজিনিয়ারিং ডিগ্রিও একটা ছিল। আমেরিকায় যাওয়া আগে পর্যন্ত জামাই এবং তার বাড়ির লোকজন পাত্রীপক্ষের সঙ্গে অতিশয় বিনীত ও অমায়িক ব্যবহার করত। আমেরিকায় গিয়ে জামাইটি কিছুদিনের চেষ্টায় যখন ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ ডি করার সুযোগ পেল, এবং ভদ্রগোছের বৃত্তি জোগাড় করে ফেলল তখনই নির্মোক ঝেড়ে ফেলে দেখা দিল তার স্বরূপ। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-দম্পতিদের থাকবার ব্যবস্থা আছে। সেই কোয়ার্টারেই তারা ছিল।

জয়ন্তী অর্থাৎ সেই মেয়েটি বলল, প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহারই করত। তবে আমি কেন যেন টের পেতুম যে, কেমন একটু কাঠ কাঠ ভাব। আন্তরিকতার অভাব। এটা বিয়ের পরে কলকাতার ঘটনা। যে-ই এখানে এসে ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেল সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টে গেল। কোয়ার্টারের আমাদের প্রথম রাত্রেই সামান্য কারণে খুব তেজ দেখাল। কথাবার্তায় কোনও শালীনতাই নেই। আমি ভীষণ চমকে গেলুম। পরদিন ফোনে বাবা-মাকে বললুম, লোকটা যে ভীষণ রাগী, ওঁরা বললেন মানিয়ে নিতে। মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি ফল উল্টো

হচ্ছে। আরও বেশি রেগে যাচ্ছে। রোজ ঝগড়া হত। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এমন অবস্থা হল যে, আমি মা-বাবার কাছে চলে এলুম। বাবা সব শুনে ছুটলেন জামাইকে বোঝাতে। একটা আপসরফার মতো হল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলুম, লোকটা সুবিধের নয়। ঠিক স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারছি না।

সাধারণত বাঙালি মেয়েরা স্বামী হিসেবে যাকে গ্রহণ করে তাকে আর অন্য চোখে দেখে না, অর্থাৎ ভাল হোক মন্দ হোক স্বামী বলেই তাকে মেনে নেয়। তুমি যে মানলে না সেটা কি তোমার মার্কিন শিক্ষার প্রভাব?

জয়ন্তী সবেগে মাথা নাড়ল, শিক্ষা মার্কিন হলেও আমার মা-বাবা আমাকে বাঙালি মতেই মানুষ করেছেন। তবে আমেরিকার আত্মমর্যাদাবোধ বা ব্যক্তি স্বাধীনতার পাঠ তো বৃথা যায়নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, লোকটা যে ধান্দাবাজ এবং আমাকে দিয়ে যে ওর আর কোনও কাজ নেই সেটা বুঝতে আমাকে মাথা ঘামাতে হয়নি।

তুমি আবার ফিরে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলুম। লোকটা বলল, আমার সঙ্গে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না। হয়তো লেখাপড়ার সাঙ্ঘাতিক চাপ আর টেনশনের ফলেই এটা হচ্ছে। সুতরাং আপাতত কিছুদিন দু'জন আলাদা আলাদা থাকাই ভাল। মাঝে মধ্যে দেখা হলেই যথেষ্ট।

নতুন বিয়ের পর স্বামীরা সাধারণত এরকম প্রস্তাব করে না। তুমি কী করলে?

প্রস্তাবটা অস্বাভাবিক হলেও স্টপ গ্যাপ হিসেবে মেনে নিলাম।

একটা কথা বলি, লোকটাকে তোমার কেমন লাগত—মানে তুমি তাকে ভালবেসেছিলে কি না!

সেটা বলা শক্ত। তবে আমি তো চেষ্টা করেছি।

অর্থাৎ ওর ঘর করায় তোমার আগ্রহ ছিল?

ছিল। ভেবে দেখলাম, আমেরিকায় পি-এইচ ডি বা ওরকম সব কোর্সে পড়াশুনোর সত্যিই এত প্রেশার থাকে যে, বাইরের ছাত্ররা এসে হিমশিম খায়। রাত জেগেও কূল পায় না। অমানুষিক খাটুনি।

আমাদের দেশে তো কই এরকম শুনি না।

এখানে অন্যরকম। ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। কোনও দিনই একটি ঘণ্টার সময়ও অপচয় করা যায় না। বিশেষ করে প্রথম দিকে।

বুঝেছি।

সেসব কনসিডার করে আমি লোকটার প্রস্তাব মেনে নিয়ে মা-বাবার কাছে চলে এলুম। মাঝে মাঝে ফোন করতুম, তাছাড়া আর কোনও যোগাযোগ ছিল না।

সে‌ও কি মাঝে মাঝে ফোন করত ?

না। কক্ষনো না। এসব কারণে আমার নানারকম সন্দেহ হতে লাগল। তারপর দুম করে একদিন ডিভোর্সের মামলা করে বসল।

বোধহয় গ্রিনকার্ড পাওয়ার পর ?

হ্যাঁ। আর শুধু তা-ই নয়, দেশ থেকে আমার এক মামাতো দাদা খবর নিয়ে জানাল যে, ওর একজন প্রেমিকা আছে। তার সঙ্গে একটা বন্দোবস্তও হয়ে আছে।

তরা মানে ?

তার সরল মানে হল, আমার সঙ্গে বিয়েটা নিতান্তই প্ল্যানমাফিক। ডিচ করবে বলে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। আমি শুধুমাত্র খেলার পুতুল।

কেঁদো না জয়ন্তী।

কিভাবে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল দেখুন। কী বিশ্রী নিষ্ঠুরভাবে লোকটা ডিভোর্স করল। তারপর নির্বিকারভাবে গিয়ে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে এল।

তুমি ডিভোর্স দিলে ?

না দিয়ে কী করব ? আমার মা-বাবাও ভাল মানুষ, তাঁরাও বুঝলেন বিয়েটা ভুল হয়ে গেছে। ডিভোর্স না দিলে আরও অশান্তিই হত। বিয়ে তো কিছুতেই টিকত না।

লোকটা এখনও এখানেই আছে তো !

দিব্যি আছে। পাস-টাস করে চাকরি করছে। বাড়ি-টাড়ি করেছে।

তোমার সঙ্গে আর— ?

না, আর কোনও সম্পর্ক বা যোগাযোগ হয়নি। আমেরিকায় ঢুকে পড়ার অবলম্বন হিসেবে আমাকে দরকার ছিল। আমরা বড্ড বোকা তো ? যে-ই বুঝল কাজ ফুরিয়েছে অমনি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ওর মা-বাবাকে ব্যাপারটা জানিয়েছো ?

আপনি কি ভাবেন ওর মা-বাবার অজান্তে এটা ঘটেছে ? এই ষড়যন্ত্রে ওরাও ইনভলভড। খুব ভালভাবে জেনেশুনে ওরা সবাই মিলে এই কাণ্ডটা করেছিলেন।

একটা পরিবারের সবাই এত খারাপ হয় কী করে ?

সেটা নিয়েই তো আমরা ভাবি। একজন নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ করার পরিকল্পনা সবাই মিলে করতে পারে কী করে ? আমার মনে হয়, উচ্চাশা আর লোভ মানুষকে অনেক নীচে টেনে নামাতে পারে।

সে কথা অবশ্য ঠিক। তবু আমি ভাবছি কেউ না কেউ তো তোমাদের একটা ওয়ার্নিং দিতে পারত।

দেশে থাকলে হয়তো দিত। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শী অফিসের সহকর্মী

এদের কাছে খোঁজ খবরও করা যেত। কিন্তু এত দূরের পাল্লায় আর সেটা ঠিকমতো হয়ে ওঠেনি। মা-বাবাও আমার বিয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিলেন।

এখন কি করবে জয়ন্তী ?

কী করব ? তা তো জানি না।

শুনেছি, তুমি আজকাল ভারি নন-কমিউনিকেটিভ হয়ে গেছ। মা-বাবার সঙ্গে ভাল করে কথা বলো না।

নন-কমিউনিকেটিভ হলে আপনার সঙ্গেও বলতুম না। মা-বাবার ওপর আমার একটা রাগ আছে। ওঁদের উচিত ছিল ঠাকুরবাড়ির নির্দেশ মেনে নেওয়া এবং আরও ভাল করে খোঁজ খবর করা। সেটা করেননি বলেই আমার আজ এই অবস্থা।

তুমি কি আবার বিয়ের কথা ভাববে।

আবার ! পুরুষ জাতটার ওপরেই যে লোকটা আমার ঘেন্না ধরিয়ে দিল। ওসব বলবেন না।

একা থাকবে ?

বলতে পারি না। আমার কোনও প্ল্যান-ট্যান নেই। পড়ছি, কিছুদিন পরে চাকরি নেবো। তারপর কী করব জানি না।

তোমার কি মাঝে মাঝে মনে হয় এর চেয়ে একটি আমেরিকান ছেলেকে বিয়ে করলেই ভাল হত ?

একদিক দিয়ে হত। আমি আমেরিকায় জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি। আমার মানসিকতার সঙ্গে একটা আমেরিকান ছেলের মানসিকতাব অনেক মিল। হয়তো তাতে এর চেয়ে বেটার হত। কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে তো কিছু বলা যায় না। বিয়ে জিনিসটাই ভারি গণ্ডগোলের।

তুমি বহুকাল আমেরিকায় আছো, কখনো ডেটিং করেছো এখানে ?

না। আগেই তো বলেছি, আমি নিকষ্যি বাঙালি মতে মানুষ।

ডেটিং ছাড়া নাকি এখানে চলে না !

চলে না এমন নয়। তবে ডেট না করাটা এখানে অস্বাভাবিক। তবু আমি সেই অস্বাভাবিক আচরণই করে এসেছি।

এখানকার কোনও ছেলের সঙ্গে তোমার কখনও ভাব হয়নি ?

হবে না কেন ? অনেক হয়েছে। তবে রেসপেকটেবল ডিসট্যান্স বরাবর রাখতে চেষ্টা করেছি। এখানেও কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। এখানে মেলামেশা অনেক হয় বটে, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা কঠিন।

হ্যাঁ, সে কথা শুনেছি। কিছু মনে কোরো না, আর একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন করব ?

করুন না, আমার আর কোন প্রসঙ্গেই অস্বস্তি হয় না।

বলছিলাম, আমেরিকায় মানুষ হয়ে একটি বাঙালি দেশী ছেলেকে বিয়ে করতে তোমার কোনওরকম আপত্তি হয়নি ? কোনও মানসিক বাধা অনুভব করোনি ?

না। ভেবেছিলাম, আর পাঁচটা ছেলেও তো দেশ থেকে এসে দিব্যি এখানে মানিয়ে নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এদেশে এসে তারা রীতিমতো সুনামের সঙ্গেই কাজ করে। কালচারাল ডিফারেন্সটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওসব ডিফারেন্স সহজেই মিটে যায়। এশিয়াবাসীরা বরং আমেরিকানদেরই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। তারা লেখাপড়ায় ভাল, ব্রাইট, খুব অ্যাকোমোডেটিভ। সুতরাং দেশের ছেলে বলে আমার কোনও আপত্তি ছিল না।

বলতে নেই, জয়ন্তীর চেহারা যথেষ্ট ভাল, স্বভাবটিও চমৎকার। তবু তাকে একটা দুর্বহ দুর্ভাগ্যের ভার বহন করে যেতে হবে। আর এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তার কোনও সহজ সমাধানও নেই।

বঙ্গ সম্মেলনের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে সম্মেলন চলাকালীনই দূরের যাত্রীরা একে একে বিদায় নিচ্ছিলেন। সম্মেলন চলবে রাত অবধি। আজ রাতেই মোটামুটি সবাই স্বস্থানে ফিরে যাবেন। কাল থেকে অফিস, কাজকর্ম, সংসার।

ফিলাডেলফিয়ার সুশীলদা বলে রেখেছিলেন, আমরা দুপুর নাগাদ বেরিয়ে পড়ব। তৈরি হয়ে চলে আসবেন।

সেই কথামতো আমি হোটেল থেকে ব্রেকফাস্টের পরই চেক আউট করে র‍্যারিটান ভ্যালি কলেজে বঙ্গ সম্মেলনে চলে এসেছি স্যুটকেস নিয়ে। সকালের অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পরই সুশীলদা আর পূর্ণিমা বউদি এসে তাড়া দিয়ে গেলেন। কিন্তু বেরোবো বললেই কিন্তু বেরোনো হয় না। বন্ধু মানুষ কথা বলতে চাইছেন। কথাও তো কত। শেষ নেই।

কিন্তু সুশীলদার দেরি করলে চলবে না। প্রায় আড়াইশো মাইল পথ। যেতে যেতে রাত হয়ে যেতে পারে।

আমেরিকায় এসে অবধি আমাকে প্রায় যাযাবরের জীবন কাটাতে হচ্ছে। আজ এখানে তো কাল সেখানে। সব নেমন্তন্ন গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তত সময় হাতে নেই। তবু তার মধ্যেই যে সব আমন্ত্রণ নিতে হচ্ছিল তাতেও ছোটাছুটি কিছু কম হচ্ছিল না।

বিকেল চারটে নাগাদ ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম তিনজনে। সুশীলদার ভোলভো গাড়িখানা একেবারে আনকোরা নতুন। সদ্য ত্রিশ হাজার ডলারে কিনেছেন। এখানে সব স্বামী-স্ত্রীই গাড়ি চালান। দুর্লভ ব্যতিক্রমের মধ্যে একজন হলেন পূর্ণিমা বউদি। তিনি গাড়ি চালানো শেখেননি। আর একজন হলেন

নিউইয়র্কের যামিনী মুখার্জি। যামিনীদা বার কয়েক ড্রাইভিং পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারেননি। অথচ তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ সুমিত্রা বউদি দিব্যি গাড়ি চালিয়ে বেড়ান।

আমি আর সুশীলদা সামনে। পূর্ণিমা বউদি পিছনে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরে বসে তিনজনে আড্ডা মারতে মারতে দিব্যি চলেছি। একেবারেই অপরিচয়ের কোনও দূরত্ব অনুভব করছি না। নিউ জার্সি ছাড়িয়ে পেনসিলভানিয়ায় ঢুকবার মুখে একটা গ্যাস স্টেশনে কিছুক্ষণ থামতে হল। কি জানি কেন গ্যাস স্টেশনটির পরিবেশ আমার ভারি ভাল লাগছিল। গাড়ির ভিড় ছিল বলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেখানে। নেমে কিছুক্ষণ চারিদিকটা ঘুরে দেখলুম আমি আর বউদি।

তারপর আবার বিখ্যাত মার্কিন হাইওয়ে ধরে দুধারে প্রকৃতির অঢেল সম্পদের ভিতর দিয়ে আমেরিকার পূর্বতন রাজধানী ফিলাডেলফিয়ার দিকে এগোতে লাগলুম।

আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাস তো কিছু নেই, তাই তার সর্বাঙ্গে একটা নতুনত্বের ছাপ আছে, ঐতিহ্যের গন্ধ নেই। এই ইতিহাস-বিহীনতার জন্যই আমেরিকা দেশটা অনেকের পছন্দ নয়। এই নবীন দেশে তুলনামূলকভাবে প্রাচীন শহরগুলির একটি ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্কের মতো জমজমাট, ভিড়াক্রান্ত শহর নয়। কিন্তু বেশ বড় শহর। অনেকটা ছড়ানো। লনটন স্ট্রিটে সুশীলদার বাড়িতে যখন পৌঁছোলাম তখনও বেশ ঝকঝকে রোদ রয়েছে।

সুশীলদা একসময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু কর্মজীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে বিদেশে অধ্যাপনা করে। কখনও ব্রিটেনে, কখনও ইওরোপে, কখনও বসরায়, কখনও আমেরিকায়। বিশ্বব্যাপী তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে রয়েছে। নানাদেশী ছাত্র। কিন্তু সুশীলদাকে কোনও বিদেশিয়ানা স্পর্শই করেনি। নির্ভেজাল আড্ডবাজ বাঙালি, ভারি সুরসিক। পূর্ণিমা বউদিও ফর্মালিটিমুক্ত, ঘরোয়া মহিলা।

যে কোনও উন্নত অর্থনীতির দেশেই নিজের ঘরকন্নার কাজ নিজেকেই করতে হয়। বাসন মাজা, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়া, রান্না করা, ঘর গোছানো, কাপড় কাচা, ইস্তিরি করা সব কিছুতেই আত্মনির্ভরশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেও বউদিকে দেখলুম তৎক্ষণাৎ হাতাখুন্তি ধরতে হল, সুশীলদাও নানারকম সাহায্য করতে লেগে গেলেন, ছেলে মিতুলও হাত লাগিয়ে ফেলল। আমি বললুম, তাহলে আর আমাকে বাদ দিচ্ছেন কেন ? দিন কিছু কাজটাজ করে দিই।

ওঁরা খুব হাসলেন।

সুশীলদা তাঁর বাড়িতে ছোটোখাটো একটি সাহিত্যসভার আয়োজন করে

রেখেছেন। আজ সন্ধেবেলা অনেকেই আসবেন। ঘন ঘন টেলিফোনও আসছিল। সভা বা জমায়েত আমার খুব প্রিয় ব্যাপার নয়, পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি, কিন্তু এখানে এ ধরনের জমায়েতের প্রতি আমার ততটা মানসিক প্রতিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রবাসী বাঙালিদের সম্পর্কে জানবার আগ্রহ প্রবল। তাছাড়া আমেরিকার বাঙালিদের সঙ্গে মিশে আমার বেশ ভালই লেগেছে। মোটামুটিভাবে দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁরা সকলেই বেশ ঘরোয়া, ভদ্র, বিনয়ী, মিশুকে।

সন্ধে হতে না হতেই জমায়েত শুরু হল। একে একে হাজির হতে লাগলেন অতিথিবৃন্দ। অনেকেই সস্ত্রীক। এঁদের কয়েকজনকে অবশ্য বঙ্গ সম্মেলনেই দেখেছি। আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। যাঁরা অচেনা তাঁদের সঙ্গেও লহমায় অপরিচয়ের ভেদরেখা ঘুচে গেল।

কোথায় আমি তাঁদের কথা শুনব, না তাঁরা ধরে বসলেন আমার কথা শুনবার জন্য। আমি বললুম দেখুন, আমার কথা তো অনেক হয়েছে। বরং আপনাদের প্রবাসী জীবনের কথা বলুন, তাতেই আমার লাভ হবে বেশি।

তাঁরা যা বললেন তার অস্যার্থ হল আমাদের জীবনে তেমন কোনও নতুনত্ব নেই। আপনি কুম্ভমেলার অভিজ্ঞতার কথা বলুন, আমরা শুনতে চাই।

কারপেটে, চেয়ারে, সোফায় সবাই ভারি জমিয়ে বসা গেল। কলকাতায় এ সব আসরে সাধারণত মদ-টদ যুক্ত হয়। এখানে এরকম আসরে এক আধ জায়গায় ছাড়া কোথাও মদ পরিবেশিত হতে দেখিনি। জিজ্ঞেস করে জেনেছি যে, মদ্যপানের অভ্যাস খুব কম লোকেরই আছে। যাঁরা মদ্যপান করেন তাঁরাও করেন মাত্রা রেখে। সুশীলদার বাড়িতে সফট ড্রিংকস, কফি, চানাচুর এবং অন্যান্য খাবার প্রচুর ছিল, ধূমপায়ী কেবল আমি। অতগুলো মানুষের মধ্যে আর কেউ ধূমপায়ী নন।

আমি কথা শুরু করতেই ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। প্রত্যেকেই মনোযোগী, উৎকর্ণ, প্রায় ঘণ্টাখানেক বকবক করার পর নিস্তব্ধতা ভাঙল, শুরু হল সাইড টক্স।

সুশীলদা একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, ওকে দেখে রাখো। ভারি ট্র্যাজিক ঘটনা, তোমাকে পরে বলব।

কে মেয়েটি ?

আমারই এক ছাত্রের স্ত্রী। দুজনেই ভারি ভাল। যেমন ছেলেটি, তেমনই এই মেয়েটি। কিন্তু কি কারণে যে ছেলেটি একে ছাড়ল তা কেউ ভেবে পাচ্ছি না।

ছেলেটি কী বলে ?

সে কেবল বলে, আমি পারছি না।

আগে ছিল না, কিন্তু আজকাল আমেরিকার বিভিন্ন শহরে হিন্দু-মন্দির

হয়েছে। আছে রামকৃষ্ণ মিশন আর অবশ্যই ভক্তিবেদান্তস্বামীর ইসকন মন্দির। প্রবাসে ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের তৈরি হিন্দু মন্দিরগুলির বেশির ভাগ উদ্যোক্তাই ধনী গুজরাতি বা অন্যান্য প্রদেশের মানুষ। হিন্দু-মন্দিরে নানা দেবদেবীর সহাবস্থান রয়েছে, আছেন নানা মহাপুরুষ চিত্রার্পিত হয়ে। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় বা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকদের জন্য আলাদা আলাদা মন্দির করা কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। তাই বিদেশে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সংহতি। তাতে ফলটা ভালই হয়েছে। শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব সব এককাট্টা হতে পেরেছেন।

ভক্তিবেদান্তস্বামী সম্পর্কে আমার জ্ঞান এত কাল ভাসা-ভাসা ছিল। তিনি আমেরিকায় এসেছিলেন বেশ প্রবীণ বয়সে এবং নিছক ভক্তি ও নিষ্ঠা সম্বল করে। তারপর কয়েক বছরে তিনি ইসকন আন্দোলনকে কোন জাদুমন্ত্রবলে এক বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছেন। কলকাতায় ইসকনের সাহেব সাধুদের হামেশাই পথেঘাটে দেখা যায়। মায়াপুর এখন তাঁদের দৌলতেই এক দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠেছে। এটুকু আমার জানা ছিল।

কিন্তু আমেরিকায় এসে ইসকনের মন্দির দেখে আমার চৈতন্যোদয় হল। ভক্তিবেদান্তস্বামী যা করেছেন তা কেবল হুজুগের ব্যাপার নয়। কৃষ্ণভক্তিকে তিনি গভীরে সঞ্চার করতে পেরেছেন। কতখানি ভক্তি, নিষ্ঠা আর মনের জোর থাকলে আমেরিকার মতো দেশে এ কাণ্ড ঘটানো যায় সেটা ভেবে ভারি অবাক হয়েছি।

সুশীলদা আর পূর্ণিমা বউদি আমাকে বার বার ফিলাডেলফিয়ার ইসকন মন্দিরে যাওয়ার কথা বলছিলেন। আমি একটু অবাক হচ্ছিলাম। এত জায়গা আছে দেখবার, তা ফেলে ইসকন মন্দিরে যাওয়ায় দরকার কি ? আমি ঘরের কাছে মায়াপুরেও কখনও যাইনি।

বউদি বললেন, চলেন না, সাহেব সাধুদের দেখলে ভালই লাগবো। পরিবেশটাও ভাল।

তাঁদের আগ্রহ দেখে বললুম, তাহলে চলুন।

সেদিন সকালে আমাদের লক্ষ্য হল আটল্যান্টিক সিটি। এই নবোদ্ভিন্ন শহরটি তৈরি হয়েছে মরুশহর লাস ভেগাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে। লাস ভেগাসের জগৎ-জোড়া খ্যাতি তার জুয়ার আড্ডার জন্য। পূর্ব উপকূলে তেমনই ঐশ্বর্যময় চোখ-ধাঁধানো আটলান্টিক সিটি তার হাজারো জুয়ার হাতছানি নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে।

অনেকেই আমাকে বলেছিল, পারলে আটলান্টিক সিটিটা একবার দেখে যাবেন। দারুণ করেছে।

সুশীলদাও এরকমই বলেছিলেন, আরে চলো হে, ফুর্তির জায়গাটা দেখে যাও। খুব কাছে।

সকালবেলাতেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমেই শহরের একান্তে ইসকনের মন্দিরে যাওয়া হল। বাইরে থেকে মন্দিরের চাকচিক্য বা মন্দিরের আকৃতি কিছুই তেমনি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। একটা পুরনো বাড়ি কিনে মন্দির বানানো হয়েছে। সামনে একটু ঘেরা লন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছোটো একখানা ঘর। দ্বার অবারিত। এক জায়গায় জুতো খুলে রাখার লিখিত নির্দেশ। একটা করিডোর পেরিয়ে নগ্নপদে যখন মন্দিরে ভিতরে ঢুকলুম তখন প্রথমেই ধূপকাঠি আর চন্দনের মিশ্র গন্ধে মনটা ভারি প্রসন্ন হয়ে গেল।

ঘরের ভিতরকার দৃশ্যটিও মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো। শ্বেতাঙ্গ শিখাধারী ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা সাধু গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। শুনছেন শাড়ি ও ধুতি পরা জনা পনেরো শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও মহিলা। প্রত্যেকেরই রসকলি রয়েছে। স্নাত পবিত্র চেহারা। দু তিনটি শিশুকে দেখলুম, বছর তিন-চার বয়স, তাদের পরনে ধুতি গায়ে পাঞ্জাবি। দু-তিন জন মহিলা বসে ফল-টল কাটছেন।

ঘরের একদিকে টানা লম্বা বিগ্রহের কাঠের আসন। তাতে রাধাকৃষ্ণ ছাড়াও রয়েছে জগন্নাথদেবের মূর্তি। বিগ্রহের মুখোমুখি ঘরের অন্য প্রান্তে ভক্তিবেদান্তস্বামীর ব্রোনজ মূর্তি। সেই মূর্তি এত জীবন্ত যে মনে হয়, এখনই বুঝি চোখের পাতা পড়বে।

বিদেশী ভক্তদের মাঝখানে একজন মাত্র বাঙালি চেহারার মানুষকে দেখলুম। তবে তাঁর সঙ্গে কথা হল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ইংরিজিতে গীতা পাঠ ও তাঁর ব্যাখ্যা শুনলুম। এই পাঠ ও ব্যাখ্যার ভঙ্গির মধ্যে বিন্দুমাত্র পেশাদারি ভাব নেই। ভক্তিময় তদ্‌গত ভাব আছে।

আমাদের প্রবেশ ও উপবেশন কোনও বিক্ষেপ সৃষ্টি করল না। গীতা পাঠ যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। আমেরিকা ঐশ্বর্যের দেশ বটে, এবং আজ পর্যন্ত আমি যত বাড়িতে গেছি প্রত্যেক বাড়িতেই কিছু না কিছু বিলাসদ্রব্য ও মহার্ঘ আসবাব এবং জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি দেখেছি। ফিলাডেল-ফিয়ার এই মন্দিরের বহিরঙ্গটি কিন্তু প্রায় নিরাভরণ। পরিচ্ছন্নতা আর ভক্তি ভাবটিই এর সম্বল। তাই যেন এক স্বদেশীয় পরিমণ্ডলে বসে আছি বলে মনে হচ্ছিল।

এই মন্দিরে প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের হাতে তত সময় নেই। সুতরাং আধ ঘণ্টার মতো বসে থেকে আমরা উঠে পড়লুম।

পরে ওহাইয়ো রাজ্যে ইসকনের আরও একটি মন্দির দেখার সুযোগ এসেছিল। তনুশ্রী আর প্রভাত দত্ত আমাকে খুব নিয়ে যেতে চেয়েছিল সেখানে। সময় করে উঠতে পারিনি। কিন্তু সেই মন্দিরটির ছবি আমি দেখেছি, খ্যাতিও কানে এসেছে। কালো জেড (সম্ভবত) পাথরের তৈরি এই মন্দিরটির সর্বাঙ্গে খাঁটি সোনার পাতের শিল্পকর্ম রয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরের সূক্ষ্ম কারুকাজও দেখবার মতো।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈল্পিক নির্মাণ হিসেবে এটি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। একটি নাতিউচ্চ পাহাড়ের ওপর বিশাল প্রান্তর জুড়ে এর এলাকা। সাহেব বৈষ্ণবরা যে যত্নে ও ব্যয়ে এটি তৈরি করেছেন এবং যে সতর্কতায় এটির পরিচর্যা করছেন তাও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার মতো। ওয়াশিংটনেও ইসকনের মন্দিরে আমাকে যেতে হয়েছিল। তবে সেটিতে তখন বেশি লোকজন ছিলেন না। শুনলুম, বাড়িটি সবে কিনে মন্দির করা হয়েছে। ভেঙে আবার নতুন করে গড়া হবে।

আটলান্টিক সিটির দিকে রওনা হওয়ার পর সেখানে কী দেখব সেটা মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলুম। যে কোনও অদেখা জায়গা সম্পর্কেই আমাদের একটা আগুরি কল্পনার ছবি থাকে। প্রায় সময়েই কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের ভারি গরমিল হয়। আটলান্টিক সিটির ব্যাপারেও তা হল। আমি যেমনটি ভেবেছিলুম এ শহর তার চেয়েও অনেকটাই বেশি ঝকমকে। নবিনির্মিত এ শহরের সব নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয়নি।

আমেরিকায় আসবার পর থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম বার বার শুনতে পাচ্ছি। খবরের কাগজেও প্রায়ই ট্রাম্প সম্পর্কে কিছু না কিছু খবর থাকে। রিয়াল এস্টেটের ব্যবসায় এই তরুণ ধনীটি আমেরিকার বাঘা বাঘা পয়সাওয়ালা লোকদের টেক্কা দিচ্ছেন। কাগজে একদিন দেখলুম, ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি ডুবে-যাওয়া কোম্পানি কিনে নিয়েছেন। কেন এই লালবাতি-জ্বালা কোম্পানিটি তিনি কিনলেন তা নিয়ে কাগজে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছে। এই তরুণ কিছু করলেই তা আজকাল খবর হয়ে ওঠে। তার কারণ হাতে ধুলোমুঠি ধরলে তা সোনামুঠি হয়ে ওঠে।

আটলান্টিক সিটিতে ঢুকলেই চোখে পড়বে ট্রাম্প প্লাজা। জায়গা জুড়ে অত্যাধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে প্লাজাটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার হচ্ছে সমুদ্রের ধারে নির্মীয়মাণ হোটেল তাজ। এই গগনচুম্বি হোটেলটি তাজমহলের কিছু আদল নিয়ে তৈরি। যখন সম্পূর্ণ হবে তখন আশেপাশের অন্যান্য অভিজাত হোটেলকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারবে।

আটলান্টিক সিটি যে নতুন তার চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। সব বাড়ি ঘরই নতুন, রাস্তা নতুন। বিশেষ লোকজনের চলাচল নেই রাস্তায়। অর্থাৎ লোকবসতি এখনও তেমনভাবে শুরু হয়নি। ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা পেরিয়ে আমরা শো-বোট হোটেলটা খুঁজছিলুম। শো-বোট সমুদ্রের ধারে অগুন্তি হোটেলগুলির একটা মাত্র। তার কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই। তবু সুশীলদা সেটা খুঁজছিলেন, আরও একবার ওখানে এসেছিলেন বলে। সব মানুষেরই এ-রকম মায়া থাকে। যে-হোটেলে আগের বছর উঠেছিলুম এবারও গিয়ে সেখানেই উঠতে ইচ্ছে করে। যেন আগের বারের অবস্থানটা সেই হোটেলটিকে খানিকটা আমার আপনার করে নিয়েছে।

শো-বোট খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হচ্ছিল, তার কারণ, সুশীলদা যখন এর আগে আটলান্টিক সিটিতে এসেছিলেন তখনকার তুলনায় এখন হোটেলের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। পাল্টে গেছে রাস্তাঘাট।

শো-বোট হোটেলের সাইন অবশ্য শেষ অবধি আমরা দেখতে পেলুম। কিন্তু আমেরিকা তেমন দেশ নয় যেখানে দেখা এবং পৌঁছোনো একই ব্যাপার। এখানে রাস্তাঘাটের এমন কঠিন ব্যবস্থা যে, যে কোনও জায়গা বা ফাঁক দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। ফলে শো-বোট পেরিয়ে অনেকটা গিয়ে টার্ন নিয়ে ঘুরে এসে তবে ঢোকা গেল।

হোটেলের বিশালত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিল্লি বোম্বাইয়ের হোটেলে আটকে আছে। কলকাতায় তাও নেই। বুড়ি গ্র্যান্ড আর হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল— কোনওটাই আহামরি কিছু নয়।

শো-বোট নিশ্চিত এখানকার মধ্যবিত্ত হোটেলগুলোরই একটা। তবু তার বহু টিয়র-বিশিষ্ট পার্কিং লটটিই এত বিশাল বহুতল ও বিস্তৃত যে অবাক মানতে হয়। এই বিশাল পার্কিং লটেও আমরা গাড়ি নিয়ে একটার পর একটা টিয়র পেরিয়ে ওপরে উঠেছি, কোথাও পার্ক করার জায়গা পাচ্ছি না। অবশেষে বোধহয় পাঁচ তলায় একটা জায়গা ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল।

গাড়ি রেখে প্রকাণ্ড লিফটে চেপে আমরা গিয়ে নামলুম শো-বোটের জুয়া-ঘরের দোরগোড়ায়। মস্ত রিসেপশন। তার সামনে একটার পর একটা বিলাসবহুল বাস এসে থামছে, নামিয়ে দিচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। এদের পোশাকে রঙচঙ বড্ড বেশি। এই যৌবনের দেশে কেউ সহজে বার্ধক্যকে মানতে চান না। ফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও যুবক-যুবতীর সাজেই দেখতে পাওয়া যায়। থুড়থুড়ে বুড়িরও ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে মেকআপ। এইসব জুয়ার আড্ডা থেকে নিজস্ব বন্দোবস্তে বাস পাঠিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তুলে আনা হয় বিনা ভাড়ায়। এমনকি কিছু চিপ্‌স্‌ বা খুচরো পয়সাও দেওয়া হয় বদান্যভাবে। সারাদিন অক্লান্তভাবে এরাই স্লট মেশিনগুলো চালু রাখে। সময় কাটানোর সামান্য উত্তেজক খেলা।

শো-বোটের বহিরঙ্গ কেমন হবে তা অনুমানসাপেক্ষ। রিসেপশন হলটিতেই বোধহয় একটা ফুলবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে। আর রকমারি আলোর খেলা বয়স্কদেরও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারে।

জুয়ার ঘরটি এতই বিপুল বিশাল এক হলঘর যে তার যেন শেষ নেই। ঢুকতেই সারি সারি হাজার দেড় দুই স্লট মেশিন। পয়সা খুচরো করার কাউন্টারে গেলে যে-কোনও নোট ভাঙিয়ে কোয়ার্টার করে দেবে। প্লাস্টিকের গ্লাসে সেই খুচরো ভরে কাজে নেমে গেলেই হয়।

শুধু স্লট মেশিন নয়, বুলেট থেকে শুরু করে ব্যাকারাট হাজার রকমের আয়োজন রয়েছে। তাসের জুয়ায় হোটেলের প্রতিনিধি বসে আছেন টেবিলের ওপাশে। তিনিই খেলবেন আপনার সঙ্গে।

সুশীলদা বা আমরা কেউই জুয়াড়ি নই। তা ছাড়া এ ব্যাপারটায় আমার একটু বাধোবাধো ঠেকে। সুশীলদা জোর করে আমার হাতে একটা গেলাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, খেলবে না মানে ? রোমে গেলে রোমান হতে হয় হে। লেগে পড়ো।

ক্যামেরা বা ব্যাগ নিয়ে ঢুকতে দেয় না বলে লবিতে বউদি আমাদের জিনিসপত্র আগলে বসে রইলেন। আমরা দুজনে ঢুকলুম।

সুশীলদা কুড়িটি কোয়ার্টার নিয়ে খেলতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে কুড়িটিই গিলে নিল মেশিন, কিছুই ফেরত পেলেন না।

আমি মেশিন অপারেট করাটা শিখে নিলুম। তারপর পয়সা ঢুকিয়ে লিভার টানলুম। প্রথম কয়েকবার মেশিন কিছুই দিল না বটে। তারপর তিন চার বারে বেশ কিছু কোয়ার্টার পাওয়া গেল। হিসেব করে দেখা গেল, আয় ও ব্যয় প্রায় সমান হয়েছে।

খেলাটা বড় কথা নয়। দেখলুম বেশ কয়েক শো বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অত্যন্ত মনোযোগে খেলে যাচ্ছেন। অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি নেই। খেলুড়েদের যাতে অস্বস্তি না হয় তার জন্য মাঝে মাঝে হলের মধ্যে বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। খিদে পেলে অদূরেই রয়েছে রেস্তোরাঁ। আরকেডে রয়েছে বিশাল শপিং সেন্টার। ব্যবস্থা এত নিখুঁত যে সারাদিন কাটিয়ে দিতে কোনও অসুবিধে নেই।

আটলান্টিক সিটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাবি পেশাদাব বকসিং হয়, খবরের কাগজে প্রায়ই দেখেছি। কিছুদিন আগেই টাইসন এ শহরে লড়াই করে গেছেন। আরও অনেক গুরুতর ব্যাপারও হয়। আটল্যান্টিক সিটি অতএব আমেরিকার শহরকুলে আর ব্রাত্য নেই, জাতে উঠে গেছে। প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই জুয়া।

শো-বোটের স্লট মেশিনে ছেলেখেলা শেষ করে আমরা একটু হলঘরটা ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। আমি আর সুশীলদা মিলে দশ ডলারও খেলিনি। কিন্তু এই হলঘরটিতে হাজার হাজার ডলার নিয়ে কতজন আসে। রোজ হয়তো বা লক্ষ ডলারের আদান-প্রদান ঘটে থাকে। ঘুরে ঘুরে আমরা সাহেব ও মেম জুয়াড়িদের দেখলুম—বেশির ভাগেরই মুখে বিরক্তি ও একঘেয়েমির গাম্ভীর্য। উত্তেজনা নেই। জুয়া মানেই হারজিতের দ্বন্দ্ব দোলায় উত্তেজক আনন্দ। তবু এদের বেশির ভাগেরই মুখভাবে যে সেটা নেই, তার কারণ এটা ওদের লাভ-লোকসানের খেলা নয়, সময় কাটানোর পন্থা মাত্র।

বিশাল হলঘর পেরিয়ে প্রশস্ত করিডোর ধরে এগিয়ে গেলে সামনে সুবিস্তৃত হোটেলের নিজস্ব শপিং আর্কেড। হোটেল বা ক্যাসিনো হিসেবে শো-বোট যে নিতান্তই মধ্যবিত্ত তা তো আগেই বলেছি। তবু এই মধ্যবিত্ত হোটেলের শপিং আর্কেডটি দেখুন, যেন বিশাল ও সম্পূর্ণ একটি দক্ষিণাপণ বা এয়ারকন্ডিশনড মার্কেট। কেউ যদি ইচ্ছে করে তাহলে শুধু এই আর্কেডে ঘুরে ঘুরেই সময় কাটিয়ে দিতে পারে।

বউদি বেছেগুছে একটা গয়নার দোকানে ঢুকলেন। গয়নার ব্যাপারে আমি বাঁশবনে ডোমকানা। সুশীলদাও তাই। তবে বউদি জহুরীর চোখে কিন্তু গয়নাগাটি পরীক্ষা করলেন। আর আমি হীরে জহরত আর ঝুটো গয়নায় ঝলমলে দোকানটির সাজসজ্জা দেখছিলুম। বিশ্বাস হওয়া শক্ত যে, এটি একটি মধ্যবিত্ত হোটেলের শপিং আর্কেডের গয়নার দোকান। তেমন অভিজাত দোকানও নিশ্চয়ই নয়। তবু ফেলে ছড়িয়ে দশ বিশ লাখ টাকার গয়না ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা আছে।

হোটেলের অভ্যন্তরের শীতাতপনিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতেই সামুদ্রিক ভেজা বাতাস আর ঘেমো গরম জাপটে ধরল। সামনেই অগাধ অতলান্তিক, বেলাভূমিতে ধপধপে রোদ, অথচ সমুদ্রের ওপর জমে আছে কুয়াশার জমাট স্তর। দৃশ্যটা দেখবার মতো। এখানে আটলান্টিকের কোনও উচ্ছ্বাস নেই, নেই তরঙ্গাভিঘাত। আমাদের দীঘা উপকূলের চেয়েও শান্ত। তবে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি রয়েছে।

কিন্তু সমুদ্রের তীরকে নাঙ্গা বেলাভূমি হিসেবে ফেলে রাখলে মার্কিন প্রযুক্তির আর কেরামতিটা কী হল ? সুতরাং তাদের উর্বর মস্তিস্কে নানা আইডিয়া খেলতে লাগল, পকেটে চুলকোতে লাগল ডলার। আটলান্টিক সিটিকে তারা এমনই বানাতে চায়, যাতে লোক হকচকিয়ে হাঁ হয়ে যায়। তাই বেলাভূমির ওপর দিকটায় কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ কাঠের তক্তায় তৈরি হল বিখ্যাত বোর্ড-ওয়াক। বিশাল চওড়া ও মসৃণ বোর্ড ওয়াকটির পিছনে কত ডলারের কারসাজি আছে তা আমি জানি না। জেনে দরকারই বা কী ? তবে জিনিসটা ভারি অদ্ভুত। এর ওপর দিয়ে কয়েক মিনিট অন্তর আপ আর ডাউন ট্রলি-বাস চলে। অনেকটা আমাদের ট্রামগাড়ির মতো, তবে চাকা টায়ারের। দুই কামরার এই ট্রলি-বাসটির ভাড়া মাথাপিছু এক ডলার। বেশ আস্তে যায় এবং ঘন ঘন থামে।

এই বোর্ড ওয়াকের একধারে রয়েছে সারি সারি দোকান, গায়ে গায়ে। বেশির ভাগই স্টল। তবে এসব স্টল বা ছোট দোকানও এত সমৃদ্ধ এবং এত এদের স্টক যে, ছোট বলে অবহেলা করা যাবে না।

সুশীলদা নানারকম দুষ্টুমি করে যাচ্ছিলেন। ট্রলি-বাসে আমার পাশে এক মার্কিন যুবতী বসেছেন দেখে টুক করে ছবি তুলে নিয়ে বললেন, দাঁড়াও, এ ছবি

তোমার বউকে পাঠাবো। আমেরিকায় এসে তোমার যে কী পাখা গজিয়েছে তা উনি বুঝবেন। ইস কী ঢলাঢলিটাই হচ্ছে তোমাদের.....

আসলে মেমসাহেব বোধহয় আমাকে কিছু একটা দেখিয়ে একটু হেসেছিলেন, তা মার্কিন মেয়েরা ওরকম কয়েই থাকে। ওদের তো শুচিবাই নেই।

খানিক দূর গিয়েই আমরা নেমে পড়লুম। বেশ গরম লাগছে, ঘাম হচ্ছে। বলা বাহুল্য সামুদ্রিক জলবায়ুর প্রভাবে বেশ চনচনে একটি খিদেও চাগিয়ে উঠছে পেটে।

মনের কথা টের পেয়েই যেন সুশীলদা বললেন, চলো হে, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

এই প্রস্তাবে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি হল না।

কিন্তু এখন লাঞ্চ টাইম বলে প্রত্যেক রেস্তরাঁতেই ভিড়। সমুদ্রতীর মার্কিনদের সাঙ্ঘাতিক প্রিয় জায়গা বলে উইক এন্ডে কোনও সাগরবেলাই শূন্য থাকে না। আটলান্টিক সিটির আকর্ষণ তো আরও বেশি তার জুয়ার আয়োজনের জন্য। সুতরাং গোটা তটভূমিটিই বেশ থিকথিক করছে মানুষে।

আমরা তিনজন একটি রেস্তরাঁয় লাইন দিলুম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই জায়গা পাওয়া গেল।

মার্কিন রেস্তোরাঁয় বা বাইরে যে-কোনও জায়গায় খেতে আমার কোনও আপত্তি হচ্ছে না, তার কারণ একজনের খাওয়া প্লেট বা গেলাস ধুয়ে আর একজনকে খাবার বা জল দেওয়ার প্রথা এখানে একরকম উঠে গেছে। প্লাস্টিকের ট্রেতে খাবার নিন, প্লাস্টিকের গেলাসে জল, সেলোফেনে মোড়া আনকোরা শক্ত প্লাস্টিকে তৈরি কাঁটা-চামচ ছুরি দিয়ে খান, তারপর গোটা বাসনপত্র গারবেজে ফেলে দিন, ল্যাটা চুকে গেল। ব্যাপারটা আমার ভারি মনোমতো। একজনের রোগ থালাবাসন বেয়ে আর একজনের ওপর চড়াও হবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। আমাদের দেশে যেটা আজও আমরা ভাবতে পারি না। তাই হোটেল রেস্তরাঁয় খাওয়া একরকম বন্ধ করেছি।

এই রেস্তোরাঁয় আমার খাদ্য বলতে সেই স্যালাড। গুচ্ছের কাঁচা ছানা (এদের ভাষায় ফ্রেশ কটেজ চিজ), বাঁধাকপির পাতা, নানারকমের সবজি, বীজ, ক্রীম ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে জগাখিচুড়ি করে খাওয়া। বেশ সস্তা এবং একবার দাম দিলে যত খুশি রিফিল নেওয়া যায়। সঙ্গে ঠাণ্ডা সফট ড্রিংকস ছিল। এই খাদ্যের একটাই মুশকিল, বেশিক্ষণ পেটে থাকে না। একটু বাদেই আবার খিদে পেয়ে যায়।

খাওয়ার পর সুশীলদা বললেন, চলো হে একটু বীচটা ঘুরে আসবে। আসল জায়গা তো ওইটেই।

বলে একটু চোখ টিপলেন।

বিস্তীর্ণ সী-বীচে বিকিনির-পরা শয়ে শয়ে মহিলা রোদ পোয়াচ্ছে। পুরুষে সংখ্যা তুলনায় কম। সুশীলদা সাবধান করে দিলেন, একটু দেখেশুনে হেঁটো, কো মেয়ের গায়ে আবার হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

তা সে ভয়ও আছে। প্রতি পদক্ষেপেই তেনারা প্রায় উদোম হয়ে প আছেন। ধূসর বালির ওপর নানা রঙের বিকিনির হাট। ধৈর্যেরও বলিহারি যে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে ওই শুয়ে থাকা তো সোজা কষ্ট নয়। গা গলায়, দাঁতে বালি কিড়কিড় করে, ভেজা গায়ে রোদ লেগে গা চিড়বিড় ক তবু ধৈর্যশীলা তেনারা পড়ে আছেন স্থির হয়ে।

সুশীলদা আমাকে যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে দ্রুত ক্যামেরা বাগিয়ে পটাপ ছবি নিচ্ছিলেন।

দাঁড়াও, এসব ছবি দেশের লোকের হাতে যাক, তারা বুঝবে তুমি কেম সংযমী পুরুষ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের তাজমহল হোটেলটির সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তাকি রইলুম। সবে সুপার স্ট্রাকচারটি শেষ হয়ে কিছুদূর উঠেছে বাড়িটি। কিন্তু এ উচ্চতা আর বিশালত্ব এতই বড় মাপের যে দশটা তাজমহল তাতে এঁটে যায় সুখের কথা, আমাদের অনন্য তাজমহলের নকল করেই কিছু কিছু কারুকার্য এ সংযোজিত হচ্ছে। আর নামটিও ভারতবর্ষ থেকে ধার করা।

আটলান্টিকে নেমে স্নান করার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তার জন্য বাড় পোশাক বা তোয়ালে আনা হয়নি। আমার সমুদ্রে স্নান করার ভীষণ নেশা আছে পুরী গোপালপুর দীঘা তো বটেই। এমনকি কন্যাকুমারিকায় ঝামার মতো পাথু জায়গায় নেমে স্নান করেছি, অনেকে বারণ করা সত্ত্বেও। ঢেউয়ের ধাক্কায় প গিয়ে পায়ের ছাল উঠে রক্তপাত হয়েছিল। তবু ছাড়িনি। আটলান্টিকের নী জলের হাতছানি এড়াতে পারছিলুম না। কিন্তু উপায়ই বা কী? অগত্যা গি সন্তর্পণে অতলান্তিকের জল একটু স্পর্শ করলুম।

তটভূমিতে হাজারো পড়ে থাকা মনুষ্যদেহের ফাঁকে ফাঁকে কিছুক্ষণ ঘু বেড়ালুম। তারপর বোর্ড ওয়াক ধরে আরও অনেকটা উজেন-ভাঁটেন করা গেল বউদি এই ধকলে এবং গরমে ও ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে তাঁ উৎসাহের কোনও খামতি নেই। আটলান্টিকের তটরেখা বরাবর প্রভূত ঐশ্বর্যে বিশাল প্রদর্শনীর মতো আটলান্টিক সিটি এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধা দ্রষ্টব্য স্থান কেন হয়ে উঠেছে তা ক্লান্ত পায়ে পায়ে ঘুরে ঘুরে আমরা আবিষ্কা করছিলুম। সমুদ্রের ধারে বলে বাতাসের আর্দ্রতা বেশি, ভীষণ গুমোটও বটে শরীরকে ভুলিয়ে দেওয়ার মতো আয়োজন অবশ্য এ শহরের আছে।

স্যান্ডস হোটেল অ্যান্ড ক্যাসিনো আর এক বিশাল ও বহুতল হোটেল। শো-বোটের চেয়ে আভিজাত্যে কয়েক ধাপ ওপরে। বেলাভূমি থেকে হোটেলটি অন্তত আধ কিলোমিটার অভ্যন্তরে। তাতে কী? অভ্যাগতরা যাতে বেলাভূমি থেকে সহজে হোটেলের লবিতে পৌঁছতে পারেন তার জন্য সুচারু ও অভিনব ব্যবস্থা করে রেখেছে স্যান্ডস্। বোর্ড ওয়াকের পাশেই স্যান্ডসের সাইনওয়ালা একটা কাচের ঘর। তাতে ঢুকে পড়লেই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরে শরীর জুড়োবে। সামনেই এসকালেটর। দোতলা সমান উঠে সেই এসকালেটরই হয়ে গেছে চলন্ত পথ। কাচের করিডোরের ভেতর দিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে থেকেই আপনি চলে যাচ্ছেন ভিতরে। তবে এক একটা এসকালেটরের পাল্লা খুব বেশি নয় বলে বার তিনেক এসকালেটার বদল করতে হবে। তারপর সোজা গিয়ে নেমে পড়বেন স্যান্ডসের লবিতে। সেই লবিতে ট্যাক্সিডার্মি করা জীবজন্তু, ভিডিও গেমস থেকে শিশুদের মনোরঞ্জনের যেমন আয়োজন আছে, তেমনি আছে রেস্ট রুম থেকে শুরু করে বিশাল শপিং আর্কেড।

স্যান্ডস ঘুরে দেখতে আরও কিছু সময় ব্যয় করা গেল। কিন্তু সুশীলদার গাড়ি পার্ক করা আছে শো-বোটে। সেটা বেশ খানিকটা দূরে। তত দূর এই গরমে আর তাঁরা হাঁটতে চাইছিলেন না। স্যান্ডস থেকে বেরিয়ে সুশীলদা একটি ট্যাক্সি ডাকলেন।

আমেরিকায় এসে আমি গাড়িতে মেলা ঘুরেছি বটে, কিন্তু ট্যাক্সিতে চড়ার দরকার হয়নি। মার্কিন ট্যাক্সি বলা বাহুল্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এবং ভারি আরামদায়ক। আমাদের দেশের মতো এর মিটারটি বাইরে নয়, ট্যাক্সির লাগানো। কাজেই ড্রাইভারকে কসরৎ করে বাইরে হাত বাড়িয়ে মিটার ডাউন করতে হয় না।

কৃষ্ণাঙ্গ হাসিখুশি ড্রাইভার আমাকে সামনে তার পাশে বসিয়ে নিল।

ট্যাক্সি চড়ার খরচ এদেশে বেশ বেশি। মিটারে যা উঠবে তার বাড়তি আবার টিপস দিতে হয়। আমরা স্যান্ডস থেকে এক লহমায় শো-বোটে পৌঁছে গেলুম, তবু সুশীলদাকে টিপস দিতে হল।

পার্কিং লটে গাড়ি খোঁজা আর এক যন্ত্রণা। টিয়রের নম্বর থাকা সত্ত্বেও সেই গোলক-ধাঁধায় গাড়ি খুঁজে বের করা বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এত শয়ে শয়ে গাড়ি গায়ে গায়ে পার্ক করা থাকে যে ধাঁধা লাগা বিচিত্র নয়।

অবশেষে দুটি অতিকায় কনভার্টিবলের মাঝখানে প্রায় হারিয়ে যাওয়া ভোলভো গাড়িটার হদিস পাওয়া গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

আটলান্টিক সিটি ছেড়ে আবার ফিলাডেলফিয়া রওনা হওয়ার সময় তাকিয়ে শহরটির আকাশরেখা দেখে নিচ্ছিলুম। ম্যাগনিফেসেন্ট শব্দটির বাংলা যা হয় তাই।

আমেরিকায় আসবার পর কত দিন কেটেছে আমার ? কিন্তু এর মধ্যেই মনে হচ্ছে, আমি এ দেশে বহু কাল আছি। কেন মনে হচ্ছে তা বলা কঠিন। হয়তো অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমি আমেরিকার প্রায় সব কিছুই, সমগ্র সত্তা এবং সব ইন্দ্রিয় দিয়ে এমনভাবে গ্রহণ করেছি যে, তাতে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা অল্পেই সঞ্চারিত হয়ে গেছে ভিতরে। কিন্তু বলতেই হবে, এই বিশাল দেশের সব কিছু দেখে বা বুঝে ওঠা বোধ করি কয়েক বছরেও সম্ভব নয়।

আটলান্টিক সিটি থেকে ফেরাব পথে মার্কিন প্রবাস নিয়েও কথা হচ্ছিল সুশীলদা কেন স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আমেরিকাকেই বেছে নিলেন ? তিনি দীর্ঘ দিন বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন। অন্য কোনও দেশও তো বেছে নিতে পারতেন।

সুশীলদা একথাটার জবাব দিতে একটু ভাবলেন। পরে যা বললেন তার সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়, এ দেশের সামাজিক নিরাপত্তা আর কাজের সুযোগ ঢের বেশি। বেশি পড়াশুনার সুযোগ। এখানে রিটায়ারমেন্ট বলে কিছু নেই, যত দিন খুশি চাকরি করা যায়। সুশীলদা তাঁর দুই মেয়েরই বিয়ে দিয়েছেন আমেরিকায়। বাঙালি পাত্র খুঁজে, সম্বন্ধ করে, রীতিমতো হিন্দু মতে বিয়ে ফিলাডেল্‌ফিয়ার এক গির্জায় এই দুই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

আজকাল আমেরিকা বা ব্রিটেনে স্বজাতি বেড়ে যাওয়ায় এ ধরনের বিয়ে প্রায়ই হচ্ছে। স্ত্রী আচার থেকে যজ্ঞ সব কিছু সহ।

বাড়িতে ফিরে এসে এক প্রস্থ আড্ডার মধ্যেই বউদি বললেন, আপনার কি কেনাকাটার কিছুই নাই ? বাড়িতে গেলে যে বউ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

ডলার-দীন আমি সসঙ্কোচে বললুম, সামান্য কিছু কেনাকাটা করে নোবোখন যাওয়ার আগে।

চলুন, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো। আমাদের মার্কেট খুব ভাল।

পর দিন বউদি আর আমি সকালেই বেরিয়ে পড়লুম। সুপার স্টোর হাঁটা পথ। আর সেই হাঁটা পথটুকু পার হতে গিয়ে প্রবল নস্টালজিয়ায় আমার চোখে জল আসবার উপক্রম হল। পূর্ববঙ্গে যে গেঁয়ো শহরে আমি জন্মেছিলুম সেখানে আমাদের বাড়ির পিছন দিকে আগাছায় ভরা পরিত্যক্ত এক ভূমিখণ্ডে এরকমই শুঁড়িপথ ছিল। এমনই ছিল জংলা গন্ধ। আমেরিকায় পূর্ববঙ্গের সেই অনুষঙ্গ পেয়ে কেমন যেন পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়ার মতো অনুভূতি হল।

শুঁড়িপথটুকু পেরোতেই অবশ্য আবার উদ্দণ্ড আমেরিকা। কিন্তু এ দেশটায় এ-রকম ছাড়া জমি, আগাছা, জঙ্গল এরা এমনি ছেড়ে রাখে। তাতে পরিবেশগত একটা ভারসাম্য বজায় রাখা যায়।

টুক টুক করে হেঁটে একটু আঘাটা দিয়েই আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম অতিকায়

স্টোরের চত্বরে। সামনে যথারীতি পার্কিং লট এবং অজস্র গাড়ি। স্টোরের ভিতরটা প্রায় সব স্টোরেরই মতো একই রকমভাবে সাজানো। সবজি মাণ্ডি থেকে ইলেকট্রনিক্স, বিছানা থেকে জুতো অবধি সবই লভ্য।

বউদি নিজেই জিনিস পছন্দ করে দিলেন। বিখ্যাত কোম্পানির কাঁচের অভঙ্গুর প্লেট, নন-স্টিক ফ্রায়িং প্যান, হট বক্স, কাট পিস। বাস্তবিকই এত সস্তায় জিনিসগুলি পাওয়া গেল যে, আমাদের দেশের টাকার তুলনাতেও বেশ সুলভ। আর জিনিসগুলি ভাঁরি ভাল।

অনেকগুলো সস্তা স্প্রে সেন্ট আর খুদে খুদে আফটার শেভ লোশন কিনে নিলুম। প্রায় জলের দরে। ছেলের জন্য গুচ্ছের পেনসিল এবং এক গাদা ডট পেন কেনালেন বউদি। আর নিজেও নানারকম কিনে উপহার দিয়ে দিলেন।

প্রত্যুত্তরে কৃতজ্ঞতা ছাড়া আমার তো আর কিছুই দেওয়ার নেই। ডলার দুর্বল আমি সে কথাটা বলতেই বউদি ধমকে দিলেন।

বিদেশে এলেই ডলার লাগে! সুশীলদা এই সার সত্যটি ভালই জানেন। বিকেলে তিনি আমাকে পঞ্চাশটি ডলার ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা নাও, দেশে গিয়ে আমাকে কিছু বই পাঠাবে। সবই তোমার বই।

তার জন্য ডলার দিচ্ছেন কেন? ও লাগবে না। পাঠিয়ে দেবো।

আরে রাখো তো। এখন খরচ করো। পরে দেখা যাবে।

ফিলাডেলফিয়ায় আমার চেনা একটি মেয়ে থাকে। তাকে ছোট্টটি দেখেছি। এখন সে দুই ছেলের মা। মার্কিন নাগরিক। বঙ্গ সম্মেলনে যখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন প্রথমটায় চিনতে পারিনি। সে নিজে যখন পরিচয় দিল তখন সময় কত তাড়াতাড়ি যায় তা ভেবে পুনর্বার বিস্মিত হলুম। সে বলেছিল, শুনেছি আপনি ফিলাডেলফিয়ার যাবেন। একবারটি কিন্তু আমার বাড়িতে আসতেই হবে।

তার অনুরোধটি এত আন্তরিক ছিল যে, সময়ের অভাব ইত্যাদি বলে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। তাই বলেছিলুম, একা আমার পক্ষে কোথাও তো যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি যদি অ্যারেঞ্জ করতে পারো তো যাবো।

সে গিয়ে তখন সুশীলদাকে ধরে পড়ল, আপনি যদি দাদাকে একবারটি আমার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেন তাহলে বড়ো ভাল হবে।

সেই সময়ে সুশীলদাও কথা দিতে পারেননি। কারণ আমার ভ্রমণসূচী বড্ড ঠাসা। কোথাও ফাঁক নেই। তবু আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, মেয়েটির বাড়িতে একবার যেতে।

আটলান্টিক সিটি থেকে ফেরার পর শুনলুম সে বারকয়েক ফোন করেছে এবং আবারও করবে।

আমরা ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পরই সে ফোন করল, শীর্ষেন্দুদা, কখ
আসবেন বলুন। আমি নিজে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসব ভেবেছিলুম, কিন্তু
আমার ছেলেটির যে জ্বর।

তুমি কত দূরে থাকো ?

অনেকটা দূর।

আচ্ছা, তাহলে তোমার বাড়ির পথটা সুশীলদাকে বলো, ওঁকে ফোন দিচ্ছি

আগেই বলেছি আমেরিকার পথ-নির্দেশিকা আমাদের কাছে বিভীষিকার মতো। এরকম জটিল ও দীর্ঘ পথনির্দেশিকা আর কোথাও প্রয়োজন হয় কি না জানি না। অমুক রাস্তায় অমুক মন্দিরের পাশের গলিতে ঢুকে তেতলা লাল বাড়ির পাশের পথটা ধরে এগোলে মুদির দোকানের পাশের বাড়ি—আমরা এরকম জটিলতায় অভ্যস্ত। আর এরকম নির্দেশিকা কানে শুনে মনেও রাখা সম্ভব আমেরিকায় সেটা সম্ভব নয়। পথের জটিলতা এবং শহরের বিস্তারই মস্ত বড় বাধা। সুতরাং পথ নির্দেশিকাটি লিখে নিতে হয়। এবং সেই নির্দেশিকা এতই দীর্ঘ যে কখনও কখনও আধ পৃষ্ঠা বা এক পৃষ্ঠা জুড়ে বসে। তবে আমেরিকায় যাঁরা বাস করেন তাঁরা বলেন, এ দেশের পথঘাটের জটিলতাটা আসলে নিখুঁত শহর ও পথ পরিকল্পনারই ফল। একবার ব্যাপারটা ধরতে পারলে এ দেশে খুব সহজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছোনো যায়। তবে অ্যালার্ট থাকতে হয় চোখ কান খোলা রাখতে হয়। এ দেশটা ভুলো-মন হা ভাবুক অন্যমনস্ক মানুষের জন্য নয়। একটা রাস্তার একটা মুখ আনমনে পেরিয়ে গেলে সেখানে ফের ঘুরে আসতে হয়তো চার পাঁচ মাইল উজিয়ে গিয়ে তবে ফের ভাঁটিয়ে আসতে হবে দুম করে ইউ টার্ন নেওয়ার কোনও উপায় নেই এবং সে কথাই ওঠে না

মেয়েটি মার্কিন নিয়মে যথারীতি বিশাল ফর্দের মতো পথনির্দেশিকা দিল সুশীলদাকে। সুশীলদা আতঙ্কিত গলায় বললেন, ভাই, তুমি তো অনেক দূরে থাকো, অত দূরে নিয়ে যাওয়া ভারি শক্ত হবে, কারণ শীর্ষেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে আজও লোকজন আসবে।

সুশীলদার স্পিকার এবং মাইক লাগানো ফোন থাকায় আমিও মেয়েটির কথা শুনতে পাচ্ছিলুম এবং কথা বলতেও পারছিলুম। মেয়েটি আমাকে বলল, শীর্ষেন্দুদা তাহলে কী হবে ? আপনি এত কাছে এসেও একবার আমার বাড়িতে আসবেন না ?

আমি বললুম, একা তো যেতে পারব না। তবে আমাকে নিউ জার্সিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাল একজন গাড়ি নিয়ে আসবেন। তিনি যদি সময়মতো আসেন চেষ্টা করব তোমার বাড়ি হয়ে যাওয়ার।

(কিন্তু একথাটা রাখতে পারিনি। নারায়ণদা অর্থাৎ জার্সি সিটির নারায়

মজুমদার যথারীতি আমাকে নিতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু এত দেরি হয়ে গিয়েছিল যে, অন্য কোথাও যাওয়ার সময় ছিল না।)

নিজেদের শহর এবং নিজেদের জায়গা ঘুরিয়ে দেখানোতে এখানে কারও কোনও ক্লান্তি নেই। সুশীলদা ও বউদি যেমন অক্লান্ত, তেমনি অক্লান্ত তাঁদের কুড়ি বছর বয়সী ছেলে মিতুল। কলকাতার পাঠভবন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র মিতুলকে এক ঝলক দেখলে মার্কিন যুবক বলেই ভুল হবে। সে খুবই ফর্সা, মেদহীন, স্বাস্থ্যবান, দেখতে দারুণ স্মার্ট হলেও সে কিন্তু আসলে একটু ভাবুক প্রকৃতির এবং সিরিয়াস ধরনের। বাড়ির বাইরে সে বিশেষ বেরোয় না। তার বিছানায় বালিশের ওপর বিছানো থাকে ভারতের জাতীয় পতাকা। বিছানায় সে শোয় না, শোয় মেঝের কার্পেটের ওপর। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই সে প্রশ্ন করেছিল, ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে আপনি কী ভাবছেন?

মিতুলের ধ্যান-জ্ঞান হল ভারতবর্ষ। সে তার মা-বাবাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, পড়াশুনো শেষ করে সে একাই ভারতে ফিরে যাবে, দেশের কাজ করবে।

মিতুলের এই মনোভাব এবং তার মনোজ্ঞ হাসিটি আমার খুব ভাল লেগেছিল।

দুপুরবেলা মিতুল তার গাড়িতে আমাকে নিয়ে বেরোলো শহর দেখতে। আর পাঁচটা মার্কিন শহরের মতোই ফিলাডেলফিয়ারও অঙ্গে বৈভবের প্রভূত প্রকাশ। তবে এই শহরটিতে কিছু প্রাচীন বাড়িঘর রয়ে গেছে। এক আধটা গলি আছে যা বেশ ঘিঞ্জি। ফিলাডেলফিয়া নিউইয়র্কের মতো বিশাল নয় বটে, কিন্তু আড়ে দীঘে ফেলনাও নয়। দশ বছর এটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। সে হিসেবেও এ শহরটির ঐতিহ্য আছে।

এ শহরে ঢোকবার সময়ে প্রথম দিন একটি বিশাল চওড়া নদীর পোল পেরিয়ে আসতে হয়েছিল। এটিই সেই ডেলাওয়্যার নদী। ডেলাওয়্যার ওয়াটার গ্যাপ-এ এই নদীর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল। বিশাল চওড়া নদীটির যেন গম গম করছে যৌবন। যথেষ্ট জল এবং প্রবল স্রোত দুইই রয়েছে। মিতুল আমাকে নদীর ধারে নিয়ে গেল। অটোমেটিক মেশিনে পয়সা ফেলে গাড়ি পার্ক করতে হয়। গাড়ি রেখে আমরা নদীর ধারের সুবিশাল চত্বরে ঢুকলুম। আমাদের দেশে নদীগুলোর দুর্দশা দেখতে চোখে জল আসে। কাশীর গঙ্গায় ছাল-ছড়ানো মরা গরু ভাসতে দেখেছি। কলকাতার কত নর্দমার জল নিয়ত করুণ করছে গঙ্গার জলকে। মিশছে কতরকম রাসায়নিক আবর্জনা। আর নদীর ধার নিয়ে আমাদের মাথাব্যথাই নেই, যত্র তত্র সামান্য একটু বাঁধানো সিঁড়ি থাকে। কোথাও কোথাও তা বিপজ্জনক রকমের ভাঙা।

আর এরা দেখুন, ডেলাওয়্যারের ধারটি বাঁধিয়েছে কী যত্নে আর কত মাথা

খাটিয়ে। ওপেন এয়ার রেস্তরাঁ রয়েছে, রয়েছে মিউজিয়ম, রয়েছে বিশ্রামাগার, আর নদীর ধার ধরে হাঁটবার বাঁধানো সুন্দর পথ। নৌবিহারেরও সুচারু আয়োজন।

নদীর ধারটি ওই গরমের দুপুরেও আমার এত ভাল লাগল যে রোদ উপেক্ষা করে মিতুলকে নিয়ে অনেকটা হাঁটলুম, বললুম, আহা, আমাদের গঙ্গার ধারটিও যদি এমন হত।

মিতুল বলল, করলেই হবে।

এই যুবকটি অতিশয় আশাবাদী। ভারতবর্ষকে সে এত ভালবাসে যে, আমেরিকার চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্য তাকে প্রলুব্ধ না করে ঈর্ষান্বিতই করে। আমেরিকা যদি তাকে শেষ অবধি গ্রাস করতে না পারে তাহলে আমি খুশি হবো।

ডেলাওয়্যারের জলে অনেক স্পিডবোট আর লঞ্চ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে পালতোলা ধীরগতি নৌকো ছাড়া যেন নদীকে মানায় না।

মিতুল আমাকে নিয়ে ফের গাড়ি ছাড়ল। শহরের বিখ্যাত ঘণ্টাঘর দেখা হল। তবে দ্রষ্টব্য হিসেবে এটি তেমন কিছু নয়।

এই শহরেই থাকেন সাধন দত্ত, বিখ্যাত ডি সি পি এল-এর অধিকর্তা। ইনিই আমার স্পনসর। ভদ্রতার খাতিরে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত ছিল কিন্তু শুনলুম স্ত্রীর অসুস্থতা এবং অপারেশন নিয়ে তিনি ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং দেখা করা সম্ভব হয়নি।

ফিলাডেলফিয়ায় আমার মেয়াদ শেষ হয়ে এল। পরদিন আমাকে ফিরতে হবে নিউ জার্সিতে।

একটি মেয়েকে দেখিয়ে সুশীলদা একদিন আমাকে বলেছিলেন, একে দেখে রাখো। এর কাহিনী তোমাকে পরে বলব।

সেই কাহিনী এ কয়দিনে শুনবার ফুসরৎ হয়নি। নগরদর্শনের পর ক্লান্ত শরীরে যখন বাইরের ঘরের নরম কার্পেটের ওপর গরম চা নিয়ে গোল হয়ে বসেছি তখন সুশীলদা সেই মেয়েটির প্রসঙ্গ তুলে বললেন, সেই মেয়েটির কথা মনে আছে ?

মেয়েটি ভারি সুন্দর, তাই মনে আছে। নইলে হয়তো ভুলে যেতুম। রবীন্দ্রনাথের নায়িকার মতো মনে হয়।

ও বাবা, তুমি তো অনেক দূর এগিয়েছো দেখছি।

আমার এগোনোটা নিতান্তই থিওরিটিক্যাল। মেয়েটির মুখে একটা বিষণ্ণতা লক্ষ করেছিলুম, সেটা হয়তো সৌন্দর্যে একটা বাড়তি মাত্রা যোগ করেছিল।

বিষণ্ণতার ব্যাপারটা খুবই ঠিক ধরেছো। আমার একটি ছাত্র আছে। ছাত্র

হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট, মানুষ হিসেবেও অত্যন্ত ভাল। তার স্বভাবচরিত্রে একটা সাধু-সাধু ব্যাপার আছে। সেই ছেলেটির সঙ্গে এই মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল। মেয়েটিকে তো দেখলে, এও কিন্তু ভীষণ ভাল মেয়ে। এদের জোড়টি আমাদের সকলেরই খুব পছন্দ হয়েছিল। আমরা বলতুম, হরগৌরীর মিলন হয়েছে। বিয়ের পর বউ নিয়ে এল ছেলেটি, যেমন এখানে সবাই আনে। ঘর বাঁধল। একটি মেয়ে হল যথাসময়ে। ভেরি স্মুথ রানিং। কোথাও কোনও গণ্ডগোল নেই। কিন্তু বছর চারেক বাদে একদিন শুনলুম ছেলেটি বাড়ি থেকে চলে গেছে।

কোথায় গেল?

হারিয়ে যায়নি। অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। সে নাকি আর এই বিবাহিত জীবন-যাপন করবে না।

তার কারণ কী?

মেয়েটি আমার কাছে এসে অনেক কান্নাকাটি করল। কিন্তু যা বলল, তাতে বুঝলুম দুজনের মধ্যে তেমন কোনও ঝগড়াঝাটি বা মনান্তর হয়নি। গুরুতর এমন কিছুই ঘটেনি যাতে গৃহত্যাগ করার প্রয়োজন হয়। ছেলেটি নাকি হঠাৎই একদিন বলল, আমি আর এ জীবন সইতে পারছি না। তোমাকে গাড়ি-বাড়ি সব দিয়ে দিচ্ছি। আমি চললুম।

বৈরাগ্য নয় তো!

সেভাবে ব্যাখ্যা করলেও অঙ্কটা মিলছে না। সে সাধু-সন্ন্যাসীও হয়নি বা অন্য কোনও মেয়ের খপ্পরেও পড়েনি। চাকরি বাকরি যেমন করছিল তেমনি করছে, তবে শহর বদলেছে। অর্থাৎ এখানকার চাকরি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে অন্য চাকরি নিয়ে। মেয়েটি তার শিশুকন্যা নিয়ে অগাধ জলে পড়ে গেল।

আপনি ছেলেটির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?

করেছি। ছেলেটি শুধু বলে, স্যার, কিছু হয়নি। আমি পারছি না। এইরকম অদ্ভুত সেপাবেশন আমি জীবনে দেখিনি। সেই ছেলেটি এখনও একা। বিয়ে করেনি।

আর মেয়েটি?

সুশীলদা এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

ফিলাডেলফিয়ায় থাকাকালীনই শুনতে পেলুম নবনীতা দেব সেনও কানাডাতে রয়েছেন এখন। ঘটনাটি মোটেই বিস্ময়কর নয়, কারণ নবনীতা প্রতি বছরই এসব দেশে বক্তৃতা দিতে বা কর্মসূত্রে আসেন। এবং প্রায় প্রতিবারই তিনি ট্রানজিটে কিছু না কিছু হারান এবং পরে তা ফিরেও পান। এ বিষয়ে তাঁর নিজেরই অনবদ্য রচনা রয়েছে।

কাজেই এক অপরাহ্নে যখন কানাডা থেকে নবনীতার ফোন পেলুম তখন প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলুম, এবার স্যুটকেস হারায়নি তো!

নবনীতা অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, কি করে জানলেন ? হ্যাঁ এবারও হারিয়েছে। বোধহয় আমস্টারডাম বা টোকিওয় চলে গেছে স্যুটকেস। আর আমার সব রয়েছে তাতে।

আমি গম্ভীর গলায় বললুম, তা এটাও তো নিয়মিত ঘটনা। মুশকিলের কী আছে ? যার প্রতিবার স্যুটকেস হারায় তার তো স্যুটকেস হারানোটাও অভ্যাস হয়ে যাওয়ার কথা।

খুব ইয়ার্কি হচ্ছে! আমি মরছি নিজের জ্বালায়।

সে তো হল, কিন্তু আপনি ফিলাডেলফিয়ায় এ-বাড়ির ফোন নম্বর পেলেন কি করে ?

খোঁজ করে করে। ওটা কোনও কঠিন কাজ নয়। তা আপনি কতদিন থাকবেন ? কিছুদিন থাকলে দেখা হয়ে যেতে পারে। আমি কানাডা থেকে আমেরিকায় যাবো। তবে কালিফোর্নিয়ায়।

আমার ওদিকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নবনীতা যেভাবে দেশভ্রমণ করেন তাতে যথেষ্ট সাহস আর স্ট্যামিনা থাকা দরকার। একবার একা দক্ষিণ ভারত থেকে ফেরার পথে নবনীতা এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় চলে গিয়েছিলেন। বেশ ভালরকম নাকাল হতে হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু ভয় পাননি। বিপদে পড়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা এত মস্ত গুণ। এই যে স্যুটকেস হারাল, আমার হারালে আমি যতটা উদ্বিগ্ন আর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তুম নবনীতা তার এক শতাংশও হননি।

নবনীতা জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে ?

দারুণ। কিন্তু আপনার কি এখন একবস্ত্রে কাটছে ?

হুঁ। বললুম না, স্যুটকেসে আমার সব রয়ে গেছে।

পাওয়ার আশা নেই ?

বলছে তো পাওয়া যাবে। তবে তা কবে কে জানে!

বুঝতে পারলুম, বিশেষ উদ্বিগ্ন নন, তবে খানিকটা বিরক্ত, এই যা।

নারায়ণদা অর্থাৎ জার্সি সিটির নারায়ণ মজুমদার তাঁর গাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবেন নিউ জার্সিতে। প্রায় আড়াইশো মাইল পথ। বিকেল পাঁচটা নাগাদ তাঁর আসবার কথা। কিন্তু সময়মতো তিনি এসে না পৌঁছোনোয় আমি একটু উদ্বেগ প্রকাশ করছিলুম। আজ না পৌঁছোলে একটু মুশকিল হবে। পরদিন নিউইয়র্কের বম্বে প্যালেস হোটেলে একটি রিসেপশন আছে।

বেশ কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পর সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ নারায়ণদা এসে গেলেন। কথা ছিল আজ জার্সি সিটিতে তাঁর বাড়িতে রাত্রিবাস করব। কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ায় সেটি ঘটে উঠবে না।

আমরা বাঙালিরা—তা ভারতবর্ষেই হোক বা আমেরিকায়—আদ্যন্ত আড্ডাবাজ। কথা পেলে আমরা আর কিছু চাই না। সুতরাং নারায়ণদা আসবার পর তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার বদলে আমরা বসে গেলুম আর এক প্রস্থ আড্ডায়।

শেষ অবধি বেশ একটু রাতেই আমরা রওনা হলুম।

নারায়ণদা আমেরিকায় আছেন কুড়ি বছরেরও বেশি। আমার এই নিরামিষাশী, সহজ·সরল, ভালমানুষ গুরুভাইটি কিন্তু এখনও যেন নিজেকে এদেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি।

কথায় কথায় বললুম, এদেশে কেন পড়ে আছেন নারায়ণদা ?

থাকার কারণ অনেক। তবে আর উপায়ও কিছু নেই। এদেশেই সেটল করে গেলাম ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও। অনেক ফ্যাকটর কাজ করে। সব কারণকে ভাল বোঝাও যায় না।

আমি সেগুলোই জানতে চাই। আমেরিকায় ঘুরে আমার মনে হয়েছে, এদেশটা বেড়ানোর পক্ষে চমৎকার, কেনাকাটার পক্ষে স্বর্গরাজ্য, কিন্তু বসবাস করার পক্ষে বোধহয় ততটা ভাল নয়।

আমারও তাই মনে হয়। এখানে যারা নানা উপলক্ষে শেষ অবধি থেকে যায় তারা যে খুব সুখী তা মোটেই নয়। কিন্তু অনেক সময়ে উপায় থাকে না।

স্টাম্বলিং ব্লকটা কী ?

প্রথমত ছেলেমেয়ে। তারপর সিকিউরিটি। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণও আছে।

সব বুঝলুম। কিন্তু বাঙালি বা ভারতীয়রা তো মার্কিন মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে মিশেও যেতে পারে না। ফার্স্ট জেনারেশন অন্তত পারে না। সেকেন্ড জেনারেশন পারে।

যা বলছেন সবই ঠিক। সেকেন্ড জেনারেশন নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিতও। কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না। আমার একমাত্র ছেলে একটি মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেছে, কিছু করার ছিল না। ইট জাস্ট হ্যাপেনড।

আপনার ছেলেও তো নিরামিষ খায় !

হ্যাঁ। পেঁয়াজ অবধি খায় না। আর তার বউ তাকে নিরামিষ রেঁধে খাওয়ায়ও।

এই বলে নারায়ণদা একটু বিষণ্ণ হাসলেন।

আড়াইশো মাইল রাস্তা অনেকটা রাস্তা। আমাদের দেশে এই রাস্তা এক

বিকেলে পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু আমরা দিব্যি গল্প করতে করতে শহরের পর শহর পেরিয়ে যাচ্ছি।

আমেরিকায় অজস্র শহর। প্রাকৃতিক নিবিড় পটভূমিতে এই সব শহরের সৌন্দর্য অসাধারণ। প্রতিটি শহর দেখলেই মনে হয়, আহা, এখানে যদি কিছুদিন থাকা যেত!

নারায়ণদা বললেন, এই যে ওপর ওপর সুন্দর দেশটা দেখছেন, এর ভিতরটা কিন্তু তেমনই নিষ্ঠুর। এখানে চট করে কারও সমবেদনা বা প্রশ্রয় পাওয়া যাবে না। কাজ কর, ডলার নাও—এই হল এখানকার নীতি। আপনার দুর্দশায় 'আহা' বলার মানুষ নেই।

সবই জানি। অসময়ে একটু আড্ডা মারার জন্য আমরা যেমন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হই এখানে তেমনটি ভাবাই যায় না। অসময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারও বাড়িতে হামলা করা বেয়াদবি। এই কাজের দেশে মানুষের হাতে অবসর এত কম যে সেই সময়টুকু এদের হাঁফ ছাড়তে আর নিজস্ব কাজ করতেই ব্যয় হয়ে যায়। কারও ফালতু সময় নেই।

আত্মীয়তা জিনিসটাও যে কত ঠুনকো কতই বাহুল্য তাও এই দেশে এলে হৃদয়ঙ্গম হবে। অবশ্য এসব আমার আগেই জানা ছিল। আত্মীয়তা তো দূরের কথা, মা-বাবার সঙ্গেই সন্তানের ব্যবধান দুস্তর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আত্মীয়তা ব্যাপারটা এখানে কোনও আঠা নয়।

তাহলে আঠা কোথায়? আমি মার্কিন মানুষজনের সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। তাঁরা খুবই বিনয়ী, মন দিয়ে কথা শোনেন, নাম একবার শুনলে আর ভুলে যান না এবং সব সময়েই সাহায্য করতে আগ্রহী। এই সব মানুষ দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এরা মানব-সম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট চর্চা করেন। তাহলে এঁদের পারিবারিক জীবন এত নীরক্ত কেন?

রাতের আমরিকায় হাইওয়ে ধরে দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দেওয়ার সময় একটি দৃশ্য সব সময়েই আপনার চোখে পড়বে। সেটা হল অজস্র গাড়ির টেল লাইট। রাস্তা বেশির ভাগ সময়েই একটু উচ্চাবচ হওয়ার ফলে বহু দূরের দৃশ্যও দেখা যায়। আপনি দেখতে পাবেন সামনের দিগন্ত-বিস্তৃত অন্ধকারে হাজার হাজার লাল আলোর চঞ্চলতা। আর উলটোদিকের রাস্তায় তেমনই অজস্র হেড লাইটের বিদ্যুৎ-গতি। এত গাড়ি এখানকার রাস্তায় চলে যা আমাদের ধারণারও বাইরে। এক হিসেবে আমেরিকা হল অটোমোবিলের দেশ। এত মোটরগাড়ি বোধহয় আর কোনও দেশের রাস্তায় চলে না। মোটরগাড়ি ছাড়া এখানে জীবন-যাপন অচল। তাই অজস্র মোটরগাড়ির নিরন্তর গতায়াতের উপযোগী অসামান্য সব রাস্তাও তৈরি হয়েছে। কোনও রহস্যময় কারণে আমেরিকানবা রেলগাড়ি চড়তে পছন্দ

করে না। সেজন্য রেলপথ ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হচ্ছে। অনেক জায়গার রেল যোগাযোগ তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের রেলপথ তুলে দেওয়া দূরের কথা, আরও বেশি রেলপথ কেন নেই সেটাই আমাদের বিক্ষোভের কারণ।

মোটরগাড়ি ছাড়া আমেরিকানরা পছন্দ করে বিমান। এই বিশাল দেশের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো তো কম দূরের পাল্লা নয়। সেজন্য অধিকাংশ শহরেই আছে চমৎকার প্রথম শ্রেণীর বিমান-বন্দর। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বহু কোম্পানি আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বিমান চালায়। আমাদের কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যেতে সারা দিনমানে একখানি মাত্র বিমান, দিল্লি বা বোম্বাই যেতে হলে অবশ্য একাধিক বিমান পাওয়া যাবে, তবু তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমেরিকানদের নাম্লে সুখমস্তি, যে-কোনও শহর থেকে যে কোনও শহরে যেতে এখানে প্রতিদিনই প্রচুর বিমান পাওয়া যাবে। দরকারমতো বিমান ভাড়া বা চার্টার করা কোনও কঠিন ব্যাপারই নয়, এই ধনীর দেশে বহু মানুষের নিজস্ব বিমানও আছে। গোটা দেশটাই যাতায়াত এবং যোগাযোগের সুচারু ইন্দ্রজালে বাঁধা। আর আমার তো কলকাতা থেকে দেওঘর যেতেই হৃৎকম্প হতে থাকে। ট্রেনে জায়গা পাবো তো! আমার রিজার্ভ সিটে আর একজন উঠে বসে থাকবে না তো! ট্রেন সময়মতো পৌঁছোবে তো! ট্রেন ধরতে যাওয়ার সময় হাওড়া ব্রিজে জ্যামে আটকে পড়ব না তো! ঠিকমতো ফেরার ট্রেন ধরতে পারব তো!

এই যে বেশ একটু রাত করেই ফিলাডেলফিয়া থেকে বেবিয়ে আড়াইশো মাইল পাড়ি দিচ্ছি, এটাতে স্থানান্তবে গমনের কোনও চাপ বা টেনশন নেই, নেই কোনও অনিশ্চয়তাও। মাঝে মাঝে গাড়িতে পেট্রল ভরে নিতে হচ্ছে। তা সেই বিশ্রামটুকুও ভারি উপভোগ্য হচ্ছে। নারায়ণদা যেমন চমৎকার সরল সিধে মানুষ, তেমনই নম্র ও চারুভাষী। এই মানুষটির অন্তরটি ধর্মপ্রাণ, স্বভাবটি আদ্যন্ত ভারতীয়। আমেরিকায় ইনি সচ্ছন্দ বটেন তবে স্বস্তিতে বোধহয় নেই। নারায়ণদার একটিই দোষ, একটু ভুলো মনের মানুষ। ভুলো মনের মানুষের জন্য আমেরিকা নয়।

বেশ একটু রাত হল নিউ জার্সি পৌঁছোতে, গল্প করতে করতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে এবং আড্ডাটি প্রলম্বিত করার জন্যই নারায়ণদা তাড়াহুড়ো করেননি। নিউ জার্সি স্টেটে ঢোকার পর নারায়ণদা ঘড়ি দেখে বললেন, জার্সি সিটিতে পৌঁছোতে আর একটু রাত হবে।

কিন্তু সরাসরি জার্সি সিটিতে যাওয়ার উপায় নেই। আলোলিকা-ভবানীদের বাড়িতে আমার জিনিসপত্র রাখা আছে। একবার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া আমার যাবতীয় মেসেজও ওদেরই রিসিভ করার কথা। সুতরাং ওয়েন-এ না গিয়ে উপায় নেই।

গাড়ি তাই ওয়েন-এর পথ ধরল।

রাস্তাঘাট এমনিতেই জনশূন্য। রাত বেশি হওয়ায় তা একেবারে ভুতুড়ে পুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভবানী আর আলোলিকা অপেক্ষা করছিলেন। কলিং বেল বাজবার আগেই দরজা খুলে দুজনে দেখা দিলেন। বললেন, আপনার জন্য ভীষণ টেনশনে ছিলাম। আসুন। আসুন।

অত রাতে ওরা আর আমাকে ছাড়তে চাইলেন না। তার কারণ পরদিন বোম্বে প্যালেসের রিসেপশনে এরাই নিয়ে যাবেন আমাকে।

নারায়ণদা কিছুটা হতাশ হলেন।

অত রাতে আমরা অবার বসে গেলুম আড্ডায়। প্রায় রাত বারোটা নাগাদ নারায়ণদা রওনা হওয়ার পর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুম।

পরদিন সকালেই প্রবীর সাহা অর্থাৎ পবুর ফোন এল, শীর্ষেন্দুদা, আমি আপনাকে আটলান্টিক সিটি নিয়ে যাবো, মনে আছে তো! কবে যাবেন বলুন।

আমি হেসে বললুম, ওটা সেরে ফেলেছি।

এঃ হেঃ, তাহলে আর কোথায় যাবেন বলুন, আমি নিয়ে যাবো।

যাওয়ার ইচ্ছে তো অনেক জায়গায়, কিন্তু সময় পাবো কি করে বুঝতে পারছি না।

আপনি যখন যেখানে বলবেন নিয়ে যাবো। দরকার হলে অফিসে ডুব মেরেও।

আচ্ছা পবু, বলব তোমাকে।

আর আমার বাড়িতেও আসতেই হবে একদিন।

যাবো নিশ্চয়ই যাবো।

কবে যেতে পারব, কিভাবে যাবো তা বুঝতে পারি না। কিন্তু এই সব উষ্ণ ভালবাসা মেশানো আমন্ত্রণ আমাকে টানে।

কি জানি কেন, ওয়েন জায়গাটি আমার বেশ লাগে। আমেরিকায় প্রথম এসেই এ শহরে আশ্রয় নিয়েছিলুম বলেই কি না জানি না এ শহরের ওপর আমার একটু ক্ষীণ মায়ার সঞ্চার হয়েছে।

পায়ের তলায় সর্ষে। পরদিন সকালেই আবার আলোলিকার সঙ্গে বেরোলুম বাজারহাট দেখতে, জায়গা দেখতে। আমি যেমন দেখতে চাই, এরাও তেমনই সমান আগ্রহী ঘুরিয়ে দেখাতে।

বিকেলে সেজেগুজে এবং স্যুটকেস নিয়েই রিসেপশনে রওনা হলুম। কারণ ওখান থেকে ভবানী ও আলোলিকা নিউইয়র্কে যামিনীদার বাড়িতে আমাকে পৌঁছে দেবেন। সেখানে দু রাত্তির কাটিয়ে আমি, যামিনীদা ও সুমিত্রা বউদির সঙ্গে যাবো ওয়াশিংটন।

বম্বে প্যালেসের ডিনার-কাম-রিসেপশনটি ছিল ঘরোয়া এবং চমৎকার। দোতলার ওপর মাঝারি মাপের রেস্তরাঁটির মালিক অবশ্যই ভারতীয়। ভারতীয় খাবার এবং পরিবেশের জন্য সুখ্যাত। ছোটো জায়গায় অনেক লোক হয়ে যাওয়ায় একটু গায়ে গায়ে ভিড় হয়েছে। তা হোক, তবু অনেক চেনামুখ একসঙ্গে দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল।

বাংলাদেশের ওহায়েদুল হক নিরামিষাশী দেখে চমৎকৃত হলুম। বললুম, আপনি নিরামিষ খান কেন ?

জন্মেও আমিষ খাই নাই। ভাল লাগে না।

ছোট্ট একটি সুন্দর অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা উপহার দিলেন একটি স্মারক।

অনুষ্ঠানের পর জমাট আড্ডা। গল্পে গল্পে রাত হয়ে গেল। ভবানী আর আলোলিকা আমাকে যামিনীদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফের ওয়েন-এ ফিরবেন। আরও রাত হলে তাঁদের বিপন্ন করা হবে। সুতরাং অনিচ্ছের সঙ্গেই আড্ডা ভেঙে চলে আসতে হল।

ব্রুকলিন জায়গাটির বিশেষ সুনাম নেই। কালো গুণ্ডা ও ছিনতাইবাজদের ব্যাপক উৎপাত আছে এখানে। আছে স্লাম আর ডক এরিয়া। নানা চোরাই চালানের ব্যবসা। ব্রুকলিনের নাম শুনলেই অনেকে নাক সিঁটকোন। তা বলে গোটা এলাকাটিই কিন্তু এরকম নয়। ব্রুকলিনও বিশাল এলাকা। সেখানেও নিশ্চিত ভদ্রজনদের বসবাস আছে।

যামিনীদা যেখানটায় থাকেন, সেখানে সাবওয়ের টার্মিনাল আছে। কাছেই আছে জাহাজঘাট। আর তাঁদের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের উল্টো দিকেই বিশাল বৃক্ষশোভিত, সবুজ ঘাসওয়ালা একখানা পার্ক।

আমেরিকার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলি সম্পর্কে একটু কৌতূহল ছিল। যারা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে তারা কেমন থাকে, কিরকম সব ব্যবস্থা সেখানে ? ব্রুকলিনে যামিনীদাদের ফ্ল্যাটে থাকার সুবাদে, সেটা জানা হয়ে গেল।

অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ব্যবস্থা কিরকম জানি না, তবে যামিনীদাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে কোনও দারোয়ান নেই। একতলায় ঢুকতেই সামনে বন্ধ কাচের দরজা। সেটি ঠেলে ঢুকে যাবেন সে উপায় নেই। দরজার পাশেই দেওয়ালে গায়ে একটি প্যানেল রয়েছে। তাতে প্রত্যেক ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা বোতাম ও ফ্ল্যাটের বাসিন্দার নাম লেখা। যার ফ্ল্যাটে যাবেন তার নামের পাশে বোতামটি টিপুন। যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে তবে তিনি ওপর থেকে রিলিজ বাটনটি টিপবেন এবং দরজা খুলে যাবে।

কিন্তু খবর্দার, ভুল করে যেন অন্য বোতামে আঙুল ছোঁয়াবেন না, আমেরিকানরা প্রাইভেসি ভালবাসে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারও আসা পছন্দ

করে না। একজন প্রবীণ বাঙালি তাঁর নাতিকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে বড্ড বিপাকে পড়েছিলেন। তিনি অবশ্য ভুল করেননি, ঠিক বোতামই টিপেছিলেন, কিন্তু তাঁর খুদে নাতিটি দাদুর দেখাদেখি আর একটা বোতাম টিপে দিয়েছিল। ফলে দুই হুমদো সাহেব নেমে এসে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে যৎপরোনাস্তি অপমান করেন। "ইউ আর এ স্টুপিড! ইউ আর এ স্টুপিড!" বলে এমন উত্তেজনা প্রকাশ করেন যে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাঁদো কাঁদো। তাঁর নিজের মুখেই ঘটনাটি শুনেছিলুম। উনি বললেন, দেখুন আমাদের দেশে ভুল করে অন্য বাড়িতে হাজির হলে তো কেউ কিছু মনে করে না। এ দেশটা এ রকম কেন বলুন তো!

অনেককাল আগে একবার বন্ধু দিব্যেন্দু পালিতের বাড়ি যেতে গিয়ে আমাকে ঘোর বিপদে পড়তে হয়েছিল। দিব্যেন্দু তখন হাজরা পার্কের কাছে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে। সেখানে যেতে গিয়ে এক দুপুরে অন্য একটা বাড়ির কড়া নেড়েছিলুম। এক পাগলাটে রাগী ধরনের বৃদ্ধ আমাকে ডেকে ঘরে নিয়ে বসিয়ে বিস্তর জেরা করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেন যেন আমি মূর্তিমান ডাকাত। লোকজনও ডাকাডাকি করে এনেছিলেন, তবে তাঁরা কাণ্ডজ্ঞান না হারিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আমাকে রেহাই দেন। কিন্তু এ ঘটনা কলকাতায় বিরল। সাধারণত ভুল বাড়িতে ঢুকলে তেমন হেনস্তা হওয়ার কারণ নেই। আমেরিকায় ঢোকা দূরস্থান, বেল বাজালেও বিপদের সম্ভাবনা আছে।

তবে এ-বাবদে তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এসব অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে চমকপ্রদ ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থাদি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু চুরি ডাকাতি খুন জখম যখন তখন হয়। অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে আমাদের দেশের মতো বহু মানুষ তো থাকে না। এক একটা ফ্ল্যাটে একজন দুজন বা আড়াইজন মানুষ। তারাও বেশির ভাগ সময়েই বাইরে কাটায় কাজে। ফলে, জনবিরল এই সব ফ্ল্যাটবাড়ি খুনে গুণ্ডা লুঠেরাদের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায় প্রায়ই। ফলে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে স্থায়ী ভীতি থাকতেই পারে। ভুললে চলবে না, এ হল কুখ্যাত ব্রুকলিন।

ভবানী যামিনীদার নামের পাশে বোতামটি টিপতেই ঝড়াক করে কাচের দরজার ক্যাচ আলগা হয়ে গেল। সামনের ফাঁকা ল্যান্ডিং পার হয়ে লিফটে গিয়ে উঠলুম তিনজনে। লিফট, করিডোর সবই সুনসান, নির্জন। যামিনীদা থাকেন আটতলায়। সেখানকারও করিডোর ফাঁকা। ডোরবেল টিপতেই বউদি দরজা খুলে হাসিমুখে দাঁড়ালেন সামনে। ঘড়িতে দেখলুম, রাত এগারোটা। এত রাতে অতিথি এলে গেরস্তর মুখে হাসি থাকার কথা নয়।

তবে কিনা, আমি তিথি-না-মানা অতিথি নই। যামিনীদা আর বউদির সাদর আমন্ত্রণেই আসা। আর যামিনী মুখার্জি হচ্ছেন সেই লোক যিনি সারা রাত জেগে

কবিতা পড়তে বা আড্ডা মারতে পারাটাকেই একমাত্র এন্টারটেনমেন্টে বলে মনে করেন। বয়স ষাটের কোঠায় এবং চুলে রং ধরলেও মেদহীন পুরুষালি চেহারার যামিনীদাকে বয়স এখনও ছুঁতেই পারেনি। ঝকঝকে দাঁতে যখন হাসেন তখন বয়স আরও কমে যায়।

কিন্তু সুমিত্রা বউদি যেন আরও প্রাণশক্তিসম্পন্ন।

রাত এগারোটায় আমরা ফের কিছুক্ষণ আড্ডা মারলুম। ভবানী আর আলোলিকা বিদায় নেওয়ার পর আমি যামিনীদা আর বউদি বসে গেলুম গল্প করতে। রাত একটায় বউদি শুতে গেলেন।

রাত দুটো নাগাদ যামিনীদা জিজ্ঞেস করলেন, কী শীর্ষেন্দু, ঘুম পাচ্ছে?

পাচ্ছিল। একটা উদ্যত হাইকে চেপে কান দিয়ে হাওযা বেরোবার শব্দ শুনে বললুম, না না, ঠিক আছে।

জানো তো, এই ঘরে আমি আর সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়) সকাল পাঁচটা অবধি বসে কবিতা পড়েছি।

একটু শিউরে উঠে বললুম, যামিনীদা, সকাল পাঁচটা অবধি বোধহয় পেরে উঠব না।

যামিনীদা খুব হাসলেন। বললেন, যাও গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমাকে টায়ার্ড দেখাচ্ছে।

যারা আমেরিকায় আসে তারা কি সবাই আপনার বাড়িতে এসে ওঠে নাকি! সে রকমই যেন শুনেছি।

ওঠে কেউ কেউ। পূর্ণ দাস বাউস এসেছিল এই তো কিছুদিন আগে। দলবল নিয়ে এই ঘরেই থাকত। সুনীল এলে আসে। আরও আসে অনেকে।

বোঝা গেল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার প্রাক্তন অধিবাসী যামিনী মুখার্জি মার্কিন নাগরিক হয়েছেন বটে, কিন্তু দিশি মেজাজটি হারাননি। তাঁর ফ্ল্যাটটি যদিও মার্কিন ছাঁচে এবং বাহুল্যে সুসজ্জিত এবং যথেষ্ট সাহেবিয়ানাও আছে, তবু এই ফ্ল্যাটের মানুষ কিন্তু আদ্যন্ত বাঙালি।

যামিনীদা বেশ একটু বেশি বয়সেই দেশ ছেড়ে আমেরিকার পাড়ি দিয়েছিলেন এবং খানিকটা আকস্মিকভাবেই। তার আগে তিনি রাজনীতিও করতেন। আমেরিকার ঐশ্বর্য, দ্রষ্টব্য বা জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কম, তাঁকে টানে মিউজিয়ম, আর্ট, অফবিট থিয়েটার। সেই সব নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে ভালবাসেন। তাঁর বাইরের ঘরে গুটি তিনেক আধুনিক শিল্পের রিপ্রিন্ট রয়েছে দেয়ালে টাঙানো।

যামিনীদা কাজ করেন ইউনিয়নে। সেটা কী ধরনের চাকরি তা আমি অনেকটা শুনেও বুঝতে পারিনি। কিন্তু চাকরি নিশ্চয়ই ভাল। ঘরদোরে

সম্পন্নতার নির্ভুল ছাপ রয়েছে। তাঁর ছোটো ছেলে পঞ্জাবি স্ত্রী ও ফুটফুটে এক বাচ্চা নিয়ে এই বাড়িরই আর একটি ফ্ল্যাটে থাকে। বড় ছেলে ওয়াশিংটনে সদ্য বাড়ি কিনেছে। আমরা তার বাড়িতেই যাবো। যামিনীদা মোটামুটি সপরিবারে আমেরিকাতেই স্থায়ী হলেন।

রাত তিনটে নাগাদ শুতে গেলুম। যে ঘরটি আমাকে দেওয়া হল তা একটি কোণের ঘর। দু দিকে কাচে আটা শার্সি দিয়ে নিউইয়র্কের অফুরান আকাশরেখা দেখা যায়। একটা শহুরে দৃশ্য রাতের আলোয় যে কী সুন্দর হতে পারে! রাত তিনটেয় ঘুম-চোখেও মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। তারপর ঘুমোলোম।

আমি ঘুম থেকে ওঠবার আগেই যামিনীদা অফিসে চলে গেছেন। বউদি বললেন, তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিন। বেরোবো।

আজ আমাদের প্রোগ্রাম কী বউদি?

আজ আমরা যাবো মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এ।

আর্ট যে আমি খুব ভাল বুঝি তা মোটেই নয়। তবে ভাল ছবির সম্মোহক আকর্ষণ টের পাই। তবে কলকাতার ছবির প্রদর্শনীতে বড় একটা যাওয়া হয়ে ওঠে না। নিউইয়র্কের এই মিউজিয়মটির খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ম্যানহাটানের এই মিউজিয়মে সারা পৃথিবী থেকে শিল্পরসিকরা আসেন।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে বউদির সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। কাছেই হাঁটাপথের দূরত্বে সাবওয়ে স্টেশন। এটি টার্মিনাস। বউদি কাউন্টার থেকে পয়সা দিয়ে কয়েকটা চাকতি কিনলেন। এই চাকতিই টিকিট। শুধু সাবওয়ে নয়, বাসেও এই চাকতি টিকিটের কাজ করে।

সাবওয়েতে ঢুকবার মুখে একটি তেকাঠি দিয়ে পথ আটকানো। চাকতির গর্তে চাকতি ফেলে ঠেলা দিলেই তেকাঠি ঘুরে যায়। ভারি মজার ব্যাপার।

সাবওয়ে অর্থাৎ ভূগর্ভ রেল হলেও এখানে এটি সারফেস রেল। খানিকটা গিয়ে তবে সুড়ঙ্গে ডুব দেবে। গাড়ি আসে বেশ ঘন ঘন। বিশেষ অপেক্ষা করতে হয় না। তবে যাত্রী খুব কম।

এখানকার সাবওয়েতে একটি ভাল ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা ট্রেনে উঠতে না পারলে বোতাম টিপে গাড়ি থামাতে পারেন। তাছাড়া চালক ও রেলকর্মীরাও লক্ষ রাখেন, কেউ উঠতে পারল বা না পারল।

কলকাতার পাতাল রেল কিছু কম সুন্দর নয়। বলতে কি আমাদের কলকাতার যানবাহনের মধ্যে পাতাল রেলই যা বলবার মতো দেখনসই জিনিস। নিউইয়র্কের সাবওয়ে ত্রিশের দশকে তৈরি হয়েছে। বয়স সুতরাং কম হয়নি। কিন্তু এই ট্রেনগুলি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ভিড় নেই বললেই হয়।

সমস্ত নিউইয়র্ক শহরটাই সাবওয়ে নেটওয়ার্কে ছাওয়া। ট্রেন বদল করে করে

যথা ইচ্ছা যাওয়া যায়। কলকাতায় পাতাল রেলের সেই নেটওয়ার্ক আমরা এখনও ভাবতে পারি না।

ট্রেনে বসে আমি ভিতরকার দৃশ্য মন দিয়ে দেখলুম। তরুণী একটি মোটাসোটা সাদা মেয়ে কানে ওয়াকম্যানের ইয়ারফোন এঁটে গান শুনতে শুনতেও আবার কোলের ওপর একখানা বই খুলে পড়ছে। মুখে বোধহয় চুয়িং গাম। চিবোচ্ছে। চারজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ কোণের দিকে বসা, গায়ে কারও রঙিন স্যান্ডো গেঞ্জি বা টি-শার্ট, পরনে জিনস বা ওই রকম কিছু। একজন সুবেশ সুশ্রী চেহারার টিপটপ শ্বেতাঙ্গ সাহেব স্পেয়ার মি এ ডলার। এ ডলার প্লিজ। বলে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে চাইছে। টুকটাক কিছু ডলার পড়ছেও তার বাড়ানো টুপিতে।

একটু বাদে সামান্য ভিড় হয়ে গেল কামরায়। তবে খুব বেশি নয়। তিন জন ওঠে তো দু-জন নেমে যায়।

বউদি বললেন, এসব সাবওয়ে কিন্তু বিপজ্জনক। মাঝে মাঝে মাগিং হয়।

কিন্তু লোকজন তো থাকে।

এখানে মাগিং হলে কেউ আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। মনে রাখবেন নিউইয়র্কে দায়িত্ব হল যার যার তার তার।

আমাদের কল্যাণ রায়ও বলছিল বটে এ রকম কথা। তার স্ত্রী আমেরিকান গর্ভবতী অবস্থায় সে একবার সাবওয়েতে যাওয়ার সময় চার জন কালো ছোকরা তার পেটের ওপর ছুরি ধরে সব কিছু কেড়ে নেয়। সকলের চোখের সামনেই। নিউইয়র্ক বসবাসের পক্ষে নিরাপদ নয় জেনে কল্যাণ নিউ জার্সিতে নতুন চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

তবে নিউইয়র্কে বসবাস করার ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে। পৃথিবীতে এত গমগমে সদাচঞ্চল, সদাজাগ্রত সদা বহমান শহর তো আর নেই। এখানে সারা দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই চলে সাবওয়ে এবং বাস। কোনও কোনও দোকান বারো মাস চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে। এর আলোকসজ্জা, জাঁকজমক, নাগরিক সুবিধেরও কোনও তুলনা নেই।

আর নিউইয়র্কের অন্ধকার দিকও আছে। গুন্ডামি, রাহাজানি, ড্রাগস, খুন, জখম, বিকৃত যৌন অভিচার। সব মিলিয়ে দেখলে নিউইয়র্ক এক অদ্ভুত শহর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিউজিয়ম, সেরা থিয়েটার, সংস্কৃতির চর্চা যেমন একদিকে রয়েছে অন্যদিকে তেমনি চলছে নানা পাপ ও পঙ্কিলতা।

নিউইয়র্কের অন্ধকার দিকটা আমার দেখার বাসনা নেই। তাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে। প্রবাসে দৈবের বলে জীবতারা খসাতে আমি রাজি নই। কিন্তু এই শহরে চোখ-কান খোলা রেখে ঘোরাঘুরি করলে যথেষ্ট জ্ঞানবান হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক।

আমরা বার দুই গাড়ি বদল করে ম্যানহাটান পৌঁছোলাম। নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম মিউজিয়মে। পাশেই অতিকায় এক পার্ক। সামনে চওড়া রাস্তা। বিশাল মিউজিয়ম-ভবনটি তাকিয়ে দেখার মতো।

আগেই বলেছি আমেরিকায় ডলার না খসিয়ে কোথাও ঢোকবার উপায় নেই। মিউজিয়মে ঢুকতেও আমাদের টিকিট কাটতে হল। ভিতরটা আগাপাশতলা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। ঢুকতেই পেয়ে যাবেন বিনা পয়সায় গোটা মিউজিয়মের ছাপানো গাইড পুস্তিকা, নানা রকম ব্রশিওর। আমি ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের জন্য কিছু নিয়ে নিলুম।

ছবির সমঝদার নই বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমি রঙ-বেরঙের ছবির রাজ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেলুম। কত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ শিল্পকর্ম যে এরা কত কোটি ডলারে কিনেছে এবং আরও কত কোটি ডলার দিয়ে তা সাজিয়েছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মার্কিন ধনতান্ত্রিকতার এটা এক মস্ত অস্তিবাচক দিক। এরা ভাল জিনিসের কদর জানে। আর জানে বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণা-বেক্ষণ।

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন, কী অমূল্য সম্পদ কতখানি জায়গা জুড়ে সাজানো রাখা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে মন দিয়ে দেখতে বেশ কয়েক দিন লেগে যাওয়ার কথা। আমাদের কলকাতার জাদুঘর এর তুলনায় কতটুকু ?

অনেক শিল্পীকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মাস্টারপিসের সামনে বসে ইজেল খাটিয়ে মন দিয়ে কপি করছে। রাফায়েল, টিশিয়ান, ভিঞ্চির সামনেই ভিড় কিছু বেশি।

মাত্র কয়েকদিন আগে শিকাগোর একটি আর্ট মিউজিয়াম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। না জানি সেখানেও কত নামীদামী ছবি ছিল। আমেরিকায় আগুন লাগার ঘটনা কিন্তু আকছার ঘটে থাকে। এদের ফ্লোরিং হয় কাঠ দিয়ে। যদিও কাঠের তলায় সিমেন্ট বা কংক্রিটের ফ্লোরিং থাকে, তবে ওপরের ওই কাঠের ফ্লোরিং বা কাঠের প্যানেলিং অতিশয় দাহ্য বস্তু। সে কারণেই কি না জানি না, আগুন লাগলে তা দ্রুত অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। দমকল এখানে সদাসতর্ক এবং সদাব্যস্ত। বড় বড় রাস্তায় দমকলের গাড়ির জন্য ফায়ার লেন আছে, দমকলের গাড়ির সংকেত পেলেই অন্যান্য গাড়ি ফায়ার লেন ছেড়ে অন্য লেনে সরে যায়। আগুনের ভয় সর্বদা ও সতত রয়েছে বলেই এই সব অগ্রিম ব্যবস্থা। কাঠের ব্যবহার এদেশে ব্যাপক। এত সুন্দর দেশ, তবু রাস্তায় কাঠের খুঁটিতে কেন যে এরা টেলিফোন বা ইলেকট্রিকের তার খাটায় সেটার ব্যাখ্যাও সন্তোষজনকভাবে পাইনি। ব্যাপারটা নয়নসুখকরও তো নয়।

ঘণ্টা চারেক বোধহয় বউদি আর আমি মিউজিয়াম দেখে মোটামুটি একটা

ঝটিকা দেখা সেরে নিচে নামলুম খাওয়ার জন্য। বেশ বড় বড় ক্যান্টিন রয়েছে মিউজিয়ামে। লাইন দিয়ে লোকেরা খাদ্যবস্তু নিচ্ছে কাউন্টার থেকে। আমার খাবার যথারীতি সীমাবদ্ধ। নিরামিষ, দু-তিনটির বেশি পদ পাওয়া গেল না। তবে আমার তাতে ক্ষোভের কিছু নেই। স্বল্পাহার বা অনাহারে আমি বেশ পোক্ত।

খোলা লবিতে বসে খাচ্ছি। সামনেই একটি কাউন্টারে বোধহয় সফট ড্রিংকস সার্ভ করছে একজন বেয়ারা। তার চেহারা বড্ড বাঙালি-বাঙালি। বেঁটে, মোটাসোটা, নিরীহ-দর্শন। বউদিকে বললুম, ও লোকটাকে কি বাঙালি বলে মনে হয়।

হতে পারে। স্প্যানিসদের চেহারাও ওরকম হয়।

কিছুক্ষণ বাদে লোকটি কাউন্টার ছেড়ে সোজা আমাদের টেবিলে চলে এল এবং আমাকে পরিস্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, দাদা কি বাংলাদেশী ?

আমি হেসে বললাম, কইতে পারেন। আমার দ্যাশ ঢাকা। কলকাতায় থাকি। আপনি ?

আমিও ঢাকার।

এখানে কি চাকরি করেন ?

আইজ্ঞা।

আমেরিকায় আছেন কতদিন ?

তা পাঁচ-ছয় বছর হইবো। রিসেন্টলি সিটিজেনশিপ পাইয়া গেছি।

সিটিজেনশিপ পাওয়ার ব্যাপারটি যে তার কাছে লটারি জেতার মতো ঘটনা তা তার মুখে আনন্দের ছটা দেখেই বুঝতে পারলুম। আমেরিকায় যেসব অভিবাসী বাঙালি আছেন তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশী। পাইকারি মার্জনার সূত্রে এরা সবাই সম্প্রতি মার্কিন নাগরিক হয়েছেন। কারণ অনেকেরই বৈধ কাগজপত্র ছিল না। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতি এড়াতেই বোধহয় এরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন দেশে চলে এসেছেন, আমেবিকা এবং ইংল্যান্ডে সর্বাধিক। এদের মধ্যে নিম্ন, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাই বেশি। জাহাজিও আছেন। আবার শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত বৈধ কাগজপত্রধারী মানুষও আছেন। কিন্তু বাংলাদেশীদের সংখ্যা যে বেশ বেশি তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশী বাঙালি আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে তফাত কতটা তা আমরা অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আগতরা খুব একটা অনুভব করি না। দেশ ভাগ হলেও আমাদের অভ্যন্তরে ভাগাভাগিটা তেমন হয়নি। অর্থাৎ ও দেশটা এখনও ততটা পরদেশ হয়ে যায়নি আমাদের কাছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের অজান্তেই আমল পাল্টেছে। পরবর্তী প্রজন্মের বাংলাদেশী এবং পশ্চিমবঙ্গীয়রা এসে গেছেন। এরা কিন্তু পরস্পরের দেশকে পরদেশ বলেই গ্রহণ করেছেন। তাই "ওঃ আপনি ইন্ডিয়ান" এ-কথাটা তাঁরা অনায়াসে বলতে পারেন।

লোকটি আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে বিদায় নিলেন। তাঁর ছুটি হয়ে গেছে, বাড়ি যাবেন। নিউইয়র্কে বাড়ি কিনেছেন। গাড়িও আছে। হ্যাপি ম্যান।

ক্লান্ত পায়ে আমি আর বউদি বেরিয়ে পড়লুম। শরীর ক্লান্ত হলেও আমার মন বা চোখের কোনও ক্লান্তি নেই। আমার চারদিক জুড়ে যে মহতী নগরের জীনস্রোত বয়ে চলেছে, চারদিক জুড়ে যে অসামান্য সব নির্মাণ, যে চাকচিক্য তা যেন টনিকের মতো কাজ করে।

আমি ক্লান্ত হলেও বউদি নন। তাঁর মতো জীবনীশক্তি কম মহিলারই দেখেছি। তিনি কেবলই বলেন, এটা দেখবেন না? ওটা যে দেখা হল না।

আমি মৃদু হেসে বলি, আপনার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো স্ট্যামিনা আমার নেই বউদি। আপনি নমস্য।

আরে পারবেন। আর আপনার দোষই বা কী! সেই এসে থেকে তা কম ঘোরাঘুরি হয়নি। চলুন, বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের বেরোনো যাবে।

তাই হল। বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লুম।

এতকাল পৃথিবীর উচ্চতম বাড়িটি ছিল এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। তাকে হারিয়ে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানেই তৈরি হল জোড়া বাড়ি ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। অবশ্য তাকেও পরাজিত করে শিকাগোতে মাথা তুলেছে সিয়ারস টাওয়ার। এম্পায়ার একশো তিন তলা উঁচু, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার একশো আট তলা। পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম এই বাড়িটির ছাদে উঠবার একটা ছেলেমানুষি বাসনা আমার ছিল। ফিরে গিয়ে অন্তত ছেলের কাছে গল্প করা যাবে যে, ওই উঁচু বাড়িটায় উঠেছিলুম রে।

যামিনীদা অবশ্য নাক সিঁটকে বলেছিলেন, উঁচু বাড়িতে উঠবে। আরে দূর দূর। সব শহরেই একটা করে ওরকম উঁচু বাড়ি থাকে। ওসব কবে খামোকা সময় নষ্ট।

কিন্তু বউদি প্রতিবাদ করেছিলেন, কেন, ওটাও তো নিউইয়র্কের একটা ল্যান্ডমার্ক। তুমি আপত্তি করছো কেন, আমি ওঁকে নিয়ে যাবো।

আমরা আবার সাবওয়ে ধরে এবং খানিকটা হেঁটে পৌঁছে গেলুম জোড়া বাড়ির সামনে। দূর থেকে বার কয়েক দেখেছি। কিন্তু কাছে এসে যখন উঁচু দিকে চাইলুম তখন মনে হল, এ বোধহয় মানুষের হাতে গড়া জিনিসই নয়। এত উঁচু বানাল কি করে?

মার্কিন স্থাপত্যবিদ্যা অন্যান্য দেশের চেয়ে কত দূর এগিয়ে আছে তা তাদের এইসব কীর্তি দেখলে খানিকটা মালুম হয়।

জোড়া বাড়ির একটিতে ওঠা অবশ্য নিষিদ্ধ। কারণ সেটিতে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ দফতর রয়েছে। অন্যটি সর্বসাধারণের জন্য খোলা। দুটো বাড়ির

মাঝখানে মস্ত বাঁধানো একখানা দেখবার মতো চাতাল। সেই চাতালে ভাস্কর্য রয়েছে, অন্যান্য দ্রষ্টব্যও আছে।

বাইরে থেকে বা দূর থেকে বাড়ি দুটিকে দীর্ঘই দেখায়, প্রশস্ত দেখায় না। কিন্তু যখন অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম তখন তার লবির বিশালত্ব থেকে আন্দাজ হল কতটা জায়গা নিয়ে এ বাড়িটা তৈরি।

যথারীতি পরিচ্ছন্ন, চাকচিক্যময় চোখ ধাঁধানো জৌলুস চতুর্দিকে। লিফ্‌টের কাছে মস্ত আঁকাবাঁকা লাইনে দর্শনার্থীরা দাঁড়িয়ে। বেশির ভাগই টুরিস্ট।

ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়াতে হল। ট্রেড সেন্টারের অতিকায় লিফট অনেক লোককে একসঙ্গে তুলতে পারে বটে, কিন্তু যে পরিমাণ লোক হয়েছে তাতে ভিড় সাফ করতে বহুবার তাকে ওঠানামা করতে হবে বুঝতে পারলুম।

অবশেষে আমাদের পালা এল। টিকিট কেটে লিফটে ঢুকে গেলুম। বেস থেকে একশো পাঁচতলা অবধি উঠতে এই এক্সপ্রেস লিফটের সময় লাগে মাত্র উনষাট সেকেন্ড। ভাবা যায় না।

লিফটের গায়ে নানা ভাষায় লেখা রয়েছে স্বাগতবাণী। তার মধ্যে বাংলা ভাষা দেখে চমৎকৃত হলুম।

বউদি বললেন, এই যে বাংলা দেখছেন এ হল বাংলাদেশের সম্মানে। অন্তত একটি দেশ তো পৃথিবীতে আছে যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

সত্যিই তো। ভারতবর্ষে বাংলা নিতান্তই একটি অপ্রধান প্রাদেশিক ভাষা, সেখানে তার কোনও বিশেষ মর্যাদা নেই। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার গৌরব নেই, কিন্তু বাংলাদেশী ভাষা হিসেবে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে।

লিফট একশো পাঁচতলা অবধি যায়। বাকি তিনতলা উঠতে হয় এসকালেটরে। একশো পাঁচতম তলাটি দারুণ সুন্দর কাচে মোড়া একটি অবজারভেটরি। এখানে জমজমাট দোকানপাট ডেলিকাটেসেন বা রেস্তরাঁ ইত্যাদি রয়েছে। কাচের মস্ত মস্ত শার্সির-গা ঘেঁসে বসবার ব্যবস্থা আছে। অনেক লোক বসে আছে।

হঠাৎ পরিষ্কার বাংলা কথা শুনে আমি আর বউদি দাঁড়িয়ে গেলুম। দুটি বিশ বাইশ বছরের ছেলে বসে চুটিয়ে মাতৃভাষায় কথা বলছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে একটু ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সময় কম। আমি আর বউদি তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বাংলায় কথা বলছিলুম। তারা সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে ফিরে তাকিয়ে আমাদের দেখল। হয়তো তাদেরও একটু ইচ্ছে হয়েছিল কথা বলতে।

আমরা এসকালেটরে গিয়ে উঠে পড়লুম। হড় হড় করে উঠে এলুম ছাদে।

ছাদ বলতে আমাদের বাড়ির ছাদ যেমন হয় তেমনটি নয়। রেলিংয়ের ধারে

গিয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই। পাছে কারও ট্রেড সেন্টারের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়ে অমর হওয়ার সাধ জাগে তাই ছাদের ধার পর্যন্ত অনেকটা ছাড় রেখে একটু উঁচুতে আলাদা করে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এখানে দাঁড়ালে চারদিক উন্মুক্ত, অবারিত। গোটা নিউইয়র্ক এসে যায় চোখের সীমানায়। এই বিশাল ব্যাপ্ত নগরীর সৌন্দর্য যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম। তারপর চারদিক ঘুরে ঘুরে ম্যানহাটান, গভর্নমেন্ট আয়ল্যান্ড, ইত্যাদির টোপোগ্রাফি চাক্ষুষ করতে লাগলুম। এত উঁচু থেকে নিচের সব কিছুকেই অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্রকায় মনে হয়, যেন প্লেন থেকে দেখছি।

আধ ঘণ্টা ছাদে ঘুরে ফের অবজারভেটরিতে নেমে এলুম। ছাদে বড্ড গরম ছিল। অত উঁচু ছাদেও কিন্তু বাতাস লাগছিলো না শরীরে। একশো পাঁচতলার শীতাতপনিয়ন্ত্রণে এসে শরীর জুড়োলো।

এখানে থেকেও কিছু স্মারক কিনে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এসব দর্শনীয় স্থানগুলিতে স্মারক বস্তুর দাম এরা এত বাড়িয়ে রাখে যে হাত দেওয়ার উপায় নেই।

ঠাণ্ডা জল খানিকটা খেয়ে আবার লিফট ধরে নেমে এলুম।

অক্লান্ত বউদি বললেন, এবার কোথায় যাবেন বলুন।

চলুন এমনিই একটু হাঁটি।

সেটাই ভাল।

বউদির সঙ্গে খানিকটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হাঁটতে লাগলুম। বউদি নিউ ইয়র্ক চেনেন নিজের করতলের মতো। রাস্তাঘাট সব তার নখদর্পণে। যামিনীদা নিজস্ব চাকরি আর সাংস্কৃতিক চর্চায় ব্যস্ত থাকেন। বউদির ওপর গোটা সংসারের ভার। একা হাতে তিনি সব সামলান।

বউদি গাড়ি চালান বটে, কিন্তু নিউইয়র্ক দেখার পক্ষে নিজস্ব গাড়ি নিয়ে বেরোনো বোকামি। পার্কিং-এর দারুণ অসুবিধে তো আছেই। তা ছাড়া গাড়ি নিয়ে বেরোলে শহরটার শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ যেন অধরা থেকে যায়।

তার চেয়ে সাবওয়ে, বাস, হাঁটা এসবই ভাল।

কোন রাস্তা থেকে কোন রাস্তায় যাচ্ছি তার ধারাবিবরণী বউদি দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোথায় কী পাওয়া যায়, কোথায় কী দেখার আছে ইত্যাদিও।

গরমে একটু কষ্ট হচ্ছিল বটে, কিন্তু বউদির সঙ্গে এই পায়ে হেঁটে দেখে বেড়ানোটা একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে রইল। নিউইয়র্কের অনেকটা চিনলুম বটে কিন্তু জানি, ভুলে যেতেও দেরি হবে না।

রাত-জাগা আমার ভারি প্রিয় অভ্যাস। লেখালেখি ভাবনা-চিন্তাব পক্ষে নিশুত রাতের এমন অনাবিল অবকাশ আর নেই। তাই বহুকাল ধরে আমার রাত্রি

জাগরণের একটি অভ্যাস আছে। সেই নিশি জাগরণ যদি আড্ডার কারণে হয় তাহলেও তেমন খারাপ লাগে না।

আমার মতো যামিনীদারও এই রাতচরা স্বভাব আছে। লোকটি মূলত আড্ডাবাজ। তবে তাঁর আড্ডার বিষয়বস্তু কিছু উচ্চাঙ্গের। মার্কিন শিল্পকলা, সংগীত ও নাটক নিয়ে তাঁর চর্চা বেশ গভীর।

একটু অনুযোগের গলায় বললেন, এখানে যেসব বাঙালি এসে বাস করছে তাদের মুশকিল কী জানো ? তারা ডলার কামানো আর সুখে থাকা ছাড়া আর কিছু বুঝতে চায় না। দেখবে বাঙালিরা আমেরিকার মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে মিশতে পারে না বা চায় না। তারা তাদের মতো করে থাকে, আলগা আলগা, আলাদা। অথচ এ দেশটার একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে, ব্যাপক সাংস্কৃতিক চর্চা আছে, কিন্তু সে খবর ওদের কাছে পাবে না। এখানকার কৃষ্ণাঙ্গদেরও আছে ভিন্নরকম একটা কালচারাল ভেনচার। এখানকার বাঙালিরা এসবের ধারই ধারে না।

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, এখানে বাঙালিরা একটা আলাদা প্যারালাল কালচার গড়ে তুলতে চাইছে নিজেদের আইডেন্টিটি বাঁচিয়ে রাখতে।

যামিনীদা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, সেটাই বা কেন করবে ? আমেরিকায় যখন খুঁটি গেড়েছে তখন এদেশের মতোই তো হয়ে যাওয়া উচিত। আলাদা আইডেন্টিটি ধরে রাখতে গিয়ে কী জগাখিচুড়ি হচ্ছে দেখছো না ? বাচ্চাগুলো মার্কিন কালচারে মানুষ, সেগুলোকে ধরে ধরে বাঙালি কালচার গেলাচ্ছে। ফলটা হচ্ছে কী ?

বকচ্ছপ বা হাঁসজারু ?

যামিনীদা হাসলেন। বললেন, আমেরিকায় থেকে বাঙালি কালচার নিয়ে বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়। আলটিমেটলি এই সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে হবেই।

ব্যাপারটা এক এক জন এক একরকম ভাবে দেখবেন। সকলেই কিন্তু আপনার মতো করে ভাববেন না। বঙ্গ সম্মেলনের বক্তৃতায় আমি বলেছিলুম, আমেরিকা তো দূরস্থান কলকাতার ইংলিশ মিডিয়মে পড়ে কত বাঙালি ছেলেমেয়ে বাংলা ভুলে যাচ্ছে। অথচ দেখবেন, কলকাতাতেই গুজরাতি বা মাড়োয়ারি আছেন, আমেরিকাতেও আছেন, তাঁরা সহজে নিজেদের মাতৃভাষা বা আচার-ব্যবহার ভুলছেন না।

এইভাবে চাপান-ওতোর চলতে লাগল। রাত নিশুত হতে লাগল। বউদি শুতে চলে গেলেন। আমরা রাত দুটো আড়াইটে অবধি চালিয়ে গেলুম। তবে বিতর্কের একটা সুবিধে আছে। শেষ অবধি কেউই হারে না বা জেতে না। সমস্যাটা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায় এবং কেউই তার নিজের মত পাল্টে ফেলে না। •

যামিনীদা যাই বলুন, মার্কিন-প্রবাসী যেবস বাঙালি নিজেদের ভাষা বা সংস্কৃতি ধরে রাখতে চাইছেন বা ধরে রাখার উপায় চিন্তা করছেন আমার ভোট তাঁদের পক্ষেই। বাঙালি বড্ড বেশি আত্মবিস্মৃত জাত। তার কোনও জাতীয় চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব নেই। চারিত্রিক দৃঢ়তারও একান্ত অভাব। তাই বাঙালি সহজেই অন্য কালচারের দ্বারা আক্রান্ত ও বশীভূত হয়। মার্কিন বাঙালিরা যদি এই রোগের টিকা আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে দেশের বাঙালিরাও উপকৃত হবেন। তাঁরা পারুন বা না পারুন এ নিয়ে যে তাঁরা ভাবছেন সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যামিনীদাকে রাত আড়াইটে অবধি এটা বুঝিয়ে উঠতে পারিনি।

বেশ রাত করে ঘুমিয়েও যামিনীদা সাত সকালে উঠে অফিসে চলে যান। সকালে উঠে পুজোআচ্চা সেরে আমি সকালের নরম আলোয় জানালা দিয়ে নিউইয়র্ক দেখছিলুম। শহরটা যতবার দেখি ততবারই এক আকর্ষণ টের পাই। সম্মোহনকারী কী একটা রহস্যময় জাদু আছে এ শহরের। এই জাদু আছে কলকাতারও। চিরকালের মতো যে শহরের সম্মোহনে আমি বাঁধা পড়েছি।

বেশ কয়েক বছর আগে আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়ে খানিকটা হতাশ হয়েছিলাম প্রথমে। তারপর সবটা ঘুরেটুরে দেখে যখন ফিরে আসছি তখন কেন যে অমোঘ অথচ দুর্বোধ্য এক আকর্ষণে বারবার ফিরে চাইছিলুম তার ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাই না। তাজমহল যেন এখনও আমাকে ডাকে।

নিউইয়র্কে কোনওদিনই আমি পাকাপাকিভাবে থাকতে পারব না। কিন্তু সুযোগ পেলেই চলে আসব। বারবার। বারবার।

সকালের জলখাবার খাওয়ার সময়ে বউদি বললেন, চলুন আজ আপনাকে ফোরটিনথ স্ট্রিটে নিয়ে যাবো।

সেটা আবার কোন এলাকা ?

নিউইয়র্কের সস্তার বাজার। একটু ভয়ের জায়গাও। দিনদুপুরে ম্যাগিং হয়।

ঘাড় নেড়ে বললুম, চলুন।

সাবওয়ে ধরে আমরা দুপুরের আগেই পৌঁছে গেলুম ফোরটিনথ স্ট্রিটে।

এ কথা সত্য যে, নিউইয়র্কের অন্যান্য এলাকার মতো আভিজাত্য এই এলাকার নেই। তুলনামূলকভাবে এটা নিশ্চয়ই দরিদ্রতর অঞ্চল। তবু এই ফোরটিনথ স্ট্রিটের বর্ণাঢ্যতাও আমাদের কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের চেয়ে অনেক বেশি। রাস্তা বিশেষ রকমের চওড়া এবং চারদিক চমৎকার ঝকঝকে এবং ঝলমলে। আমরা দোকানে দোকানে ঘুরতে লাগলুম। কোনও বিশেষ সওদা নয়, সস্তায় যা পাওয়া যায় কিনে নেবো—এরকম মনোভাব। বেশির ভাগ দোকানেরই দুটো বিভাগ। ওপরে রাস্তার লেভেলে একটা আর বেসমেন্ট বা মাটির তলায় একটা দোকানে জিনিসপত্রের স্টক দেখলে মাথা ঘুরে যায়। মাত্র নব্বই সেন্ট দিয়ে

প্রকাণ্ড এক বোতল শ্যাম্পু এবং আরও কম দামে তরল সাবানের একটা ফাইল কিনে ফেললুম। দেড় ডলার দামে ভ্যানিটি ব্যাগ পেয়ে তাও কিনে ফেলা গেল দুটি। সস্তায় পেয়ে একসেট টুথব্রাশ কিনে ফেলা গেল। এবং কিছু সাবান। তবে জামাকাপড় বা টি শার্ট তেমন সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল না। ঘুরেফিরে দেখলুম, আমাদের দেশের জামাকাপড় গুণগত উৎকর্ষ কারও চেয়ে কম তো নয়ই, দামেও বেশ সস্তা। নিউইয়র্কে পাঁচ ডলারে যে-সব টি শার্ট বিক্রি হচ্ছে কলকাতায় তার দাম পনেরো থেকে কুড়ি টাকা হলেই ঢের। দিল্লিতে আরও কম দামে পাওয়া যায়। নিউইয়র্কের বিভিন্ন দোকানে সুতোর কাজ-করা চমৎকার এক ধরনের শার্ট শো কেস-এ সাজানো দেখেছি। আঠাশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডলারের মতো দাম। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওই দামে শার্ট কিনতে সাহস পাইনি। কারণ যতবার গায়ে দিতে যাবো ততবার দামের কথা ভেবে বাধো বাধো ঠেকবে এবং পরতে ভারি কার্পণ্য আসবে।

কলম কিনবার ইচ্ছে ছিল। দামের জন্যই হয়নি। ফলে আমেরিকায় নিজের জন্য কেনাকাটার ভাবনাটা মাথা থেকে তাড়ালাম। এখন বাড়ির লোকজনের জন্য যা কিছু ছোটোখাটো উপহার কেনার কথাই ভাবা দরকার।

কেনাকাটার চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষক হল, মার্কিন সওদা দেখে বেড়ানো। এই সব বিচিত্র জিনিস এবং এত তার বৈচিত্র্য যে, দোকানে দোকানে স্রেফ ঘুরে বেড়ালেও অনেক জ্ঞাণ লাভ ঘটে যায়। আমার মেয়ের এখন কম্পাস লাগে না, জ্যামিতির পাট শেষ করে সে আর্টস পড়ছে, ছেলে মোটে ক্লাস ফোর, তারও জ্যামিতি শুরু হয়নি। তবু একটি বিচিত্র সুন্দর কম্পাস সস্তায় বিকোচ্ছে দেখে ঝপ করে কিনে ফেললুম। এই সব পাগলা পরিকল্পনাবহির্ভূত কেনাকাটায় বউদিও আমাকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, আরে কিনে ফেলুন, এমন সস্তা আর ভূ-ভারতে পাবেন না! যা পছন্দ হয় কিনে ফেলুন।

ফোরটিনথ বেশ লম্বা রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছি, দোকানপাটের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। মনোহারী, জামাকাপড়, লেদার গুডসের পর আমরা চলে এলুম ইলেকট্রনিক্সের রাজ্যে। রিমোট কন্ট্রোল খেলনা বা মোটর গাড়ি ফুটপাতেই বিক্রি হচ্ছে। আর ফুটপাতেই চত্বর ও সন্দেহজনক চেহারায় কৃষ্ণাঙ্গরা হাতে তাস সাফল করতে করতে পথচারীদের আহ্বান করছে ইনস্ট্যান্ট জুয়ায়। এক মেমসাহেব এক ডলার বাজি ফেলতেই এক কৃষ্ণাঙ্গ ঝপ করে তাক বেঁটে দিয়ে বলল, ইউ উইন। বলেই দু ডলার দিয়ে দিল। এটা টোপ। আরও খেলার জন্য প্ররোচিত করা। বউদি যথেষ্ট সাহসী মানুষ। টুক করে মেমসাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা স্বরে বললেন, ডোন্ট স্টে হিয়ার এনি মোর। ইউ আর বিয়িং ট্র্যাপড।

বলেই দুজনে জায়গাটা একটু দ্রুত পায়ে পেরিয়ে গেলুম।

মোড়ের কাছ বরাবর একটা রেস্তরাঁ দেখে বউদি আমাকে নিয়ে ঢুকলেন। ছোটো দোকান। পিজাই তার প্রধান আকর্ষণ।

পিজা জিনিসটা বেশ লেগেছিল। আবার গরম পিজা খিদের মুখে চমৎকার লেগেছিল।

খেয়ে দেয়ে বেশ আলসেমি লাগল। আজ আমাদের মিউজিয়ম অফ মর্ডান আর্টে যাওয়ার কথা। বিকেলে নাটক দেখার প্রোগ্রাম।

বউদি বললেন, মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম যেতে বাস ধরতে হবে।

আমি একটু উজ্জীবিত হলুম। এখানে এসে অবধি বাসে চড়া হয়নি। এখানকার বাস কেমন, কলকাতার মতোই কি না সেটা জেনে যাওয়া উচিত।

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে গেলুম। বাসে ওঠার লোক বিশেষ নেই।

আমরা উঠব সাত নম্বর বাসে। দু একটা বাস চলে গেল। ভারি সুন্দর স্ট্রিমলাইনড তাদের গড়ন এবং একতলা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে গেল অভিপ্রেত সাত নম্বর। এল বেশ স্তিমিত মসৃণ গতিতে, কলকাতার বাসের মতো গাঁক গাঁক করতে করতে ভয়াবহ গতিতে এসে সে আচমকা প্রাণান্তকর ব্রেকের আওয়াজ তুলে দাঁড়ানো নয়। নরমভাবেই থামল এবং স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে গেল। কন্ডাক্টরের বালাই নেই। ড্রাইভার একাই চালক এবং টিকিট বিক্রেতা। উঠতেই একটা স্লট মেশিনের মতো যন্ত্র। পয়সা নয়, তাতে ফেলতে হয় সেই চাকতি যা সাবওয়েতে যেতে লেগেছিল। ড্রাইভার সাধারণত টিকিট দেয় না, তবে চাইলে দেয়। টিকিটের লম্বা ফিতের রোল ড্রাইভারের মাথার কাছেই ঝুলে আছে।

কৃষ্ণাঙ্গ চালকটিকে দেখে ভারি ভাল লাগল। বয়স ত্রিশের এপিঠ-ওপিঠ। গম্ভীর ব্যক্তিত্বময় চেহারা। আর দারুণ স্মার্ট। এক অশীতিপর বৃদ্ধা বাসে উঠেই জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াটস দি নাম্বার?

ড্রাইভার গম্ভীর গলায় বলল, ইটস সেভেন সুইটহার্ট। জাস্ট লুক আপ টু দি সাইন।

সুইটহার্ট শুনে বৃদ্ধার মুখে ভারি খুশির হাসি ফুটে উঠল।

একজন পঙ্গু হুইলচেয়ারসমেত বাসে উঠবে বলে অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার চাবি নিয়ে গিয়ে বাসের মাঝ বরাবর একটা বন্ধ দরজা খুলে দিল। সেই দরজার ব্যবস্থা এমনই যে, ফুটপাত থেকে অনায়াসে হুইলচেয়ার নিয়ে উঠে এল লোকটি।

নিউইয়র্কে বাস ততক্ষণই স্টপে দাঁড়ায় যতক্ষণ না ওঠানামা নিশ্চিতভাবে শেষ হয়। কেউ পড়ে থাকে না, কেউ রয়ে যায় না বাসের মধ্যে, তেমন তাড়াহুড়োও নেই। বাসে ভিড় বলেও কিছু নেই। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই সব বাসগুলি বিশেষ রকমের আরামদায়ক। চলে মন্দ গতিতে।

স্মার্ট ভদ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাস ড্রাইভারটির মুখশ্রী আমি আজও ভুলিনি।

কয়েক স্টপ পরে আমরা নামলুম। একটু হেঁটেই মিউজিয়ম অফ মডার্ণ আর্ট। এও এক বিশাল মায়াপুরী। আগাগোড়া শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই মিউজিয়মের অভ্যন্তরে এসকালেটরও আছে। আর এতই বিশাল যে, মনে হয়, ঘুরে দেখতে দিন সাতেক লেগে যাবে। ভাল করে দেখতে গেলে লাগবেও তাই। তবে আমি তেমন শিল্প-সমঝদার নই বলে ততটা সময় নিলাম না। আমার প্রিয় শিল্পী যাঁরা খুজে খুঁজে তাঁদের ওরিজিন্যাল কাজ দেখতে লাগলাম! মন্দ্রিয়ান কত বড় শিল্পী তার বিচার রসিকজন করবেন কিন্তু তাঁর জ্যামিতিক নকসা বা চৌখুপির সামনে আমি বিশেষ সময় ব্যয় করিনি। আর মার্কিন আধুনিক শিল্পের নামে যেসব ধ্যাস্টামো আর হাস্যকর কাটুম কুটুম আছে তা আমার ক্ষেত্রে কমিক রিলিফের কাজ করেছে মাত্র। অত বড় মিউজিয়মে সাভভাদোর দালির মাত্র একটি কাজ খুঁজে পেলুম। পিকাসোর অবশ্য অনেকগুলো কাজ আছে। চমৎকার।

যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হল, ছবি বা ভাস্কর্যের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য আশপাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। গায়ে গায়ে সাজানো হয়নি। তেমনি রুচিসম্মত হল আলোর ব্যবস্থা। আলো চোখে লাগে না, কিন্তু ছবির খুঁটিনাটি অবধি ফুটিয়ে তোলে। মনের অনেক বিশাল বিশাল কাজ রয়েছে এখানে। পৃথিবীর সব কজন আধুনিক শিল্পীর কাজই রয়েছে। ঘণ্টা চারেক লাগল শুধু বেছেবুছে ছবিগুলো দেখে উঠতেই।

ঘণ্টা চারেক পর, বেশ ক্লান্ত লাগছিল। চোখেও কিছুটা ধাঁধা। তবু বেশ ভাল লাগছিল। এই মিউজিয়মের খ্যাতি বিস্তর শুনেছি। সেই খ্যাতি অকারণ নয়, বোঝা গেল।

জীবনে আমি সাইকেল ছাড়া আর বিশেষ কোনও যানবাহন চালাইনি স্বতশ্চল গাড়ি অর্থাৎ মোটরগাড়ি, মোটরবাইক, বিমান বা ঐ জাতীয় কিছুই চালানোর প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু এইসব যানবাহনের প্রতি আমার একটি সহজাত কৌতূহল আছে। এই প্রতিবেদনে এর আগেও তার উল্লেখ করেছি, গাড়ি বা মোটরবাইক নতুন ধরনের হলে তা লক্ষ করা আমার একটা নেশা।

কিছুকাল আগে আমার এক আত্মীয় একটি অটোমেটিক গিয়ারের স্কুটার কিনেছে। একদিন লেক-এর ধারে নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে সে আমাকে বলল, একটু চালিয়ে দেখুন তো!

স্কুটারটি বেশ দামী এবং ঝকঝকে। আমি তার পিছনে দু একবার চেপেছিও। কিন্তু চালানোর প্রস্তাবে সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বললুম, ও বাবা, ও আমি পেরে উঠব না। যে সব জিনিস নিজে নিজে চলে তাতে চাপতে আমার একা ভরসা হয় না।

সে খুব হাসল এবং সাহস দিয়ে বলল, সাইকেল চালাতে তো জানেন।

সুতরাং ব্যালান্সটা আছে। ওতেই হবে। আর গিয়ার না থাকায় এতে ঝামেলাও বিশেষ নেই।

তবু আমি সাহস পাই না। কপাল খারাপ, এই ঘটনার সময় আমার শিশুপুত্রও উপস্থিত। সে তার বাবার কাপুরুষতা দেখে খুব হাসছে আর মনে মনে দুয়ো দিচ্ছে। সুতরাং দোনোমোনো করে একসময়ে চেপে বসলাম। বার কয়েক যন্ত্রপাতি বুঝে নিয়ে টুক করে ছেড়েও দিলুম। এবং স্কুটার দিব্যি আমাকে নিয়ে ছুটতে লাগল। এবং ব্যাপারটা এত হাস্যকর রকমের সহজ বলে মনে হল যে, আগের ভয়টার কারণই খুঁজে পেলুম না।

যাই হোক, আমার বাহাদুরি ওই স্কুটার চালানো অবধি আটকে আছে। বেশি দূর এগোয়নি।

মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট দেখে বেরিয়ে যখন বউদির সঙ্গে হাঁটছি তখন হঠাৎ রাস্তার ধারে একখানা মোটরবাইক দেখে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দাঁড়িয়ে পড়ার মতোই ঘটনা। ভারতবর্ষে আমি বিস্তর মোটরবাইক দেখেছি বটে, কিন্তু এরকম পেল্লায় এবং বিস্ময়কর যন্ত্র আর দেখিনি। আমেরিকা বৃহতের দেশ বটে। কিন্তু মোটরবাইকটাও এরকম ম্যাগনাম সাইজের বানানোর কী দরকার তা বুঝে ওঠা কঠিন। একজন গড়পড়তা গড়নের মানুষের পক্ষে দুচাকার ওপর এই বিশাল জিনিসটি সামলানো কি সোজা কথা ?

আমার হিসেবে মোটরবাইকটি লম্বায় অন্তত আট-দশ ফুট হবে। যন্ত্রপাতি অতিশয় জটিল এবং বিভ্রান্তি ঘটানোর মতো। সামনে যে প্যানেলটি আছে, অর্থাৎ স্পিডোমিটার ইত্যাদি যেখানে থাকে সেটি এতই প্রশস্ত এবং তাতে এত রকমের ডায়াল ও ডিসপ্লে রয়েছে যা জেট বিমানের প্যানেলেই বুঝিবা থাকে। এই সুবিশাল মোটরবাইকটি চালানোর জন্য নিশ্চয় সুবিশাল মানুষও দরকার।

বউদিকে বললুম, দাঁড়ান, যন্ত্রটা দেখে নিই।

বউদি হাসলেন, দেখুন না। এদের অবশ্য সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। একটা মোটরবাইক বানিয়েছে তারও কী বিচিত্র ব্যাপার-স্যাপার।

কথা বলতে বলতেই একজন মাঝারি মাপের সাহেব এসে মোটরবাইকটি স্ট্যান্ড থেকে নামাল।

একটু এগিয়ে গিয়ে বললুম, হেল অফ এ বাইক, আইন্ট ইট !

সাহেবের রুক্ষ মুখটা এই প্রশংসায় নরম হয়ে গেল। তটস্থ হয়ে বলল, ইয়া, রাইডস ওয়েল। থ্যাংক ইউ।

সাহেব প্রকাণ্ড মোটরবাইকটায় উঠে স্টার্ট দিল। ভয়াবহ কোনো শব্দ হল না। বরং শব্দই হল না কোনও। প্রায় নিঃশব্দে স্টার্ট নিয়ে শব্দহীন মসৃণ গতিতে যান্ত্রিক মহিষটি ছুটে চলে গেল।

আমেরিকার হাইওয়েতে এই সব বিকট মোটরবাইক আমি অবশ্য অনেক দেখেছি, তবে কাছ থেকে খুঁটিয়ে এই প্রথম দেখলুম।

যন্ত্রপাতির প্রতি আমার রহস্যময় আকর্ষণটা আমার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য। কোনও যন্ত্রপাতিরই সুচারু ব্যবহার জানি না। তবু চাঁদনি মার্কেট থেকে প্রায়ই তুরপুন, করাত, প্লাস, রেনজ কিনে আনি আর বউয়ের বকুনি খাই, কিছু ভাঙলে বা সারাতে হলে সেই মিস্ত্রিই ডাকতে হয়।

আমার যন্ত্রপ্রীতিই বোধহয় মোটর বা অন্যান্য যানবাহনের প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করে তোলে।

খাওয়ার পর খুব বেশি হাঁটাহাঁটি আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া আজ ঘোরাঘুরিও বড়ো কম হয়নি। তাই ক্লান্ত লাগছিল। বউদিকে বললুম, বউদি, আজ থিয়েটারের প্রোগ্রামটা বাদ দেওয়া যায় না ?

বাদ দেবেন ? কিন্তু আপনাকে নিয়ে তো সোজা আমার ব্রডওয়ে যাওয়ার কথা। ওখানে আপনার যামিনীদা যে টিকিট কেটে অপেক্ষা করবেন।

ম্লান একটু হেসে বললুম, তা হলে চলুন যাই। তবে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব।

বউদি সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, তা হলে গিয়ে কাজ নেই। দাঁড়ান, ওকে একটা টেলিফোন করে দিই তা হলে। এখনও অফিসে আছে।

এই যে যত্রতত্র যখন খুশি কাউকে টেলিফোন করা এটা কলকাতায় কতই অসম্ভব। দোকানদার বা অফিসের লোকের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। পাবলিক টেলিফোন কলকাতায় কটা আছে তা হাতে গুনে বলা যায়। আর তার কটা সচল এবং জ্যান্ত তাও ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। আমেরিকায় টেলিফোন যত্রতত্র। সব সময়েই সর্বত্র হাতের নাগালেই যন্ত্রটি পাওয়া যায়। এমন কি হাইওয়েতেও অসুবিধেয় পড়তে হয় না।

সুতরাং বউদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেলিফোন করে ফিরে এসে বললেন, ওকে অফিসেই পেয়েছি। চলুন, নাটকে যেতে হবে না। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেবেন।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, নাটকে যখন যাচ্ছিই না তখন চলুন আর একটু ঘোরাঘুরি করে ফিরি।

তাই হবে।

বিশ্বের সর্বত্রই এখন সিনেমা হলগুলির বেশ দুর্দশা চলছে। তার কারণ টিভি এবং ভিডিও। সম্প্রতি এই দুরবস্থা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য চেঁচামেচিও বড়ো কম হচ্ছে না। তা সিনেমার এই দুর্দিন অগ্রসরতর দেশে শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে। ভারতবর্ষে এখনও সব বাড়িতে টিভি নেই, ভি

সি আর বা ভি সি পি আরও অনেক কম। শহরগুলিতে ভি ডি ও পার্লার সবে চালু হয়েছে। তাতেই হল-মালিকদের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। সেক্ষেত্রে আমেরিকায় ভি সি আর এবং টিভি বহুগুণ বেশি। ঘরে ঘরেই আছে। সুতরাং সিনেমা হল ব্যবসা বিশেষ পায় না। তবু অবিরল ছবি চালিয়ে এবং হল ছোটো করে বা এক সঙ্গে একগুচ্ছ ছোটো হল করে নানাভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখছে। কাজেই আমেরিকায় সিনেমা হলের সামনে ভিড় বা লাইন নেই। কিন্তু আমি যে-সময়ে আমেরিকায় ছিলুম সেই সময়ে লাস্ট টেম্পটেশন অফ ক্রাইস্ট নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে। এবং মডার্ন আর্ট যেদিন দেখে বেরোলুম সেদিনই ছবিটি রিলিজ করল।

সামনেই একটা চেঁচামেচি শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, একটা সিনেমা হলের পাশে অন্তত হাজার দুয়েক লোকের জমায়েত। বক্তৃতা হচ্ছে, বিক্ষোভ। পথচারীদের হাতে হাতে বিলি করা হচ্ছে এই ছবির বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানদের বিক্ষোভ ও বেদনার কথা। এবং তীব্র প্রতিবাদও।

খুব ভাল লাগল, খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রতিবাদ জানানোর পদ্ধতিটি। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে তাঁরা মানুষকে বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, কেন এই খ্রিস্টের পক্ষে অবমাননাকর চলচ্চিত্রটি মানুষের দেখা উচিত নয়। অন্যদিকে হল-এ ঢুকবার জন্য মানুষের দীর্ঘ লাইন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। আমেরিকার সিনেমা হল-এর সামনে এই প্রথম ভিড় দেখলুম। এবং বেশ ভাল রকমের ভিড়। যাকে বলা যায় হাউস ফুল।

আমেরিকায় যত হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা বা বিজ্ঞপ্তি পেয়েছি সবই সযত্নে সঙ্গে করে এনেছি। তার মধ্যে এই হ্যান্ডবিলটিও ছিল। পরে অবশ্য সেটা আর খুঁজে পাইনি। ট্রানজিটে কোথাও হারিয়ে গিয়ে থাকবে।

সিনেমা হল-এর বিক্ষোভ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনা হল। বক্তারা যা বলছেন তাতে আবেগ আছে বটে, কিন্তু যুক্তি এবং ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করেই। তাতে অনাবশ্যক আক্রমণ বা ঝাঁঝ নেই।

নিউইয়র্কে যাদের গাড়ি আছে, তাদের শতকরা বোধহয় নব্বই ভাগেরই গ্যারেজ নেই। যত গাড়ি তত গ্যারেজ করতে হলে গোটা শহরের অনেকটাই চলে যাবে। আমেরিকানরা ঘোরতর গাড়িবাজ এবং অনেকেরই একাধিক গাড়ি আছে। সুতরাং সেসব গাড়ি রাস্তাতেই পড়ে থাকে। যামিনীদাদের গাড়িটিও রাস্তাতেই পার্ক করা থাকে বারো মাস। তবে তারও নিয়ম আছে। শুক্রবার রাস্তার উত্তর দিকটা পরিষ্কার করে ঝাঁটপাট দেওয়া হবে বলে ওই দিন ওদিক গাড়ি পার্ক করা চলবে না। রাখতে হবে দক্ষিণ দিকে। ভুল হলে জরিমানা এবং জবাবদিহির ঝামেলা আছে। সুতরাং এ ব্যাপার নিয়েও গেরস্থর বেশ টেনশন থাকে, বউদি এবং যামিনীদারও গাড়ি রাখা নিয়ে বার বার আলোচনা হচ্ছিল শুক্রবার সকাল

থেকে। আলোচনাটি এমনই সিরিয়াস যে, গাড়িটা আমার না হলেও এবং আমার কিছু না গেলে এলেও, টেনশনটা আমাকেও এমন সংক্রমিত করল যে বারকয়েক জিজ্ঞেস করে ফেললুম, বউদি, গাড়িটা যেন কটায় উল্টোদিকে পার্ক করতে হবে।

যাকগে, টেনশন কাটবার পর ব্রেকফাস্ট সেরে আবার বেরিয়ে পড়া গেল এবং সারাদিন সাবওয়ে বাস ইত্যাদিতে চড়ে অনির্দেশ্য ঘুরে বেড়ালুম বউদির সঙ্গে। এর মধ্যেই কলম্বাস থেকে তনুশ্রীর ফোন এল, শীর্ষেন্দুদা কবে আসছেন ? আমরা যে হাঁ করে বসে আছি।

ওয়াশিংটন থেকে দীপঙ্কর ফোন করল, কবে আসছেন ? অনেকদিন আপনার সঙ্গে আড্ডা হয়নি। সেই আনন্দবাজারের নিউজ ডেস্কে কাজ করার সময় নাইট ডিউটি দিতে দিতে যেমনটি হত !

ফোন এল লস এনজেলেস থেকে এমদাদ খানের, দাদা, আপনার কিন্তু লস এনজেলেসে আইতেই হইবো। সব ব্যবস্থা হইত্যাছে।

উইক এন্ড ছাড়া আমেরিকাবাসীদের বেড়ানো খেলানো আমোদ-ফূর্তির জো নেই। সাপ্তাহিক দিনে প্রত্যেকেরই হাড়ভাঙা খাটুনি। কাজে ফাঁকি ব্যাপারটাই এখানে চলে না। চাকরির স্থায়িত্ব বলেও কিছু নেই। কাজেরই দাম। কাজে ভুলচুক হলেই পত্রপাঠ বিদায়। সুতরাং ফাঁকিবাজি করে মার্কিন মুলুকে টিকে থাকা কঠিন ও প্রায় অসম্ভব।

উইক এন্ডে অর্থাৎ শনিবার সকালবেলায় যামিনীদা ও বউদির সঙ্গে ওয়াশিংটন রওনা হওয়া গেল। যামিনীদাদের গাড়িতে এই প্রথম উঠলুম। ব্যবহার হয় না বলে গাড়িটি অবহেলিত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকে। গাড়িতে উঠে দেখি পিছনের সিটের ডানধারে যামিনীদার ছোট্ট নাতিটির জন্য একটি সেফটি বেল্ট লাগানো ছোট্ট চেয়ার সাঁটা আছে। সেদিকটায় বসবার উপায় নেই। বসতে হল বাঁদিকে। যামিনীদা আর বউদি সামনে। বউদি চালক আর যামিনীদা স্বঘোষিত ন্যাভিগেটর।

যাচ্ছি দক্ষিণে সুতরাং বাঁদিকে পড়ে পুব দিক। ফলে সকালের চড়া রোদ গায়ে এসে পড়ল। গাড়িতে উঠবার পর দুঃসংবাদটি জানা গেল, এ গাড়িটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয়।

যামিনীদা বা বউদি কেউই বিলাসী মানুষ নন বলে এসব ব্যাপারে উদাসীন। গাড়ি একটা রাখতে হয় বলে রাখা, সেটি বিলাসবহুল বা আরামদায়ক কিনা তা নিয়ে তাঁরা মোটেই ভাবিত নন।

দুঃসংবাদ আরও একটি জানতে পারলুম গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণ বাদে। পিছনের জানালার কাচ ফিক্সড। অর্থাৎ বাইরের বাতাস ঢুকবার পথ নেই। এমনিতেই আমার ঘাম বেশি হয়। তাতে আবদ্ধ জায়গায় এই গরমে ওয়াশিংটন

পর্যন্ত যেতে যেতে আমি না মোমবাতির মতো গলে নিঃশেষ হয়ে যাই !

ব্রুকলিন ছেড়ে নিউইয়র্কের সীমানা পেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ার পরও শরীরে হাওয়া লাগল না। রোদ চড়তে লাগল। তবে মার্কিন প্রকৃতি এবং দৃশ্যবলী চোখের পক্ষে এক অতি উপভোগ্য ভোজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরকে অর্ধেক ভুলে গেলুম।

বউদি গাড়ি ভালই চালান এবং যথেষ্ট সাবধানী। কিন্তু যামিনীদা পদে পদে তাঁর ভুল ধরতে লাগলেন, আহা, ওদিকে টাল খেল কেন গাড়ি !....উঁহুঁ ওই ট্রাকটাকে পাস করতে দাও...লেনটা চেঞ্জ করা উচিত ছিল....

আমি বললুম, যামিনীদা, প্লিজ, বউদির মনোযোগ কোনওরকম ব্যাঘাত ঘটাবেন না। উনি ভালই চালাচ্ছেন।

যামিনীদা তাঁর অসম্ভব সাদা দাঁতে শিশুর মতো হাসলেন।

ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়েছি। ব্রেকফাস্ট হয়নি। ঘণ্টা দেড় দুইয়ের রাস্তা পার হয়ে আমরা এক বিশাল রেস্তরাঁর চত্বরে গাড়ি ভেড়ালুম।

দেখলুম রাস্তায় বেড়িয়ে পড়া আমেরিকানদের সংখ্যা বড়ো কম নয়। উইক এন্ডে যে হাজারে হাজারে মানুষ বেরিয়ে পড়ে তাদেরই কয়েক শো এখানেও প্রাতরাশ সারতে ঢুকে পড়েছে। বিশাল পার্কিং-লট-এ গিজগিজ করছে নয়নমুগ্ধকর সব গাড়ি। দামী, অতি দামী, অবিশ্বাস্য দামী। এইসব গাড়ির ভিড়ে অনেক কষ্টে একখানি স্পেস পেয়ে তাতে গাড়ি ঢুকিয়ে আমরা নামলুম।

রেস্তরাঁ বলতে শুধু রেস্তরাঁই তো নয়। তাতে খুচখাচ অন্যান্য জিনিস কেনার দোকান, বাচ্চাদের খেলা বা সময় কাটানোর আয়োজন, ফোয়ারা, বই বা পত্র পত্রিকার স্টল, নানা কিছু আছে। আর রেস্তরাঁর খাওয়ার ঘরটি বেশ বড় মাপের-- শতাধিক লোক বসে খেতে পারে।

আমি নিলুম ফলের রস, গরম আলুভাজা আর টোস্ট, পরে চা। কাচে ঘেরা রেস্তরাঁটিতে বসে বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার উপভোগ করা যায়। আমি অবশ্য গাড়ির সেদ্ধ-হওয়া গরম থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করছিলুম রেস্তরাঁর শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরের আরামটুকু।

ওয়াশিংটনে যামিনীদার বড় ছেলে সদ্য একখানা বাড়ি কিনেছে। সেই বাড়িতে প্রথম যাচ্ছেন এঁরা। আজকের মধ্যাহ্নভোজও সেখানেই হবে। তাঁরা বসে থাকবেন। সুতরাং রাস্তায় কালক্ষেপ করা চলবে না। পথও তো কম নয়। তবে আমেরিকায় দু চারশো মাইলের দূরত্বকে কেউ গায়েই মাখে না।

একটু অনিচ্ছের সঙ্গেই রেস্তরাঁর শীতলতা ছেড়ে বেরোলম। আবার সেই ফার্নেসের মতো গরম গাড়ির অভ্যন্তর।

যামিনীদা নানারকম পথ-নির্দেশিকা বাতলাচ্ছেন দেখে সভয়ে বললুম. যামিনীদা, বউদি রাস্তাঘাট ভালই চেনেন। আপনার কথামতো চললে আমরা হয়তো ওয়াশিংটন নয়, সানফ্রানসিসকোতে গিয়ে পৌঁছোবো।

যামিনীদা আবার শুভ্র হাসিটি হাসলেন।

এ গাড়ি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয় বলে সামনের জানালার কাচ নামানো। ফলে ইংরেজিতে যাকে হিসিং সাউন্ড বলে সেরকমই একটা ভয়াবহ শব্দ অনবরত আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সত্তর আশি মাইল বেগে চলমান হাজারো গাড়ি এবং বাতাসের মিশ্রিত এই শব্দটি শুনলে একটু ভয়-ভয় করবেই। আর এই শব্দের ফলে পরস্পরের সঙ্গে চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বলা যাচ্ছে না। ফলে যাত্রাপথটা একরকম বিনা আড্ডায় অতিক্রম করতে হচ্ছে।

তবু খারাপ লাগছে না। প্রাণভরে চারদিককার সবুজ সবুজ মাঠ ঘাট, নিবিড় গাছপালা দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। এ দেশের বহিরঙ্গে কুশ্রীতার খুব অভাব। প্রকৃতি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি রুচিকর মানুষের বিবিধ নির্মাণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তমাঙ্গ যে শহরটি—অর্থাৎ ওয়াশিংটন ডি সি নিশ্চিত বিষুবরেখার কাছাকাছি। সেটা মানচিত্র না দেখেও শুধু আবহাওয়ার উষ্ণতাতেই মালুম হতে লাগল। যথেষ্ট দক্ষিণে অবস্থিত বলেই বোধহয় ভ্যাপসা গরমে বদ্ধ গাড়িতে বাস্তবিকই জ্বলন্ত মোমের মতো ঘেমে জল হয়ে যাচ্ছিলুম। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একসময়ে ওয়াশিংটনে থাকত। তার বাড়ির ঠিকানায় লেখা দেখতুম, ম্যারিল্যান্ড। সেই ষাটের দশকে ম্যারিল্যান্ড নিয়ে কত কল্পনা করেছি। সেই ম্যারিল্যান্ডেই আপাতত যাচ্ছি। আর হাসি পাচ্ছে ম্যারিল্যান্ডে কোনওদিনই যাওয়া হবে না ভেবে ষাটের দশকে যা-সব কল্পনা করতুম সেই কথা ভেবে।

ওয়াশিংটন ডি সি-তে যাঁরা গেছেন, তাঁরা একমত হবেন কি না জানি না, কিন্তু ওয়াশিংটন ডি সির সঙ্গে আমাদের দিল্লি শহরের বেশ মিল আছে বলে আমার মনে হয়। দিল্লির প্রসার এবং ফাঁকা জায়গায় বাহুল্য এই মহান শহরেও যথেষ্ট দেখা যাবে। ওয়াশিংটন ডি সি-তে খুব উঁচু অভ্রংলেহি বাড়ি নেই। উঁচু বাড়ি করা আইনত এখানে বারণ।

আমরা যে অঞ্চলে যাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ নতুন ডেভেলপ করা জায়গা। বাড়িঘর খুব একটা হয়নি। রাস্তা চেনা নয় বলে বউদিকে একটু ভেবেচিন্তে বাঁক নিতে হচ্ছিল। এবং প্রতিটি মোড়ের কাছাকাছি এসেই ডান দিকে না বাঁ দিকে যেতে হবে, তা নিয়ে যামিনী ও বউদির মতান্তর হতে লাগল।

আমি বললুম, যামিনীদা, বউদির ওপর ভরসা রাখুন।

যামিনীদা একথায় একটু দমিত হলেন। বাস্তবিক, তাঁর কথামতো গেলে আমরা বোধহয় ফের নিউইয়র্কের রাস্তায় ফেরত যেতুম। বউদি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে

যামিনীদের নির্দেশাবলী অগ্রাহ্য ও অমান্য করে সঠিক রাস্তাতেই গাড়ি চালিয়ে একটি ছিমছাম চিত্রার্পিত শহরতলিতে ঢুকলেন। আমেরিকার শহরতলি তো ছোটোখাটো জায়গা নয়, মাইল মাইল তার বিস্তার। এবং যথারীতি রাস্তার গোলোকধাঁধা।

একটি রাস্তার ডেড এন্ডে এসে আমরা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। যামিনীদার ছেলের বাড়িটির সামনেই একটি চমৎকার গাছ। ঝুপসি তলায় গাঢ় স্নিগ্ধ ছায়া। সদর দরজাটি সেই গাছে আধো-ঢাকা। পরিবেশটি চমৎকার।

বাড়িটা এঁরা সম্প্রতি কিনেছেন। সবে গৃহপ্রবেশ হয়েছে। আমেরিকায় যেমন হয়, তেমনই চমৎকার পরিকল্পনায় তৈরি বাড়ির অভ্যন্তর। বেশ বড় বাড়ি। পিছনে অনেকটা বড় লন। লন রাখা এখানে আবশ্যিক। সব বাড়িরই লন থাকবে। তবে এ-বাড়ির মতো এত বড় লন আমি কমই দেখেছি। ঘাস বড্ড বড় হয়েছে। শুনলুম, আজকাল ঘাস কাটার জন্য এজেন্সি আছে, তারা নিয়মিত ঘাস কেটে দিয়ে যায়। আজ আসবে কাটতে।

বাড়ির কর্তা, অর্থাৎ যামিনীদার বড় ছেলে তাঁর মেয়েকে নিয়ে একটু বেরিয়েছেন। মেয়ে হ্যামবার্গার খাওয়ার বায়না ধরেছিল। আমরা বাইরের ঘরে বসে শরীর জুড়োতে জুড়োতেই স-কন্যা বাড়ির কর্তা ফিরলেন। বেশ একটা ঘরোয়া আড্ডা হতে লাগল। আমেরিকায় যে-কোনও বাঙালির বাড়িই বেশ বাঙালি পরিবেশ রক্ষা করে চলে। ফলে ঘরে বসে মনেই হবে না যে, আমেরিকায় আছি। এই পরিবেশ কিন্তু কলকাতার বড়লোক বাঙালিদের বাড়িতে নেই। অধিকাংশ ধনী বাঙালির বাড়িতে সাহেবিয়াটানাই যেন প্রকট হয়ে প্রকাশ পায়।

আগেই বলেছি, এ-দেশে লানচে ভাত খাওয়ার পাট একরকম উঠে গেছে। লুচি দিয়ে দিব্যি মধ্যাহ্নভোজ সেরে উঠে দেখলুম, পিছনের লন-এ ঘাস কাটতে এসেছে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ সাহেব। অবশ্য দিশি ঘেসুড়ের মতো অবস্থা তাদের নয়। তারা এসেছে একটি মস্ত ঝকঝকে আধুনিক ভ্যান-এ। সঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি। মোটোরাইজড মোয়ার দিয়ে যে-কোনও মাপের লন-এর ঘাস নির্মূল করতে সময় লাগে খুবই কম। গরমের জন্য সাহেবরা সবাই খালি গা। নিম্নাঙ্গে শর্টস, পায়ে জুতো-মোজা, মাথায় টুপি। তারা ঝটপট লন মুড়িয়ে ফেলল। বারান্দার গা ঘেঁসে সে ঘাসগুলো মাথা তুলে আছে, সেগুলো মোয়ারের পাল্লায় পড়ে না বলে, আর একটা ঘূর্ণি যন্ত্র দিয়ে সযত্নে সেগুলো কেটে ফেলল।

ঘাস-কাটা দেখতে বাড়িসুদ্ধ লোক পিছনের বারান্দায় জড়ো হয়েছি। সাহেবরা বাঙালির বাড়িতে মালির কাজ করছে—দেখার মতো দৃশ্য বটে।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী আমার পুরনো সহকর্মী এবং সহোদরপ্রতিম। একসঙ্গে আনন্দবাজারের নিউজ ডেসকে আমরা অনেকদিন কাজ করেছি। তারপর পশ্চিম

জার্মানিতে কোলোনে রেডিওর বাংলা ভাষ্যকারের চাকরি পেয়ে চলে যায়। বছর চারেক বাদে কলকাতায় ফিরে আবার ভয়েস অফ আমেরিকার চাকরি পেয়ে এখানে চলে এসেছে। ওয়াশিংটনে আমি তার বাড়িতেই থাকব। ডিউটি সেরে সে আমাকে নিয়ে যেতে আসবে।

ঘাস-কাটা শেষ হতে না হতেই দীপঙ্কর চলে এল। অনেকদিন বাদে তাকে দেখে দূরের দেশে যেন স্বজন পাওয়ার আনন্দ হল। বিদেশ-বাস দীপঙ্করের কিছুই কেড়ে নেয়নি। সেই বিচ্ছু-হাসি, রসিকতাবোধ সবই আছে।

বেশ কিছুদিন আগে আমার কলকাতার বাড়িতে দুটি মেয়ে এক রবিবারের সকালে দেখা করতে এসেছিল। বেশ চালাক চতুর পড়ুয়া মেয়ে। সাহিত্যবোধ প্রখর। ঘণ্টা দুই তাদের সঙ্গে কথা বলে খুশি হলাম। বিদায় নেওয়ার সময় তারা বলল, ওঃ হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি আপনাকে এতক্ষণ। আমরা দুজন দীপঙ্কর চক্রবর্তীর বোন।

আমি কিছুদিন হাঁ হয়ে থেকে বললুম, তোমার দুটি বোনই খুব বিচ্ছু। এতক্ষণ তোমাদের দিব্যি আপনি-আজ্ঞে করে যে কথা বলছিলুম তখনই তো বলতে পারতে যে, তোমরা দীপঙ্করের বোন।

মেয়ে দুটি হেসে বলল, প্রথমেই পরিচয় দিয়ে দিলে আপনি পাত্তা দিতেন নাকি ? আপনার মুখে আপনি-আজ্ঞে শুনতে অবশ্য একটু লজ্জা করছিল।

তা, সেই বোনেদেরই দাদা হল দীপঙ্কর। সুতরাং সেও বিচ্ছু।

কিছুক্ষণ আড্ডা মেয়ে দীপঙ্কর উঠল, চলুন, শীর্ষেন্দুদা, বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

দীপঙ্করের গাড়িটি ভাল, তবে তার বাতানুকুল যন্ত্রটি সম্প্রতি খারাপ হওয়ায় গাড়ির অভ্যন্তরটি প্রচণ্ড গরম। তেতে ফার্নেস হয়ে আছে।

অনেকদিন বাদে দেখা, সুতরাং জমা কথা অনেক ছিল। কথার ফাঁকে একসময়ে আমরা ওয়াশিংটন ডি সি-র নগর-সীমানায় ঢুকে পড়লাম।

বললুম, হ্যাঁ রে, দীপঙ্কর, দিল্লির সঙ্গে একটু মিল আছে না ?

হুবহু। আমারও প্রথম ওয়াশিংটনে এসে দিল্লির কথাই মনে হয়েছিল।

দিল্লির মতো বললুম বলে আবার দিল্লিই নয়। ওয়াশিংটনের যে অতিরিক্ত মাত্রাটি আছে সেটা দিল্লির থাকবার কথা নয়। মার্কিন বস্তুতান্ত্রিক উন্নয়ন তো দিল্লি বানিয়ে থেমে থাকতে পারে না। তাদের উড়াল সড়ক বা সুড়ঙ্গ, তাদের পার্ক বা প্রমোদকানন, তাদের প্রেক্ষাগৃহ বা মিউজিয়মের ধারে কাছেও দিল্লি আসতে পারে না। দিল্লির রাস্তাঘাট যথেষ্ট ভাল হয়েও ওয়াশিংটনের রাস্তাঘাটের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়।

ওয়াশিংটন বিশাল শহর। নিউইয়র্কে একটু ঘিঞ্জি ভাব আছে, যেটা

ওয়াশিংটনে নেই। ওয়াশিংটনে গাছপালা, সবুজ মাঠ, ফাঁকা জায়গা অনেক বেশি।

দূর থেকে ওয়াশিংটনের বিখ্যাত স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ম, কংগ্রেস, ও অন্যান্য যা-কিছু দেখা যাচ্ছিল তা দেখিয়ে দিল দীপঙ্কর। তবে আজ এতটা পথ অতিক্রম করেছি বলে বেড়ানোর প্রোগ্রাম রাখেনি দীপঙ্কর। এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম আর আড্ডা।

শহর ছাড়িয়ে একটু দূরেই দীপঙ্করের বাড়ি। জায়গাটা একটা হাউসিং কমপ্লেকসের মতো। একটা চত্বর ঘিরে প্রায় গায়ে গায়ে বাড়ি।

দীপঙ্করের বাড়ি প্রকাণ্ড নয়। মাঝারি মাপের এবং ভারি ঘরোয়া।

গাড়ি থামতে না থামতেই হাসিমুখে দেখা দিল লোপা, আর তার দুই ছেলেমেয়ে। ছেলের বয়স বছর দশ-এগারো, মেয়েটির বছর তিনেক। আমি বাড়িতে ঢুকবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেয়েটি আমার কোল-সই হয়ে গেল এবং কাকু কাকু বলে ডাকতে লাগল।

ওরে, আমি তোর কাকু নই, জেঠু।

কিন্তু সে আমাকে কাকু ছাড়া ডাকবেই না। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতুম, ততক্ষণ সে আমার সঙ্গ ছাড়ে না এক দণ্ডও।

আমি দখল করলুম দীপঙ্করের ছেলের ঘরখানা। ছোট্ট পুতুল-পুতুল ঘর। দেওয়ালে মজার ঘড়ি, ইলেকট্রনিক খেলনা, বইপত্রে সাজানো ঘরে আমারও যেন শৈশব ফিরে এল। তবে আমাদের শৈশব ছিল উপকরণহীন। মার্কিন শিশুদের শৈশবের সঙ্গে আমাদের শৈশব অবশ্য কোনও কারণেই তুলনীয় নয়। আমাদের অবলম্বন ছিল শুধুই কচি বয়সে নতুন পৃথিবীর বিস্ময়। ওই বিস্ময় আর অকারণ আনন্দই আমাদের ভাঙা পুতুল, চাবি-পটকা, বাঁখারির তীর-ধনুক আর নটি বয় শুর মধ্যে সঞ্চারিত করত মহার্ঘতা। আমাদের পৃথিবী ভরা থাকত ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস ইত্যাদিতে। পকেটে একটি-দুটি পয়সা থাকলে নিজেকে রাজারাজা বলে মনে হত। আমাদের কোনও নিজস্ব ঘর ছিল না, মা বা ঠাকুমার বুক-ঘেঁসে শুয়ে থাকতুম।

ছেলেটি ভারি ভাল। শান্ত, মেধাবী, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। আমেরিকায় বাঙালি শিশুরাও বায়না করে বটে, কিন্তু দিশি শিশুদের সঙ্গে একটু তফাত আছে। আমাদের ঘরের বাচ্চারা বায়নার সঙ্গে একটু ঘ্যান-ঘ্যান জুড়ে রাখে। কিন্তু মার্কিন পরিবেশে ঘ্যান-ঘ্যান ব্যাপারটা তেমন নেই। সেখানকার বাঙালি শিশুরা দোকানে গিয়ে বাবাকে বা মাকে বলবে, আমি কি ওটা পেতে পারি ? না করলে সেটা নিয়ে আর ঝোলাঝুলি করবে না। ফের অন্য একটা জিনিস দেখিয়ে বলবে, আমি কি ওটা পেতে পারি ? দীপঙ্কর তার ছেলের এই সব ছোটখাটো চাহিদা বেশ শক্ত হাতে প্রতিরোধ করে আর বাপ-ব্যাটায় তখন বেশ মজার ব্যাপার হতে থাকে।

তার ঘর দখল করেছি বলে ছেলেটি কি মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে ? একটু কথাবার্তা বলে দেখলুম, তা মোটেই নয়। দেশ থেকে তার দাদু আর দিদা এসেছে, সুতরাং বাড়ি সরগরম। সে দাদু-দিদার সঙ্গেই থাকতে পছন্দ করছে।

সন্ধেবেলা অনেক বাঙালি দম্পতি এলেন দেখা করতে। রাত প্রায় বারোটা অবধি চমৎকার আড্ডা হল। পরদিন দীপঙ্কর সকালবেলায় বেরোল আমাকে নিয়ে। লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, স্মিথসোনিয়ান, ওয়াশিংটন টাওয়ার দেখে লিঙ্কন মেমোরিয়ালে যখন পৌঁছেছি তখন গরম আর ঘামে দমবন্ধ হয়ে মরার জোগাড়।

মেমোরিয়ালের সামনে একটি বিশাল মনোরম জলাশয়। তাতে বোটিং হচ্ছে। কিন্তু এক ফোঁটা হাওয়া নেই। কংক্রিটে বাঁধানো প্রশস্ত সিঁড়ি তেতে তখন তাপ বিকিরণ করছে। তপ্ত দীর্ঘ সিঁড়ি অতিক্রম করে মেমোরিয়ালের ভিতরে ঢুকে বিশাল মূর্তিটি অবলোকন করে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। এরকম বিশাল মূর্তি, অথচ এত জীবন্ত ও শিল্পসম্মত যে, নিজের দেশের মূর্তিগুলোর কথা ভেবে লজ্জা করছিল। অনেক পর্যটক ঘুরে ঘুরে দেখছে, ছবি তুলছে। দীপঙ্কর আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়ে পটাপট ছবি তুলে নিতে লাগল।

ওরে দীপঙ্কর, এরকম গরম তো আমাদের জষ্ঠিমাসে বাঁকড়ো পুরুলিয়াতেও পড়ে না !

দীপঙ্কর ওয়াশিংটন-বাবদে লজ্জিত হয়ে বলল, এবছরটাই এরকম চাষাড়ে গরম পড়েছে। একশো বছরের মধ্যে নাকি এটাই রেকর্ড গরম।

তা, সেই রেকর্ড গরমটা আমার আমেরিকা-সফরের সময়েই বা পড়তে গেল। কেন ?

বিচ্ছু দীপঙ্কর খুব লজ্জিতভাবে মাথা চুলকোল।

রক্ষে, বেসমেন্টটি বাতানুকুল। সেখানে নেমে অতি শীতল জল ফাউন্টেন থেকে খানিকটা খেয়ে এবং খানিকটা ঘাড়ে কপালে চাপড়ে শরীরের ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করলুম।

এরপর দীপঙ্কর যে-জিনিসটি দেখতে নিয়ে গেল, সেটির কথা আমার আমৃত্যু মনে থাকবে। পোটোম্যাক নদীর ধারে একটি পার্কের মধ্যে এক সুবিশাল শায়িত মূর্তি। উজ্জ্বল ধাতুর এই মূর্তিটির মাথা, দুটি হাত আর দুটি পা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, মনে হয়, ধড়টা মাটির নিচে রয়েছে। তা নয়। মূর্তির নাম অ্যাওকেনিং বা জাগরণ। এত সুন্দর নিদ্রোত্থিত ভাবটি ফুটছে এই মূর্তিতে যে, আমি অনেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারলুম না। কাছ থেকে, দূর থেকে বারবার অনেকক্ষণ ধরে মূর্তিটি দেখলুম। যাঁরা ওয়াশিংটন ডি সি-তে যাবেন, তাঁদের এই মূর্তিটি অবশ্যই দেখতে অনুরোধ জানিয়ে রাখলুম।

ওয়াশিংটন ডি সি তে দ্রষ্টব্য আছে অনেক কিছুই। তা বলে দ্রষ্টব্যগুলোর মধ্যে হোয়াইট হাউসকে না ধরাই ভাল।

নামের সঙ্গে ডি সি শব্দটি এ শহরকে বহন করতে হয়, তার কারণ এ রাষ্ট্রে অনেকগুলো ওয়াশিংটন নামধারী শহর আছে। ফলে ডিস্ট্রিক্ট অফ কলমবিয়া, সংক্ষেপে ডি সি যোগ করে রাজধানীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ তথ্য অবশ্য আজকাল আর কারও অজানা নেই।

হোয়াইট হাউস শব্দটি নানা প্রসঙ্গে প্রতিদিন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই উচ্চারিত হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিধর রাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্র হল হোয়াইট হাউস। রোমান স্থাপত্যে তৈরি এই ভবনটির ছবি-টবি আমরা বিস্তর দেখেছি। বিশেষ অভিভূত হওয়ার মতো স্থাপত্যের নিদর্শন হোয়াইট হাউস নয়। আমাদের দীন কলকাতাতেও অনুরূপ স্থাপত্যের বিস্তর বাড়ি ছিল এবং আছে, যেগুলো ভেঙে নতুন নতুন হাইরাইজ উঠছে।

দীপঙ্কর যখন হোয়াইট হাউসের সামনে গাড়ি থামাল তখন চড়া রোদে বাগান-ঘেরা বাড়িটি দেখে মনে হল, এই সাদামাঠা বাড়িটিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেন থাকেন ? যে-দেশে স্থাপত্য দেখলে মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম সে-দেশের কর্ণধার কেন এমন বাড়িতে থাকবেন ?

ওরে দীপঙ্কর, এই তোদের হোয়াইট হাউস ? ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

দীপঙ্কর কিন্তু মিনমিন করে বলল, কেন দাদা, আমার তো বাড়িটাকে বেশ লাগে।

তোর বেশ লাগে কেন ?

আধুনিক সব বাড়ি দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে। এ বাড়িটা কেমন যেন ঘরোয়া আর স্নিগ্ধ।

দীপঙ্করের কথাটা ফেলতে পারলুম না। হোয়াইট হাউস যথেষ্ট পুরনো বাড়ি। মার্কিন নব্যতন্ত্রের সঙ্গে তার বিসদৃশতা থাকলেও এবং পিলে-চমকানো স্থাপত্যের ম্যাজিক না থাকলেও এক ধরনের শান্তশ্রী আছে বটে।

দীপঙ্কর হোয়াইট হাউসের বিপরীত দিকে একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে বলল, এটা হল প্রেসিডেন্টকে গালাগাল দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান, যখনই কারও ইচ্ছে হয় প্রেসিডেন্টকে একটু ধোলাই দেওয়া দরকার, তখনই এখানে এসে চোঙা ফিট করে মিটিং করে।

তাতে প্রশাসন খেপচুরিয়াস হয়ে যায় না ?

মোটেই নয়। এ-দেশ ব্যক্তি স্বাধীনতার পীঠস্থান, যে যা খুশি করতে পারে।

রেগনের রাজত্বে তোরা কেমন আছিস ?

রেগন বলে কথা নয়, কে প্রেসিডেন্ট তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দেশটা

অনুশাসনে চলে। প্রেসিডেন্ট একজন থাকতে হয় বলে আছেন। মার্কিন জীবনে তাঁর বিশেষ কোনও প্রভাব নেই।

পৃথিবীর প্রথম এরোপ্লেনটি দেখতে চান ? প্রত্যক্ষ করতে চান কি সেই মডিউলটি যা চাঁদে প্রথম নেমেছিল ? স্পর্শ করতে চান চাঁদের পাথর ? কিংবা অত্যাধুনিক বিমান ? কিংবা এয়ারোনটিক্স বা উড়ান-প্রযুক্তির গোটা ইতিহাসটার দৃষ্টান্তসহ ইতিহাস জানবার ইচ্ছে হয় কি ? তাহলে আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে মার্কিন রাজধানীর বিশ্ববিখ্যাত এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামে। ওয়াশিংটনই একমাত্র শহর যেখানে মিউজিয়ামে ঢুকতে দক্ষিণা লাগে না।

এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের মতো একটি ব্যাপার গড়ে তুলতে যে পরিশ্রম এবং মেধার দরকার এবং যে অর্থব্যয় করার সামর্থ্যও, তা খুব কম রাষ্ট্রেরই আছে। এতগুলো এরোপ্লেনকে রাখবার মতো বাড়ি তৈরির কথাই তো ভাবা যায় না।

এক অপরাহ্নে সপুত্র দীপঙ্কর আর আমি গিয়ে নামলুম এই মিউজিয়ামের সামনে। গাড়ি রাখার স্পেস জোগাড় করতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সব স্পেসই ঠাসা, তার মধ্যে একজন গাড়ি বের করতেই দীপঙ্কর অতিশয় তৎপরতায় সেখানে গাড়িটি ঢুকিয়ে দিল।

মিউজিয়ামে ঢুকতেই প্রথমে আপনাকে স্বাগত জানাবে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি বিমানটি। ছোটখাটো এবং যান্ত্রিক বাহুল্যবর্জিত এই বিমানটি একদা গগনবিহার করেছিল একথা বিংশ শতকের শেষ পর্বে যেন বিশ্বাসই হতে চাইবে না। এটি ওরিজিন্যাল না রেপ্লিকা তা বলা শক্ত। তবে ওরিজিন্যাল হলেও জোড়াতাপ্পি দিতে হয়েছে সেটায়।

তারপর এক এক করে দেখে যান উন্নত থেকে উন্নততর বিমান। বিশাল বিশাল হলঘর আর স্পেস পার হতে থাকুন মন্দ গতিতে। দেখুন পুরনো আমলের যুদ্ধবিমান, প্রপেলার চালিত বিমানকে সরিয়ে কিভাবে আধিপত্য করতে এল জেট। আর প্রাচীন জেটকে কেমন টেক্কা মারল আধুনিক জেট।

চলে আসুন রকেটের ঘরে। ছোট বড় নানা মাপের রকেট। পুরনো রকেট, নতুন রকেট। দেখতে দেখতে চলে আসুন মডিউলের ঘরে। নিশ্চিত রোমাঞ্চিত বোধ করবেন প্রথম লুনার মডিউলটি দেখে। এরই অভ্যন্তর থেকে নীল আর্মস্ট্রং বেরিয়ে প্রথম মানুষ হিসেবে চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। মডিউলটি কিন্তু বেশ ছোটোখাটো। দুজন লোক কি করে এটার ভিতরে সেঁধিয়ে ছিলেন সেটা ভাবনার কথা।

চাঁদের পাথরের একটি ছোট টুকরো একটা কাঠের চৌখুপির মধ্যে এমন কায়দায় লাগানো আছে যাতে চুরি করা না যায়, কিন্তু স্পর্শ করা যায়। খুব আদর

করে পাথরটার ওপর বারকয়েক আঙুল বুলিয়ে নেওয়া হল।

এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম এক অন্তহীন প্রদর্শনী, পা টনটন করতে থাকবে, তেষ্টা পাবে, হেঁটে হেঁটে যেন পথ আর শেষ হবে না এবং দ্রষ্টব্যও যেন অনন্ত। তবু পারবেন। কারণ এতই চিত্তাকর্ষক এই মিউজিয়াম যে শরীর গৌণ হয়ে যেতে বাধ্য। শরীরের কথা আপনার মনেই থাকবে না।

এই মিউজিয়ামে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, সেটি হল একটি অতিশয় পর্দাবিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ, তাতে বিশাল আকারের পর্দায় আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের তথ্যচিত্র দেখানো হয়। সেগুলির বিষয়বস্তু মোটামুটি বিশ্ব এবং মহাবিশ্ব। এক একদিনে তিন চারটে তথ্যচিত্র ঘুরেফিরে প্রায় সারদিন ধরে দেখানো হচ্ছে।

দীপঙ্করের এক কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধু এই প্রেক্ষাগৃহের প্রোজেকশন ইনচার্জ।

দীপঙ্কর খবর পাঠানোর পর দশ মিনিটের মধ্যে সেই হাসিখুশি মজবুত গড়নের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটি এসে খুব সমাদর করে আমাদের সোজা লিফটে তুলে প্রোজেকশন রুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে বিশাল আকৃতির প্রজেক্টর রয়েছে। ঘুরেফিরে যন্ত্রপাতি দেখালেন ভদ্রলোক। কিভাবে প্রোজেকশন হয় অত বড় পর্দায় তাও বোঝালেন, কিছু ফিলমের নমুনা দিয়ে দিলেন বদান্যতায়। সামনে কাচের আবরণের ভিতর দিয়ে অতিকায় পর্দায় প্রতিফলিত ছবি দেখা যাচ্ছিল। সিনেমার পর্দা এত বড় হতে পারে তা তো জানা ছিল না। দেখতে দেখতে একটু মাথা ঘোরে।

ভদ্রলোকের ডিউটি শেষ হয়ে এসেছে, উনি বাড়ি যাবেন। বললেন তোমাদের টিকিট কাটতে হবে না। আমি বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, যটা খুশি ছবি পরপর দেখে নিতে পারো। কেউ যদি চেক করতে আসে তাহলে আমার নাম বলো।

নিয়ম হচ্ছে একটা ছবি শেষ হলেই হল থেকে সবাইকে বেরিয়ে যেতে হয়। নতুন টিকিটধারীরা ঢোকে। ভদ্রলোক নিজে এসে আমাদের বসিয়ে দিয়ে গেলেন, গেটকিপারদেরও সচেতন করে দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ আমরা পর পর তিনটি ছবি দেখলুম, চেকাররা আমাদের বাদ দিয়ে অন্যদের হুড়ো দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল।

ছবির পর্দাই যে শুধু বিশাল তা নয় প্রোজেকশনের কৌশলে একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় বলে সমসময়ই দৃশ্যমান ছবির মধ্যেই যেন আমি ঢুকে গেছি—এরকম অনুভূতি হয়। তিনটি ছবির মধ্যে যেটা সবচেয়ে ভাল তার অর্ধেক জুড়েই রয়েছে ভারতবর্ষ। কী অসাধারণ ছবি না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ঘণ্টা দুই বাদে বেরিয়ে এলুম তখনও ছবির প্রতিক্রিয়ায় মাথা একটু একটু টলছে।

দীপঙ্করের বউ লোপা বলল, শীর্ষেন্দুদা এখানে সেল-এ খুব সস্তায় বেডশিট

বিক্রি হচ্ছে। এরকম বেডশিট কোথাও পাবেন না। টেরিকটনের জিনিস, অসাধারণ ডিজাইন আর রঙ একেবারে পাকা।

কত দাম বলো তো?

খুব সস্তা, একজোড়া করে থাকে, কুড়ি ডলার।

কিন্তু আমি তো এখান থেকে কলম্বাস যাবো, তারপর হয়তো আরও কোথাও, বোঝাটা এখনই বাড়ানো কি ঠিক হবে, তার চেয়ে নিউইয়র্ক থেকে যদি যাওয়ার সময় কিনে নিই?

তাই নেবেন। কিন্তু বেডশিট নেওয়া চাই, দেশে এ-জিনিস পাবেন না।

লোপা তার মা বাবার জন্য বেডশিট কিনেছে, বার করে দেখাল। সত্যিই অসাধারণ। যেমন রুচির নক্‌শা তেমনি অফবিট রং। আর খুব মোলায়েম। টেকেও নাকি অনেকদিন।

সেই বেডশিট ওয়াশিংটনে না কিনে ভুল হয়েছিল। পরে নিউইয়র্ক চষে ফেলেও জোড়া বেডশিটের সেট পাইনি। এক এক সময় এক এক জিনিসের একটা চল আসে। বেডশিট পাইনি তা নয়, কিন্তু সেগুলো সব বেডশিট আর পিলোকভারের সেট সঙ্গে মার্কিন শয্যার অঙ্গবিশেষ একটা লম্বা ফ্রিল, যা আমাদের কোনও কাজে লাগবে না, দামও বেশি। উনত্রিশ থেকে চল্লিশ ডলার দাম। সুতরাং বেডশিটটাকে গুডবাই জানাতেই হয়েছে শেষ অবধি।

দীপঙ্কর বলল, চলুন শীর্ষেন্দুদা, একবার ভয়েস অফ আমেরিকার দফতরটা দেখে আসবেন।

দূর! অফিসে গিয়ে কী হবে?

চলুন না, আমার কাজের জায়গাটা দেখবেন একটু।

তাহলে চল।

গেলুম। বেশ বড়সড় বাড়ি। ঢুকতে সিকিউরিটির বেশ কড়া বাধা। পাশ নিয়ে ভিতরে ঢুকে খানিকটা হতভম্ব হতে হয়। আমাদের কলকাতার আকাশবাণীও দেখেছি বহুবার কিন্তু এখানকারমতো পেল্লায় তো সেটা নয়। অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিতে সাজানো স্টুডিও রয়েছে অজস্র। বিভিন্ন ভাষায় দূর বা মধ্যপ্রাচ্যে প্রচারের জন্য বেশ বিশাল স্টাফও রয়েছে। বাংলা বিভাগে অন্তত দশ-বারোজন আছেন। বাংলাদেশ সৃষ্ট হওয়ার পর থেকে এ ভাষার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পয়েছে। বাংলা বিভাগে বাংলাদেশীরা সংখ্যাতেও বেশি।

বাংলা বিভাগে ঢুকতেই এত উষ্ণ সমাদর ও অভ্যর্থনা পেলুম যে, মনটা ভাল হয়ে গেল। বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষা এবং কলকাত্তাই ভাষায় যুগপৎ কথা হতে লাগল দুদেশী বাঙালির সঙ্গে। চমৎকার কফি চলে এল।

পরদিন রমেনদা, অর্থাৎ ভয়েস অফ আমেরিকার রমেন পাইনের বাড়িতে

নেমন্তন্ন। একটু সকাল সকালই রওনা হলুম। দীপঙ্করের বাড়ি থেকে অনেকটাই দূরে, আর একটি শ্যামশ্রীসম্পন্ন ছিমছাম শহরতলিতে রমেনদার বাড়িটি ছবির মতো সুন্দর।

দরজা খুলে রাশভারি রমেনদা যে হাসিটি হাসলেন তাতে তাঁর আন্তরিক খুশির ভাবটি গোপন রইল না। অভ্যর্থনা শুধু বিনয় বচনে হয় না, ভাবভঙ্গি হাসি চোখ সব কিছুর ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ পায়। বঙ্গ সম্মেলনে দেখা হয়েছিল, তখনই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, আমি যেন ওয়াশিংটনে এসে ওঁর বাড়িতে উঠি। কিন্তু দীপঙ্করকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে সেই অনুরোধ রাখতে পারিনি বলে খারাপ লাগছিল।

রমেনদা তাঁর মাঝারি মাপের সুসজ্জিত ড্রইং রুমে নিয়ে বসালেন, এই ঘরে যে টিভি সেটটি রয়েছে অত বড় সেট আমি আর দেখিনি। একখানা বড়-সড় আলমারির সাইজ। তার পর্দাখানাও মাপসই।

ড্রইং রুম বাইরের লোকের জন্য। লিভিং রুম আরও একটু ঘরোয়া আসরের জন্য। রমেনদার বাড়িতে কিছু অভ্যাগত ছিলেন। তাঁরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিদায় নেওয়ার পর আমরা গিয়ে জমিয়ে বসলুম লিভিং রুমে কার্পেটের ওপর। তাকিয়া বা বালিশের মতো গদিসহ।

একে একে এসে হাজির হলেন ভোলাদা তাঁর মার্কিন বউসহ। এলেন বাচ্চু রায়। আরও অনেকে। দীপঙ্করের ডিউটি থাকায় সে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। রাতে অন্য কেউ আমাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দেবে। এখানকার প্রত্যেকেই গাড়িবান মানুষ, পৌঁছে দেওয়াটা সুতরাং কোনও সমস্যাই নয়।

প্রবাসী বাঙালিরা দেশ থেকে আগত বাঙালিদের জন্য মুখিয়ে থাকেন। দেশের হালের খবর, সিনেমা, সাহিত্য, শিল্পে নতুন কী হচ্ছে, কোন নাটক কেমন হয়েছে ইত্যাকার প্রশ্নের অন্ত নেই। তাছাড়া লিখি বলেই লেখা সংক্রান্ত প্রশ্ন তো আছেই।

আড্ডার মাঝখানেই রমেনদা বললেন, শীর্ষেন্দু, চলো তোমার একটা ইন্টারভিউ নিয়ে নিই।

ভয়েস অফ আমেরিকার জন্য ইন্টারভিউ দিতে হবে একথা আগেই হয়ে আছে। রমেনদা তাঁদের দোতলায় ছোট্ট একখানা একটেরে ঘরে নিয়ে এসে টেপ রেকর্ডারের সামনে বসিয়ে দিলেন।

ইন্টারভিউ নেওয়া বলতে শুধু প্রশ্নোত্তর নয়, সেটা কম মানুষই বোঝেন। রমেনদা সেই বিরল শ্রেণীর মানুষ যিনি সাক্ষাৎকার কি করে নিতে হয়, কি করে ভিতরকার উৎমুখ খুলে দিতে হয়, তা জানেন।

সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার পর যখন লিভিংরুমে নেমে এলুম তখন আড্ডা

জমজমাট। উইক এন্ডে এরকম কারও না কারও বাড়িতে বাঙালিদের আড্ডা বসে। বাঙালিদের সংখ্যা এখন আমেরিকায় বেশ বেড়েছে। আরও কয়েক বছরের মধ্যে আরও কয়েক হাজার বাঙালি আমেরিকার দখল নিতে চলে আসবেন। দেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে তাঁরা গোকুলে বাড়ছেন। তখন আমেরিকার বাঙালি সমাজ বেশ জোরদার হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু আড্ডায় বাঙালি যত ঐক্যবদ্ধ সামাজিক দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগেও যদি তা হতে পারত তাহলে এই দূর বিদেশে গড়ে উঠতে পারত সমাজের দৃঢ়বদ্ধ এক বাঙালি সমাজও। মার্কিন অভিবাসী বাঙালির তবে আর দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালিরা আমেরিকান হয়ে যাচ্ছে বলে হায় হায় করতে হত না। মনে হচ্ছে গরিষ্ঠ হওয়ার চেয়ে গরীয়ান হয়ে ওঠাটাই বেশি জরুরী।

আড্ডাতেও এসব প্রসঙ্গ উঠল। ছেলেমেয়েদের কথা উঠলেই এখানকার বাঙালিরা মুষড়ে পড়েন। নিরন্তর এই এক ভার তাঁদের বহন করতে হচ্ছে। এক তীব্র বেদনার ভার। ছেলেমেয়েদের আমেরিকান হয়ে ওঠায় কোনও বাঁধ দেওয়া যাচ্ছে না। আমি সামান্য মসীজীবী হলেও এঁদের কাছে আমার উপস্থিতি গুরুত্ব পাচ্ছে। অনেকেই জানতে চাইছেন কি করে ঠেকানো যাবে এই প্রবণতা। অনেক কথা হল বটে, কিন্তু কোনওটাই হয়তো শেষ সমাধান নয়।

আড্ডায় চৌম্বক উপস্থিতি ছিল বাচ্চু রায়ের। ষাটের ওপর বয়স হলেও ছিপছিপে চেহারা আর প্রাণবন্ত মুখশ্রীর জন্য বয়স বোঝাই যায় না। সারাক্ষণ নানারকম হাসিঠাট্টা রঙ্গরসিকতা করে যাচ্ছেন। শুনলুম মাত্র কিছুদিন আগে হৃদযন্ত্রে গুরুতর অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবু কোনও বিকার নেই, দুশ্চিন্তা নেই। হোঃ হোঃ করে হাসছেন, অন্যদের হাসাচ্ছেন। ওয়াশিংটনে স্থায়ীভাবে থাকলেও ইনি দেশে যান ঘন ঘন। বছরে দু তিনবার তো বটেই।

আড্ডায় বউদি অবিরল খাবার-দাবার চা ইত্যাদি সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে নিজেও এসে বসছিলেন আড্ডায়।

দুপুর হয়ে আসছিল। কেউ কেউ মধ্যাহ্নভোজের আগেই বিদায় নিলেন, কেউ কেউ রয়ে গেলেন।

মার্কিন খাবার আমাকে প্রায় কোথাও তেমন খেতে হচ্ছে না। এ বাড়িতেও দিব্যি গরম ফুলকো লুচি, ভাজাভুজি, আলুর দম, দৈ মিষ্টি ইত্যাদি আয়োজন। স্যালাড আছে, আচার আছে। আমেরিকায় ভ্রমণকালে যে আমার স্বাস্থ্য ও কান্তি দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছিল তার মূলে খাঁটি বিশুদ্ধ খাদ্য ও জলহাওয়া দুই-ই ছিল।

যে কজন অতিথি মধ্যাহ্নভোজে ছিলেন তাঁরাও একে একে বিদায় নিলে দরজা এঁটে মুখোমুখি বসলুম আমরা তিনজন। রমেনদা, বউদি আর আমি।

কোলের তাকিয়ায় ভর দিয়ে রমেনদা বললেন, ভাই শীর্ষেন্দ. আমি তোমার কাছে

একটা কথা জানতে চাই। শুনেছি, তুমি এক ভীষণ বিষাদরোগে ভুগতে। আর তাই থেকেই তোমার ঠাকুরের কাছে যাওয়া। আমাকে সেসব কথা একটু বলবে?

নিজের সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে বেশ শক্ত ব্যাপার। আমার জীবনের কথা কাউকে শোনাতে গেলে সে হয়তো বিরক্ত হবে। তবে রমেনদার আগ্রহ ছিল আন্তরিক। বউদিরও।

শ্রোতা পেলে মনের দরজা আপনা থেকেই খুলে যায়। আমার জীবনের কিছু দামাল দিন ছিল, ছিল কিছু কুয়াশায় ঢাকা বিষণ্ণ দিন। তারপর এলেন ঠাকুর উজ্জ্বল উদ্ভাস নিয়ে। যখন সেসব কথা বলছি ভারী হয়ে উঠছে গলা। সন্ধে হয়ে আসছে। বউদি ইচ্ছে করেই বাতি জ্বালেননি। ঘরে এক ঝুঁঝকো আঁধার।

রমেনদার নিজের জীবনেও কিছু বিষণ্ণতার দিক আছে। থেমে থেমে আস্তে আস্তে তাঁর ভরাট গলায় সেসব কথা বললেন।

আমেরিকা রমেনদার একেবারেই না-পসন্দ। তিনি দুচোখে দেখতে পারেন না এই দেশকে। বেহালায় একটি ফ্ল্যাট কেনা আছে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে চলে যান কলকাতায়। স্রেফ পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে।

সন্ধের মুখে আমরা বেরোলুম বাচ্চুদার বাড়িতে যাব বলে।

বেশ খানিকটা দূর। গাছ-গাছালিতে ছাওয়া পুরনো ধরনের একটি পাড়ায় বাচ্চুদা থাকেন। বাড়িতে পার্টি চলছে। তবে সাহেবী পার্টি নয়। বাঙালিদের হুল্লোড়! ঠিক যেমনটি দেশেও হয়ে থাকে। বাড়ির পিছন দিকে একটি খোলামেলা জায়গায় পানভোজনের দিলদার বন্দোবস্ত।

এরা হ্যাতান্যাতা লোক নন কেউই। ইলেকট্রনিকসের ইঞ্জিনিয়ার, বায়ো কেমিস্ট্রির বিশেষজ্ঞ, ক্যানসার রোগের কৃতবিদ্য চিকিৎসক—সকলেই পেশাদার, কৃতী। কিন্তু সকলেই উন্মুখ বাঙালি, আদ্যন্ত বাঙালি। আমেরিকায় এসে এটাই মস্ত লাভ হল আমার—প্রবাসের বাঙালিকে আবিষ্কার করে গেলুম।

একটু বাদে বাইরের ঘরে বসল গানের আসর। বাচ্চুদা অর্থাৎ হিতব্রত রায় কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের নাতি, গানের উত্তরাধিকার সুতরাং ওর জন্মগত। কার্পেটের ওপর বসে হারমোনিয়ম কোলের কাছে নিয়ে আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে রজনীকান্তেরই গান ধরলেন। রজনীকান্তের গান আমার নিজের খুব প্রিয়। এই ভক্ত দীন কবির গানে আমি যেন স্বর্গের গন্ধ পাই। সুরহীন হেঁড়ে গলায় আমি নিজেও মাঝে মাঝে তাঁর গান গেয়ে উঠি। যদিও তখন গানের তাড়সে আমার বাড়িতে ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে।

রাত হয়ে যাচ্ছিল বলে আড্ডা প্রলম্বিত করা গেল না। কাল সপ্তাহ শুরু হবে বলে আড্ডাধারীরাও একে একে বিদায় নিচ্ছেন। আমেরিকায় উইক এন্ড শেষ হওয়া এক প্রায়-বিয়োগান্ত ঘটনা। রোববার বিকেলে থেকেই প্রত্যেকের মুখে

টেনশন ফুটে উঠতে থাকে। কাল থেকে অফিস। পাঁচদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি।

দীপঙ্করের বাড়িতে রমেনদাই পৌঁছে দিলেন।

দীপঙ্কর খোঁজখবর নিয়ে জানাল, শীর্ষেন্দুদা, এখান থেকে গ্রেহাউন্ড বাসে কলম্বাসে যাওয়ার ভাড়া পঁচিশ ডলার। তবে বাস একদড়ে যাবে না। মাঝপথে বাস বদলাতে হবে। আর যদি প্লেনে যান তাহলে ভাড়া পড়বে একশো আট ডলার। ডলারের জন্য ভাববেন না, যা লাগে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। কলকাতায় ফিরে আমার বাবাকে টাকায় শোধ করে দিলেই হবে।

আমি বললুম, তুই কি বলিস, প্লেনে যাব, না বাসে?

লোপা আর দীপঙ্কর প্রায় সমস্বরে বলে উঠল প্লেনে। ঝামেলা অনেক কম।

আমি ওয়াশিংটনে থাকাকালীনই হঠাৎ দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়ল, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। খবরটাকে মার্কিন টেলিভিশন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করছিল। বারবার খবরে বলা হচ্ছিল, এ গ্রেট ফ্রেন্ড অফ ইউ এস এ। এ গ্রেট স্টেটসম্যান, এ গ্রেট ম্যান।

সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের নেতাদের এত গুরুত্ব দেওয়ার রেওয়াজ পয়সা বিশ্বে নেই। কিন্তু জিয়া যে নানা কারণেই আমেরিকার ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন তা খবর-প্রচারের নমুনা থেকে বুঝলুম। এমনকি মার্কিন টেলিভিশন এমন ইঙ্গিতও দিল যে, জিয়ার মৃত্যুর পিছনে ভারতের হাত থাকতেও পারে।

আমি ভারতীয় বলেই খবর প্রচারের এই নমুনায় মনটা তিক্ত হয়ে গেল। প্রমাণ ব্যতিরেকে শুধু অনুমানের ওপর ভারতের ঘাড়ে জিয়ার মৃত্যুর দায়ভাগ চাপানোটা না রুচিকর, না শোভন।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ প্লেন। দীপঙ্কর টেলিফোনে আমার জন্য সিট বুক করে রাখল। টি ডবলু-এর ফ্লাইট। এক ঘণ্টা লাগবে ওয়াশিংটন থেকে কলম্বাস।

তনুশ্রী রোজই ফোনে খবর নিচ্ছে। আজও নিল।

বললুম, তনুশ্রী, কাল যাচ্ছি। এয়ারপোর্টে থেকো।

তনুশ্রী উল্লাসে ফেটে পড়ে বলল, থাকব না! বলেন কি! আসছেন যে সেটাই ঢের।

দীপঙ্করের বাড়িতে শেষ দিনটা ভারি মন খারাপের মধ্যে কাটল। ওর ছোট্ট মেয়েটি কদিনে আমার এমন ন্যাওটা হয়েছে যে, ওকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছেই করছে না। পাখির মতো ছোট্ট রোগা মেয়েটা সারাক্ষণ হয় আমার কোলে, নয়তো আমার কাছ ঘেঁষে আছে। আর কলকল করে কত যে কথা তার আমার সঙ্গে। কিছুতেই সে আমাকে যেতে দেবে না।

তাকে বুঝিয়ে বললুম, আমি আবার ফিরে আসবো।

বাচ্চাদের এরকম মিথ্যে স্তোক না দিয়ে তো উপায়ও নেই।

পরদিন দীপঙ্করের ডিউটি সকালে। লোপা গাড়ি চালাতে জানে না। জানলেও লাভ নেই, দীপঙ্করের গাড়ি মাত্র একটি। সুতরাং আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন দীপঙ্করের এক সহকর্মী। স্বল্প পরিচয়ে এই মানুষটিকে আমার ভারি ভাল লেগেছিল। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স, অকৃতদার এই মানুষটি অতিশয় নম্রভাষী, রসিক এবং সহানুভূতিশীল।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, আমেরিকার ঘরোয়া এয়ারপোর্টগুলোও এত প্রকাণ্ড এবং এত ব্যস্ত যে হকচকিয়ে যেতে হয়।

এয়ারপোর্টে টার্মিনালে আমাকে নামিয়ে দিয়ে উনি গেলেন গাড়ি পার্ক করতে। বলে গেলেন, আপনি ঢুকে পড়ুন। টার্মিনালে সব জায়গায় এয়ার লাইন্সগুলোর সাইন আছে। টি ডবলু এ সাইন ধরে ধরে এগোতে থাকুন। আমি আসছি।

আমেরিকা বিশালত্বের দেশ। কোনও কিছু ছোটখাটো করে তৈরি করা এদের ধাতেই নেই। যা করবে তাই প্রকাণ্ড, তাই বিশাল। সুতরাং এয়ারপোর্ট টার্মিনালের অটোমেটিক দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই যে-কেউ হকচকিয়ে যাবেই এবং দিশাহারা বোধ করা বিচিত্র কিছু নয়। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখলে এবং না ঘাবড়ালে কোনও চিন্তা নেই। আপনি যে এয়ার লাইনসের যাত্রী তার সাইন পেয়ে যাবেন। দিক নির্দেশও। ওটা ধরে ধরে এগোলে বিশেষ গা না ঘামিয়েই নিরাপদে পৌঁছে যাবেন উদ্দিষ্ট কাউন্টারে।

আমার তাড়া নেই। প্লেন ছাড়তে ঢের দেরি। তাছাড়া আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছি কদিনেই। ঘাবড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি টার্মিনালটির বিশালত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করলুম খানিকক্ষণ।

টি ডবলু এ থেকে শুরু করে ইন্টারনাল ফ্লাইটের অজস্র সাইন চারদিকে ছড়ানো। এগিয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছোলাম সেখানে কমপিউটার নিয়ে বসা পাশাপাশি অনেকগুলো সাহেব। অনেক কাউন্টার। প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা এয়ার লাইনসের।

টি ডবলু এতে বিশেষ ভিড় নেই। আমার সামনে মাত্র দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা। তাদের পিছনে দাঁড়ালুম।

যখন আমার পালা এল কাউন্টারে এগিয়ে গিয়ে বললুম আমার নাম অমুক, কলম্বাসের ফ্লাইটে আমার একটা জায়গা চাই।

সাহেব সস্নেহে বলল, জায়গা যে হবে না।

সামান্য উদ্বেগের সঙ্গে বললুম, কিন্তু আমার সিট তো কাল বুক করেছি। তোমরা কানফার্ম করেছো।

এবার সাহেবের মুখে উদ্বেগ দেখা দিল। তাড়াতাড়ি কমপিউটার খুঁচিয়ে বুকিংটা বের করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু একটা গোলমাল হচ্ছে বুঝতে পারছি। মিনিট পাঁচেক কেটে যাওয়ার পর সাহেব হতাশায় মাথা নেড়ে বলল, ইটস আউট অফ অর্ডার স্যার।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম তাহলে ?

তাহলে আর উপায় কী ? তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ট্রাভেলার্স চেক দিয়ে টিকিট পেতে এত কম সময় লাগল যে অবাক মানতে হয়।

টিকিট নিয়ে পিছু ফিরে দেখি, ভদ্রলোক এসে গেছেন।

টিকিট পেলেন ?

পেলাম। আর খুব আনন্দ হল একটা ব্যাপার জেনে।

কী বলুন তো !

আমেরিকাতেও কমপিউটার খারাপ হয়।

উনি খুব হাসলেন, হবে না কেন, খুব হয়। তবে দেখবেন যন্ত্রটা মেরামত করতে বা পালটাতে এদের ঘণ্টাখানেকও লাগবে না।

দুজনে টার্মিনালের একটা ফোয়ারার ধারে বসলুম। খানিকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল।

তারপরই হঠাৎ কলম্বাস ফ্লাইটের ঘোষণা শোনা গেল।

এখানে সিকিউরিটি চেক-এর ঘনঘটা নেই, ঝামেলাও কম। ব্যাগ ট্যাগ এক্স রে মেশিনে চড়িয়ে দিলেই হল। এরা গায়ে হাত দিয়ে দেহ-তল্লাশ করে না। তার জন্য মেটাল ডিটেকটর আছে।

ভদ্রলোক আমাকে সিকিউরিটি চেক অবধি এগিয়ে দিলেন। বললেন, মনে রাখবেন, টি ডবলু এ সাইন ধরে যেতে হবে।

ভিতরকার লাউঞ্জটিও পেল্লায়। তাতে একসঙ্গে অন্তত গুটি তিনেক প্লেনের ডকিং হয়। সুতরাং লাউঞ্জেও বিভিন্ন এয়ার লাইনসের আলাদা আলাদা কাউন্টার রয়েছে। অনেক কাউন্টার, অনেক লোক।

এ যাত্রায় সহযাত্রী সবাই শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনী। ভারতীয় নেই, কৃষ্ণাঙ্গও নেই। মার্কিন শ্বেতাঙ্গরা অচেনা লোককেও সম্ভাষণ করে থাকে, আগেও বলেছি। লাউঞ্জে বসে বিমানে উঠবার জন্য অপেক্ষা করতে কারতে আশেপাশের দু'একজনের সঙ্গে এ রকম সম্ভাষণ-বিনিময় হল। ব্যাপারটা আমার কাছে স্বস্তিজনক। অচেনা দেশে, অচেনা এয়ারলাইনসে সম্পূর্ণ নতুন একটি জায়গায় উদ্দেশে রওনা হচ্ছি, তখন যদি অচেনা মানুষজন সামান্যতমও নিকট হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের একটা আবছা আভাস মনে ছায়া ফেলে যায়।

লাউঞ্জ মস্ত বড়, অনেকটা গোলাকৃতি। চারদিকে বিভিন্ন এয়ার লাইনসের কাউন্টার। কাউন্টারের পিছনেই বৃত্তাকার বসবার জায়গা। আমার উল্টোদিকেই এক মার্কিন-দম্পতি তাঁদের দুরন্ত বাচ্চাকে নিয়ে একটু হিমশিম খাচ্ছেন। মার্কিন শিশুদের জীবনীশক্তি উপচে পড়ে। তারা যখন দুরন্তপনা করে, তখন সেটাও বেশ দুরন্ত ব্যাপারই হয়। বছর দুয়েকের বাচ্চাটিও তরুণী মা আর তরুণ বাবাকে নাস্তানাবুদ করছিল। শিশুরা আমার বরাবরই প্রিয়। আমি যেমন তাদের পছন্দ করি, তারাও, কি-কারণে জানি না, আমাকে অপছন্দ করে না। একবার শিলিগুড়ি থেকে বিমানে কলকাতা আসার সময় সহযাত্রী এক দম্পতির শিশুকন্যাটি ভীষণ কাঁদছিল। আমি হাত বাড়াতেই মায়ের কোল থেকে ঝাঁপ খেয়ে চলে এল এবং কান্না থামিয়ে ফেলল। সেই যে আমার কোল-সই হল সে, দমদমে নেমেও আর ফেরত যেতে চায় না।

কি ভাববে না ভাববে চিন্তা করে আমি এই মার্কিন শিশুটির দিকে হাত বাড়াতে ভরসা পাচ্ছিলুম না। কিন্তু শিশু, তা সে মার্কিন হোক বা কাফ্রি—আমার বাছবিচার থাকে না। বাচ্চাটা হঠাৎ চেয়ার গুনতে গুনতে আমার কাছাকাছি আসতেই আমি হাত বাড়িয়ে বললুম, গিম্মি এ হাগ সনি।

বাচ্চাটা একথা শুনে থমকে গিয়ে কুটিল চক্ষুতে আমাকে মাপজোখ করতে লাগল। তারপর হঠাৎ এক গাল হেসে ইয়াঃ বলে একটা তুমুল ঝাঁপ খেয়ে চলে এল কোলে।

হু ইউ ?

অ্যাম এ গুড গাই। কল মি আঙ্কল।

আঙ্কল ? হাই মাম্মি, ইজ হি মাই আঙ্কল ?

মার্কিন তরুণীটি কি, বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। আমি তাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক করার জন্য বললুম, শো মি ইওর টিথ। সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দেখাল।

এইভাবে বাচ্চাটির সঙ্গে জমে গেল খুব। পাশের চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে সে বিস্তর তথ্য দিতে লাগল আমাকে। তার জনি নামে এক বন্ধু আছে অ্যান্ড জনি হ্যাজ এ সিস্টার উইথ জাস্ট ওয়ান টুথ। আই লাভ ক্যান্ডি অ্যান্ড সুইট পীজ। এরকম তথ্যের পর তথ্য। তার মা-বাবা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এবং আমার দিকে কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে রইল।

বোধহয় অভদ্রতা হচ্ছে ভেবেই স্বামী-স্ত্রী একটু নিজেদের মধ্যে আলাপ করে নিল, তারপর মেয়েটি সসঙ্কোচে এসে বসল আমার অন্যপাশের চেয়ারে।

সৌজন্য বিনিময়ের পর মেয়েটি হঠাৎ বলল, ইউ অ্যান ইন্ডিয়ান ?

ইয়াঃ, হাউ কুড ইউ গেস ?

মাই নেবার ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান। হি হিজ গস, এস গস। ফ্রম ক্যালকাটা।

বুঝলুম, কোনও একজন এস ঘোষ মেয়েটির প্রতিবেশী। বললুম, আই টু অ্যাম ফ্রম ক্যালকাটা।

এইভাবে আলাপ চলছে দেখে বাচ্চাটা মোটেই খুশি নয়। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখটা তার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, টক টু মি আঙ্কল।

সময়টা জলের মতো কেটে গেল। হঠাৎ বিমানে ওঠার ঘোষণা শোনা যেতেই যাত্রীরা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন। ডকিং চ্যানেলের দিকে যাওয়ার সময় জেফ, অর্থাৎ বাচ্চাটা আমার হাত ধরে একরকম ঝুলে রইল। কিছুতেই মা-বাবার কাছে যাবে না।

ডি সি টেন বিমানটি প্রশস্ত এবং সুন্দর। আসনগুলি অপেক্ষাকৃত চওড়া। যাত্রীরা সংখ্যা আসনের তুলনায় যৎসামান্য। সব মিলিয়ে আমরা পঞ্চাশজনও নই। কিন্তু আসন সংখ্যা তার দ্বিগুণ বা তারও বেশি।

বিমানে উঠবার পরেও জেফ আমাকে ছাড়ে না। ফলে তার মা-বাবা যেন কুণ্ঠায় পড়ে গেল।

আমি বললাম, লেট হিম সিট উইথ মি।

হ্যারল্ড, অর্থাৎ ছেলেটির বাবা সংকোচের সঙ্গে বলল, হি উইল বদার ইউ।

চিল্ডরেন ডোন্ট বদার মি। আই লাভ দেম।

আই ক্যান সি দ্যাট। ইউ আর কোয়াইট এ চার্মার।

জেনি অর্থাৎ জেফ-এর মা অবশেষে ক্যান্ডির লোভ দেখিয়ে জেফকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে পারল। কয়েক সারি পিছনে তাদের আসন।

আমার সারিতে আমি ছাড়া কেউ নেই। জানালার ধারে গ্যাঁট হয়ে বসলুম। এয়ারপোর্টের টার্মিনালটি জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। কী সুছাঁদ সুন্দর এদের সব নির্মাণ। যেটাই করে, সেটাই শতকরা একশভাগ নিখুঁত আর সুন্দর করে গড়তে চেষ্টা করে।

প্লেন-এর দরজা বন্ধ হল। রানওয়ে ধরে দৌড়ে যখন আকাশে উঠে পড়ল, তখন নিচে ওয়াশিংটন ডি সি-র বিপুল বিস্তার সম্মোহিত চোখে দেখলুম। উন্নত নগর ও সড়ক পরিকল্পনা এদের শহরগুলিকে যেমন জ্যামিতিক রূপ দিয়েছে, তেমনি প্রকৃতি-চর্চার ফলে কোথাও শহরটাকে ন্যাড়া বলে মনে হয় না।

আমেরিকার অভ্যন্তরে আমার প্রথম বিমান যাত্রাটিকে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি। আকাশ থেকে আমেরিকাকে কেমন দেখায়, তা জানা দরকার। আকাশ মেঘশূন্য এবং রৌদ্রোজ্জ্বল বলে অনেক ওপর থেকেও খানিকটা বোঝা যাচ্ছিল নিচের চেহারা। যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে সেটা হল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জনশূন্য ও পতিত পড়ে আছে। না আছে সেখানে চাষবাস, না বাড়িঘর। শুধু সরলরেখার

মতো হাইওয়ে চলে গেছে তার মাঝখান দিয়ে। সড়কের কোনও অভাব নেই। উচ্চাবচ ভূমি, জঙ্গল, প্রান্তর মিলিয়ে আমেরিকার ভূ-প্রকৃতিতে অজস্র বৈচিত্র্য। মাঝে মাঝে এক একটা শহর চলে আসছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে এই সব ছোট শহরের বিস্তার। মানুষ হয়তো কম থাকে, কিন্তু যারা থাকে, তারা অনেকটা জায়গা নিয়ে থাকে।

বিমান ছাড়ার পরেই শ্বেতাঙ্গ বিমানসেবিকা ও সেবকরা এলেন একটা ট্রলি ঠেলে। হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা প্যাকেট। প্যাকেটের ওপরে লেখা পী নাটস। জানতুম আমেরিকায় চীনে বাদামকে পী নাট বলা হয়ে থাকে। প্যাকেটটা খুলে বেশ বড় সাইজের চীনে বাদাম দেখে দু'চারটে মুখে দিলুম। কিন্তু বিস্বাদে মুখ ভরে গেল। চীনে বাদাম কেউ চিনি দিয়ে ভাজে? প্যাকেটটা সুতরাং ভর্তি অবস্থাতেই বর্জন করলুম। ছোট কাচের গেলাসে ঠাণ্ডা পানীয়টি বরং এই গরমে অনেক বেশি তৃপ্তিদায়ক হল। চাইলে আরও দিত। যত খুশি। আমার আরও এক গেলাস খাওয়ার ইচ্ছেও ছিল। সংকোচবশে পারলুম না চাইতে।

হাই, আঙ্কল, হোয়াডার ইউ ডুয়িং? জেফ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে।

ডুয়িং নাথিং জেফ।

ইউ সি দ্যাট রিভার অ্যাঙ্কল? মম সেজ দ্যাটস পোটোম্যাক। আই সে নো, দ্যাট মাস্ট বি আমাজন।

ইওর মম ইজ রাইট, সনি।

আমেরিকার প্রতি যে আকর্ষণটা এ কয়েকদিনে সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে, এই বিমানযাত্রার তা আরও দৃঢ়মূল হল। জানালা দিয়ে আমেরিকার বিস্তার ও বৈচিত্র্য প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে দেখলুম। মাঝেমধ্যে অবশ্য জেফ-এর প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছিল। কোথা দিয়ে একটি ঘণ্টা যে কেটে গেল, টেরই পেলুম না।

বিশাল এক বিমান বন্দর এবং দূরবর্তী কলম্বাস শহরটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে উচ্চতা হারিয়ে নিচে নামছে বিমান। অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের পক্ষে ডি সি টেন অত্যন্ত উপযোগী উড়ানযন্ত্র। শব্দ কম, কাঁপুনি কম এবং আসন অতিশয় আরামদায়ক।

কলম্বাস বিমানবন্দরটিও বিশাল। ডকিং-এর পর টার্মিনালে ঢুকে দেখি সেটি একটি প্রকাণ্ড ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়। জেফ, জেনি আর হ্যারল্ড আমার হাত ছুঁয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিল। কোনদিকে যাবো তনুশ্রী কোথায় অপেক্ষা করছে, কে জানে। টার্মিনালের মুখে তাকে না দেখে ভাবলুম, নিশ্চয়ই বাইরে অপেক্ষা করছে।

স্যুটকেসটি লাগেজ থেকে সংগ্রহ করতে তলায় নামতে হল। এখানকার বিমানবন্দরে মাল খালাস হয় ঝটিতি।

এত তাড়াতাড়ি এরা কি করে মাল নামিয়ে টার্মিনালে পৌঁছে দেয়, কে জানে। স্যুটকেসটি নিয়ে আমি বাইরে বেরোনোর পথ খুঁজতে লাগলুম। একটা একজিট সাইন দেখে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে একটা রাস্তায় পড়লুম। কিন্তু সে-রাস্তা একেবারে ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই।

সভয়ে তাড়াতাড়ি আবার টার্মিনালে ঢুকে একটু অনিশ্চয়তার সঙ্গে দোতলায় উঠতেই দূর থেকে এক মেমসাহেব হাত নাড়ল। কাছে আসতেই বুঝলুম, মেমসাহেব নয়, মেম-পোশাকে আমাদের তনুশ্রীই।

আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি।

আমিও খুঁজছি তোমাকে। এর মধ্যে আমি ভুল করে অন্য রাস্তাতেও চলে গিয়েছিলাম।

সর্বনাশ! চলুন, নিশ্চয়ই আপনার খিদে পেয়ে গেছে।

টার্মিনালের লাগোয়া বহু টিয়র বিশিষ্ট পার্কিং লট। প্রত্যেক টিয়রের সাংকেতিক নম্বর আছে। তনুশ্রী আমাকে নিয়ে লিফটে উঠে হন্যে হয়ে বোতাম টিপতে লাগল। কিন্তু কোথাও কোনও ভুলের ফলে আমরা বার তিনেক বিভিন্ন টিয়রে নেমেও গাড়িটার হদিশ পেলুম না। এই সব অতিকায় পার্কিং লটে এত গাড়ি পার্ক করা থাকে যে, তনুশ্রীর মতো আমেরিকাবাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মেয়েরও বেশ দিশেহারা অবস্থা। চতুর্থ বারে অবশ্য আমরা সঠিক টিয়রে নামলুম এবং গাড়িটারও পাত্তা মিলল।

বিশাল গাড়ি। ওল্ডসমোবাইল!

এত বড় গাড়ি এনেছো তনুশ্রী?

এটাই বেশি কমফোর্টবল। আর একটা ছোটো গাড়ি আছে, কিন্তু সেটায় আপনি এত আরাম পাবেন না।

গাড়িতে উঠেই বুঝলুম, সত্যিই দারুণ। মাখনের মতো গদি। ঠাণ্ডা মেশিন চালু হতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। এমনিতেই আমেরিকার রাস্তাঘাট অতীব মসৃণ। গাড়িটি বড়, ভারি এবং ট্রাকশন বেশি হওয়ার ফলে গাড়ি যে চলছে সেটাই টের পাওয়া যায় না।

তনুশ্রী তাদের শহর দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল। কলম্বাস শহরটিতে লোকবসতি বেশ কম। বাড়িঘর ছাড়া ছাড়া। অবশ্য ডাউনটাউন কিছুটা জমজমাট। ওহায়ো রাজ্যের এই শহরটিতে নাগরিক সুখ-সুবিধে যথাবিহিত রয়েছে।

যে-শহরতলিতে তনুশ্রীর বাস, সে জায়গাটিও যথারীতি লন, গাছ ইত্যাদিতে আকীর্ণ। তনুশ্রীর বাড়ি অবশ্য বেশ বড়। ঢুকতেই বিশাল হলঘর, লিভিংরুম, খাবার ঘর নিয়ে অনেকটা জায়গা। পিছনে তনুশ্রীর বাগান, তাতে উচ্ছে থেকে পুঁইশাক, লাউ, কুমড়ো সবই ফলেছে।

তনুশ্রীর বর প্রভাত পেশায় ইনজিনিয়ার বটে, কিন্তু তার মনপ্রাণ সাহিত্যে সমর্পিত। সে কলম্বাস থেকে একখানা সাহিত্য-পত্রিকা দীর্ঘদিন যাবৎ একা হাতে প্রকাশ করে যাচ্ছে নিয়মিত। লিভিংরুমের ওপরে একটা চমৎকার পাটাতনের মতো জায়গায় তার পত্রিকা 'অতলান্তিক'-এর দপ্তর। সেখানেই দিনের অবসর সময়টুকু সে অতলান্তিকের কাজ করে কাটায়। সে অত্যন্ত সরল-সিধে মানুষ। তনুশ্রী, সম্পর্কে সুকান্ত ভট্টাচার্যের বোন এবং সে নিজেও সুখ্যাত কবি। ফলে বাড়িতে সব সময়ে একটা সাহিত্যের আবহাওয়া। তার ওপর তনুশ্রীর এক দাদা অসীম ঠাকুর গতকালই কলকাতা থেকে পৌঁছেছে। সে আদ্যন্ত সাহিত্যপ্রাণ মানুষ এবং পেশায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক।

ফলে এক লহমায় আড্ডা জমে গেল এবং হৈ হৈ হতে লাগল।

এক ফাঁকে তনুশ্রী তার বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাল আমাকে। চমৎকার বাড়িটি। তনুশ্রীর ছেলে এবং মেয়ে দুজনেরই জন্ম এবং শিক্ষা আমেরিকায়। এসব ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাঙালি ছেলেমেয়েই ইংরিজি ঝোঁকা এবং বাংলা-ভোলা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সেটা এরা হতে দেয়নি। ছেলে রানা ঝরঝর করে বাংলা বলে। মেয়েও তাই।

মধ্যাহ্নভোজে এই বাড়িতে প্রথম ভাত খেলুম। বহুরকমের ভাজাভুজি আর তরকারি রান্না করেছে তনুশ্রী। সবই গরম। মেকসিকো থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে আমের বাক্স আসে। সেই আম যেমন মিষ্টি, তেমনি তার গন্ধ। আকারে বিশাল।

প্রচুর খেয়েও গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা গেল না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, আমি কম খেয়েছি।

আমি আসবার পর সবাই মিলে নায়াগ্রা যাওয়া হবে বলে প্রোগ্রাম স্থির করা আছে। কাল সকালেই যাবো আমরা।

তার আগে চলুন, শহরটা আপনাকে দেখিয়ে আনি। শপিংও নিশ্চয়ই করবেন। এখানে সব কিছু সস্তা। কাছেই একটা দোকান আছে, সেটা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। বারো মাস।

বলো কী।

বাড়ি থেকে সুপারস্টোরের দূরত্ব খুব বেশি নয়। আমেরিকার আর পাঁচটা সুপারস্টোর যেমন এটিও অবিকল তেমনই। তবে বোধহয় আরও একটু বড়। অধিকাংশ সুপারস্টোরেই এসকালেটর আছে এবং তিন-চারতলা জুড়ে বিশাল পণ্যসামগ্রীর মেলা। ফুরোতে চায় না। এক-একদিন এক-এক বিভাগে সেল থাকে। সেল-এ বেশ ভিড় হয়।

এই দোকানে আমাকে আকর্ষণ করেছিল ঘড়ি। একটা টার্নটেবিল বিভিন্ন থাকে তিন চারশো ঘড়ি নাঙ্গা পড়ে আছে। দামী কমদামী নানা রকমের। এত

অবহেলা এবং অসতর্কভাবে এত ঘড়ি দেখে ভারতীয় মানসিকতার পরিবেশে তনুশ্রীকে জিজ্ঞেস করলুম, চুরি যায় না ?

তনুশ্রী বলল, হয়তো মাঝেমধ্যে চুরি হয়। তবে এরা গায়ে মাখে না।

আমি জানতুম এসব স্টোরে ফ্লোর ডিটেকটিভ থাকে এবং থাকে চোরা ইলেকট্রনিক্স মনিটর। কোথায় কী হাতসাফাই হচ্ছে তা ধরে ফেলতে মুহূর্তও দেরি হয় না। তবে সুপারস্টোর যেহেতু পেল্লায় জায়গা সেখানে সর্বত্র সবসময়ে নজর রাখা সম্ভব নয়। তবে ভরসার কথা এসব টাউনশিপে চোরের উৎপাত নেই বলেই ধরে নেওয়া যায়। আর যদিবা দুচারজন থেকেও থাকে তারা ঘড়িটড়ির মতো ফঙ্গবেনে জিনিস ছোঁবে বলে মনে হয় না।

তনুশ্রীর ছেলে রাণার একখানা স্পোর্টস সাইকেল আছে। বেশ দামী জিনিস। সেটা দেখলুম, বাইরে পড়ে আছে।

তনুশ্রীকে বললুম, রাণার সাইকেলটা ওরকম বাইরে ফেলে রাখো, চুরিটুরি হয়ে যাবে। ঘরে রাখলেই তো পারো।

তনুশ্রী হেসে কুটিপাটি, কে সাইকেল চুরি করতে আসবে বলুন তো ! কার দায় পড়েছে ? ওসব এখানে কেউ ছোঁয়ও না।

একটু হতভম্ব লাগে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। আমাদের দেশে ব্যাপারটা অন্য। আমেরিকা প্রথমত ধনীর দেশ। এখানকার চোরছ্যাঁচড়রা চুরি করে বৃহত্তর দাঁও-এর জন্য। আর এখানকার ছিঁচকে চোরেরাও নগদ বা সোনাদানা ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করে না। তুলনায় ভারতবর্ষ গরিব দেশ। সেখানে অভাবে স্বভাব নষ্ট হতেই পারে। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের শিলং পাহাড়ে বা গাড়োয়াল হিমালয়ে এখনও এমন জায়গা বিস্তর আছে যেখানে বাড়িতে তালা দিয়ে বেরোনোরও দরকার হয় না। শিলং-এ আমার বন্ধু থাকত। বলেছিল, কলেজ ছুটি হলে আমি দরজাটায় স্রেফ একটা অতি সস্তা দেড় টাকার তালা ঝুলিয়ে মাস দুয়েকের জন্য চলে যাই। কিচ্ছু হয় না। খাসিয়ারা মরে গেলেও চুরি করে না। বস্তুত একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষে চোরেরা অভাবে চুরি করে কমই, তার স্বভাবচোর। এদের অধিকাংশেরই বাস সমতলে এবং শহরে এ তীর্থক্ষেত্রসমূহে। আবার দক্ষিণ ভারত সম্পূর্ণ অন্য রকম। ব্যাঙ্গালোরে একতলা বাড়িতে জানালার ধারে টেবিলের ওপর ঘড়ি আর মানিব্যাগ ইচ্ছে করেই রেখে রাত্রিবেলা শুয়েছি। গৃহকর্তা বলেছিলেন, নির্ভয়ে রাখুন। গ্যারান্টি দিচ্ছি চুরি হবে না। বাস্তবিক হয়ওনি। চৌর্যবৃত্তিটা মনে হয়, একটা মানসিকতা। অভাবের সঙ্গে এর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

প্রভাত আর তনুশ্রী দুজনেই বলল, চলুন কাল আপনাকে একটা কেভ দেখিয়ে নিয়ে আসি। বেশি দূরেও নয়। সকালে গিয়ে বিকালে ফিরে আসা যাবে।

কী রকম কেভ ?

খুব ইন্টারেস্টিং। মাটির নিচে ফাটলের মধ্যে রেড ইন্ডিয়ানদের আস্তানা ছিল। গুপ্ত আস্তানা।

শুনে আগ্রহ বোধ করলুম। বললুম, চলো তাহলে।

তনুশ্রীর বাড়ি এমনিতেই সরগরম। কলকাতা থেকে অসীম তো এসেছেই। আর নিউ জার্সি থেকে এসেছে তনুশ্রীর বান্ধবীর মা আর মেয়ে। সারাদিন গল্পগুজব আড্ডা, চা, খাবার চলছে।

রাণার জন্ম আমেরিকায়। সে যথারীতি মার্কিন ইংরিজি বলে এবং বাংলাও বলে সমান দক্ষতায়। তার বন্ধু মাইক বেশ নিকট প্রতিবেশী। তেরো চৌদ্দ বছরের এ দুটি কিশোরের মধ্যে ভাব গলায় গলায়। শনলুম, মাইকের মা মাইকের বাবাকে ডিভোর্স করে আবার বিয়ে করেছে। সুতরাং মাইককে সৎ বাবার কাছেই থাকতে হয়। বাড়িতে বোধহয় তেমন আনন্দ পায় না সে। দিনরাত রাণার কাছেই পড়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বাঙালি পরিবারে মেলামেশার ফলে সে বেশ কয়েকটা বাংলা কথা বলতে এবং বুঝতে পারে।

তনুশ্রী হয়তো বলে, এই মাইক, বাড়ি যা তো এখন। রাত হয়েছে।

মাইক জবাব দেয়, আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি।

ছেলেটি কিন্তু বড্ড ভাল। রোগা লম্বা ছাঁদের চেহারা। নিরীহ দর্শন।

আমেরিকায় ঝি-চাকর রাখার প্রশ্ন নেই। তাই এখানে পরিবারের প্রত্যেককেই ঘরের কাজ করতে হয়। ঘরদোর পরিষ্কার করা, বাসনমাজা, রান্না, টেবিল সাজানো, কচাকুচি, ছোটোখাটো মেরামত, বাথরুম সাফ রাখা ইত্যাদি। দেখলুম রাণা যখন ঘরের কাজ করে তখন মাইকও এসে তার সঙ্গে হাত লাগায়। অবশ্য এটাকে অস্বাভাবিক মনে করার মানসিকতা মার্কিনদের নয়। তবে মাইক তার বাড়ির কাজ করে দেয় বলে তনুশ্রী বা প্রভাতের একটু সঙ্কোচ আছে।

তনুশ্রীর বাড়িতেই টেলিফোন এল। নিউইয়র্কের জনৈক ডাক্তাব ডিভাইন আমার খোঁজ করছেন। তখন আমি বাড়িতে ছিলুম না। বলে রেখেছেন, সন্ধেবেলায় আবার ফোন করবেন।

সন্ধেবেলা ডাক্তার ডিভাইন ফোন করলেন, শ্রীচিন্ময়ের কথা আপনি কি কিছু জানেন ?

আমি জানতুম, তবে সামান্যই। নিউইয়র্কে আমি শ্রীচিন্ময়ের পোস্টার দেখেছি। শংকরের লেখায় তাঁর উল্লেখ আছে বলেও জানি। এই ভারতীয় যোগী নিউইয়র্কে থাকেন। ডিভাইন তাঁর শিষ্য।

বললুম, জানি। তবে সামান্যই।

আমি আপনাকে তাঁর সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানাতে চাই। আপনি যখন

নিউইয়র্কে আসবেন আমাকে তখন পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারবেন কি ?

বললুম, সময় দিতে বাধা নেই। তবে এখানে আমি অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সময় তাদের হাতে। কখন কবে কার বাড়িতে থাকব তার কিছু ঠিক নেই।

আমি সময় করে নেবো। বেশি নয়, পাঁচ মিনিট। আমি কিছু লিটারেচারও আপনাকে দেবো।

এ পর্যন্ত কথা হয়ে রইল। আশ্চর্যের বিষয়, ডিভাইন কিন্তু আরও কয়েকবার বিভিন্ন জায়গায় টেলিফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কাজটা খুব সহজ নয়। খুঁজে খুঁজে টেলিফোন নম্বর বের করে ভ্রাম্যমাণ আমাকে ধরা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তবে শেষ অবধি ডিভাইনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

তনুশ্রীর বাড়িতে দোতলায় একটি ছোটো ঘরে আমি আছি। বেশ কোজি ঘরখানা। একা, একটেরে। লাগোয়া বাথরুম। এ ঘরে দেওয়ালজোড়া বুক কেস-এ রাশি রাশি বাংলা বই। পত্র-পত্রিকা। একেবারে হালের সংখ্যা 'দেশ' অবধি মজুদ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সাহিত্য-পাগল বলেই এদের বাড়িতে এত বই। তবে সব বাঙালি বাড়িতেই বই পাওয়া যাবে। দূর-প্রবাসে ভেতো বাঙালির নির্জন জীবনে বইয়ের মতো—বিশেষ করে বাংলা বইয়ের মতো এমন অন্তরঙ্গ সঙ্গী আর কে আছে !

অতলান্তিক নামে যে কাগজখানা এরা-দুজনে প্রকাশ করে তারও মোটামুটি ভাল বিক্রি আছে এবং আয়ব্যয়ে মাথায় মাথায় হয়ে যায়। আমেরিকার বাঙালিরা কাগজ কেনে এবং পড়েও।

তনুশ্রীর বাড়িতেও স্থানীয় বাঙালিদের বেশ আড্ডা হয় প্রায়ই। সন্ধেবেলা কয়েকজন এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দম্পতি একটি বাড়ি কিনলেন তনুশ্রীর পাড়ায়। সেদিনই বাড়ি কেনার ডিল পাকা হয়ে গেল।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কত পড়ল ?

ভদ্রমহিলা খুব আনন্দের সঙ্গে জানালেন, বেশ সস্তা। এক লাখ ত্রিশ হাজার ডলার মাত্র। দেড় লাখ চেয়েছিল, কমিয়েছি।

খুব চমকালুম না। বাড়ি বলতে বেসমেন্ট নিয়ে অন্তত তিনতলা। সম্পূর্ণ বাতানুকূল। গ্যাস লাইন, টেলিফোন ইত্যাদি তো আছেই খানিকটা গৃহসজ্জাও থাকে। তার যার ইচ্ছে সে হয়তো সবই নতুন করে নেয়। কোনও ঝামেলা নেই। টেলিফোন করলেই ঘর সাজানোর লোক এসে মেঝের মাপমতো ঘরে ঘরে কার্পেট পেতে দিয়ে যাবে। আসবাব চলে আসবে অর্ডারমতো। দাম নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। সবই ধারে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে শোধ হয়ে যাবে।

এরকম ধারের সুবিধে আমাদের দেশে নেই। হায়ার পারচেজ চালু হচ্ছে

সবে, কিন্তু তারও হাজার ঝামেলা। কিন্তু এদেশে যে কোনও অচেনা জায়গায় স্রেফ ক্রেডিট কার্ডের জোরে যা খুশি কেনা যায়। বড় রকমের কেনাকাটার জন্য— বাড়ি বা সম্পত্তির জন্য ব্যাঙ্ক তো এক পায়ে খাড়া আছে ঋণ দিতে। ফোকটে ফুটানি করে নাও, পরে শোধ নিও।

কিছু দিন আগে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি গিয়েছিলাম। যাঁরা গেছেন তাঁরাই জানেন, পাঁচমারি শহরটা ছোটো হলেও তার দ্রষ্টব্য অনেক এবং ভারি মজার মজার ব্যাপার আছে সেখানে। গুপ্ত মহাদেও, পাতাল ভৈরব আর সেই জল-ঝরা গুহার অভ্যন্তরের শিব, সবই দেখবার মতো জিনিস। যাঁরা পাঁচমারি দেখেছেন তাঁদের কাছে ওলানটাঙ্গি ইন্ডিয়ান কেভস হয়তো তেমন বিস্ময়কর হবে না। তবু ওহাইও রাজ্যের কলম্বাস শহরে গেলে ওলানটাঙ্গি অবশ্যই দ্রষ্টব্যের মধ্যে রাখবেন। কেননা, এর সঙ্গে মার্কিন আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের প্রাকৃত জীবনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

এক সকালে মোটারকম ব্রেকফাস্ট খেয়ে সবাই মিলে বড় গাড়িটায় বেরিয়ে পড়লুম। খানিক দূর হাইওয়ে ধরে গিয়ে তারপর অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় পড়া গেল। গাছপালা তৃণভূমিতে মোহাচ্ছন্ন কান্ট্রিসাইড। চোখ মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়। আর কী নির্জন, জনশূন্য মাইলের পর মাইল এলাকা। হঠাৎ হঠাৎ ছোটোখাটো কিন্তু সমৃদ্ধ গ্রাম্য বসতি চলে আসে। দেখা যায় খামারবাড়ি। তবে এখানে যত্রতত্র গরু বা ছাগল বা ভেড়া চরতে দেখা যায় না। নেই রাস্তার কুকুরও। হঠাৎ কারও পোষা মুরগি উড়ে এসে আপনার গাড়ির বনেটে বসবে না। গৃহপালিতদের জন্য এখানে সযত্ন রচিত তৃণভূমি আলাদা করে আছে। হাঁস মুরগী কুকুরকেও এখানে প্রতিপালন করা হয়। তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় না। আর অবাঞ্ছিত বা বিপজ্জনক জীবগুলির জন্য নিশ্চয়ই নিধনযজ্ঞও আছে। সঠিক জানি না। না হলে রাস্তার কুকুর গেল কোথায় ? আমেরিকায় আর একটি পরিচিত জিনিসও চোখে পড়েনি। সেটা হল, টিকটিকি।

একটা জায়গায় বেশ বড়সড় একটি লেক দেখলুম। দেখা গেল সেখানে উইক এন্ডে বহু মানুষ নিজস্ব মোটরবোট বা স্পিডবোট নিয়ে এসেছে জলক্রীড়া করার জন্য। গাড়ির পিছনে ট্রেলারে চাপানো নানা ধরনের সেইসব জলযানকে জলে নামানোর জন্য যান্ত্রিক বন্দোবস্ত আছে। অন্তত ত্রিশ চল্লিশটা গাড়ি আনলোড করার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে।

আমার জন্ম পূর্ববঙ্গে। জলের দেশ। তবু সেখানে জলের প্রতি এত টান কারও দেখিনি। এরা ছুটি পেলেই সমুদ্রে না হয় যে কোনও জলাশয়ে ছুটবে জলবাস করার জন্য। মাছ ধরবে, সাঁতার কাটবে, ওয়াটার স্কি করবে। জলকে এরা গভীরভাবে ব্যবহার করে। ক্লান্তি নেই।

তোমাদের এরকম বোট নেই কেন প্রভাত ?

কী হবে দাদা ? সারা সপ্তাহ খেটেখুটে আর এনার্জি থাকে না। এরা হল দৈত্যের জাত। এদের কথা আলাদা।

প্রভাতের একটু হার্ট প্রবলেমও আছে। তনুশ্রী তাকে লম্বা পাল্লায় গাড়ি চালাতে দিতে চায় না। প্রভাত অবশ্য জোর করেই চালায়।

জিজ্ঞেস করলুম, অন্য বাঙালিদেরও কারও মোটরবোট আছে এমন তো দেখিনি।

না। কারও নেই। বাঙালিরা ছুটি পেলেই একে অন্যের বাড়ি যায় আড্ডা মারতে। আড্ডার চেয়ে ভাল জিনিস আর কী আছে ?

কথাটা স্বীকার করলুম। সাহেবদের ধাত আলাদা। সকলেরই যে ওরকম হতে হবে তার কোনও মানে নেই।

জলাশয়ের ধারে খানিকক্ষণ গাড়ি থামিয়ে আমরা কাণ্ডটা দেখলুম। লেকটা এমন কিছু আহামরি নয়। তারই বাহার দেখলে অবাক মানতে হয়। এই একটেরে দূরবর্তী জায়গায় একটা লেকে-জলক্রীড়া করার জন্য এরা যে বিরাট বন্দোবস্ত করে রেখেছে সেটা তাজ্জব হয়ে দেখার মতো। দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, স্মারক বিপনি সব আছে। জলাশয়ে বোট নিয়ে নামবার দক্ষিণাও আছে। আমেরিকা এক নম্বরের বাণিজ্যিক দেশ।

আমরা চলেছি ইন্ডিয়ান কেভস দেখতে। হাসিঠাট্টা ইয়ার্কি গল্পগুজবে যাত্রাটি ভারি আনন্দময় হচ্ছে। বাইরে ঝকঝক করছে রোদ। বহুদূর অবধি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

দু'একটা বাঁক নিয়ে আমরা একটি আধা-শহরের মতো জায়গায় ঢুকে পড়লুম। পার্ক, ফুলের বাগান, ছবির মতো কিছু বাড়িঘর। ওলানটাঙ্গি ইন্ডিয়ান কেভসকে কেন্দ্র করে বেশ একটা ফাঁদালো বসতি গড়ে উঠেছে।

সব জায়গাতেই পয়সা। আমেরিকায় যে কোনও দ্রষ্টব্য বস্তুর জন্য পয়সা ফেলতে হয়। এমন কি প্রকৃতিকেও এরা অতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসাতে পর্যবসিত করেছে। ওলানটাঙ্গি কেভস-এ ঢুকতেও টিকিট কাটতে হল।

বেশ বড়সড় সাজানো একখান হলঘর হল রিসেপসান। টিকিট কাউন্টার থেকে প্রভাত টিকিট কেটে আনার পর আমরা এক দঙ্গল টুরিস্ট একটি অতি সুন্দরী তরুণীর পিছু পিছু ভূগর্ভে নামতে লাগলাম। সংকীর্ণ খাড়া নয। সিঁড়ির মতো ধাপ কাটা আছে বটে, কিন্তু বেশ অস্বস্তি হয়। ভেতরে যথাযথ আলোর ব্যবস্থা করা আছে। বেশি আলোয় ঝলসে দেওয়া হয়নি, আবার অন্ধকারও করে রাখা হয়নি মন্দ আলোয়। বেশ রহস্যময়তার মতো কিছু সৃষ্টি হয়ে আছে। মার্কিনদের সঙ্গে এই রুচিবোধ না মিশলে দেশটা এত সুন্দর করা যেত না।

রেড ইন্ডিয়ানরা সুদূর অতীতে এই প্রাকৃতিক গুহার গোলকধাঁধা আবিষ্কার করে এখানে একটা বেশ বসতি স্থাপন করেছিল। বহিঃশত্রু এবং ঝড়জল থেকে আত্মরক্ষার জন্য চমৎকার আশ্রয়। গুহার ভেতরে শীত-গ্রীষ্ম দুয়েরই প্রভাব কম। বাইরে থেকে বোঝা যায় না বটে, কিন্তু ওলানটাঙ্গির গর্ভে নামলে অবাক হতে হয় এর পরিসর দেখে। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ, অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। বোঝা যায় বেশ বড় একটি গোষ্ঠীই হয়তো এখানে বসবাস করত। রেড ইন্ডিয়ানদের বসতির একটা আবহ গুহার ভেতরে রচনা করে রাখা হয়েছে। প্রকৃতি যে কত বড় শিল্পী এবং ইনজিনিয়ার তা ওলানটাঙ্গিতে নেমে আর একবার মালুম হল।

সুন্দরী মেয়েটি গড়গড় করে ওলানটাঙ্গির ইতিহাস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। তার রসবোধও চমৎকার। এই গুহাবাড়ির ইতিহাস জেনে কীই বা হবে! রেড ইন্ডিয়ানদের ইতিহাসই বা কী এমন গুরুতর? প্রাকৃতজনদের মতোই তারা জীবন-যাপন করত, যতদিন না সাহেবরা এসে হামলা করল।

ছেলেবেলা থেকে ওয়েস্টার্ন ছবি দেখে আসছি। সে সব ছবিতে রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে উপনিবেশকারী সাহেবদের বীরত্ব ফলাও করে দেখানো হয়। এমন লজ্জাজনক বীরত্বও আর হয় না। রেড ইন্ডিয়ানদের তীর আর বল্লমের বিরুদ্ধে সাহেবদের আগ্নেয়াস্ত্র। লড়াই প্রায় একতরফা। একটি সাহেব মরেছে তো একশটা রেড ইন্ডিয়ান। এই অসহায় মানুষগুলোকে বন্দুক পিস্তল তোপের মুখে চড়িয়ে দেওয়ার লজ্জা ঢাকতেই বুঝি গল্পে উপন্যাসে চলচ্চিত্রে সাহেবদের বীরত্বে চড়া রং দেওয়া হয়েছে। রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা এখন খুবই কম। বেশিরভাগ অবশ্য আর্যজনতায় মিশে গেছে। এটা যে একদিন তাদেরই দেশ ছিল সেই দাবিও তারা আর করে না।

না, রেড ইন্ডিয়ানদের আজকের মার্কিন সমাজে আর আলাদা করে চেনা যাবে না। তবে এই সহজ-সরল ভূমিপুত্র ও ভূমিকন্যাদের ওপর সাহেবরা যে বর্বরের মতোই হামলা করেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ওলানটাঙ্গি গুহার গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা জায়গায় এলাম যেখানে প্রকৃতির খেয়ালে গুহার ছাদ থেকে নিম্নমুখ তরোয়াল বল্লম ইত্যাদির মতো তীক্ষ্মমুখ স্ট্যালাগটাইট ঝুলে আছে। দেখলে গা শিরশির করে, এই বুঝি খসে পড়ল মাথায়! সেই সুন্দরী গাইড আমাদের ঠিক ওই স্ট্যালাগটাইটের তলায় দাঁড় করিয়ে নিজে একটু তফাতে পরিস্কার ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাদের মাথার ওপর ওই যে বিপজ্জনক জিনিসগুলি দেখছেন ওগুলো যে-কোনও সময়ে খসে পডতে পারে। অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই, ইউ আর দেয়ার, অ্যান্ড আই অ্যাম হিয়ার।

হাসির রোল উঠল।

এরপর ভূগর্ভ থেকে ফের সংকীর্ণ বিপজ্জনক অসমান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসা গেল।

ওলানটাঙ্গি সুড়ঙ্গের মতো ব্যাপার পাঁচমারিতেও আছে। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ে তো আছেই। কিন্তু তা নিয়ে এমন আকর্ষক ভ্রমণকেন্দ্র তৈরি করার কথা এদেশে ভাবা যায় না।

পরদিন আমাদের নায়গ্রা যাওয়ার কথা। আড্ডাটা একটু কম করে রাতে তাড়াতাড়ি বিছানা নেওয়া গেল। একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে ওহাইও রাজ্যের সীমানা ডিঙিয়ে, গোটা নিউইয়র্ক রাজ্যটি পেরিয়ে আমেরিকার উত্তরপ্রান্তে নায়গ্রায় বেলাবেলি পৌঁছোনো যাবে। ফলথ্যাস থেকে নায়াগ্রার যা দূরত্ব সেই দূরত্ব আমাদের দেশের রাস্তায় মাত্র কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করার কথা ভাবাও বাতুলতা। ভাল রাস্তাই শুধু নয়, ভাল গাড়িরও যে দরকার। আমেরিকানরা রাস্তা তৈরি করতে জান লড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি গাড়ির ব্যাপারেও তারা অতীব উন্নাসিক।

পরদিন সকালে যে গাড়িটায় আমরা রওনা হলাম সেটা বিশাল বড় একখানা ওল্ডসমোবাইল। প্রভাত গাড়ি চালাবে, পাশে বাকেট সিটে আমি। পেছনের সীটে তনুশ্রী, তার দুই ছেলে মেয়ে, একজন বয়স্কা আত্মীয়া ও তাঁর নাতনী এবং আরও পেছনে অর্থাৎ মালপত্র রাখার জায়গায় অসীম ঠাকুর। গাড়ির জানালা বন্ধ থাকায় এবং ভেতরটা শব্দহীন হওয়ায় আড্ডার কোনও অসুবিধে হয়নি। এই আরামে এবং প্রায় ড্রয়িংরুমে বসে থাকার অনুভূতি নিয়ে বেড়ানো আমার কাছে একটু নতুন। মনে আছে রানীগঞ্জ থেকে দেওঘর যেতে অ্যাম্বাসাডারে আমাদের লেগেছিল পাঁচঘণ্টার কিছু বেশি এবং গায়ে গতরে সে কী ব্যথা!

আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম সকাল আটটা নাগাদ। সামান্য কিছু খেয়ে এবং বেশ কিছু খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে। নায়াগ্রায় রাত্রিবাস, পরদিন ফেরা।

আমেরিকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে একঘেয়েমি নেই বললেই হয়। বারবার ভূপ্রকৃতির কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটেই যায়। নিরবচ্ছিন্ন সবুজের সমারোহ চোখের পক্ষে ভারি স্নিগ্ধকর।

নায়াগ্রা যাওয়ার পথে যা আমাকে সব থেকে অবাক করে দেয় তা হল ইরি লেক। এই প্রাকৃতিক জলাশয়টি যে কী বিশাল তা অবাক হয়ে ভাবতে হয়। বলতে কি আমাদের যাত্রাপথের প্রায় সিকিভাগ জুড়েই ছিল এই জলাশয়টি, তারই ধার দিয়ে বিশাল রাস্তা।

প্রভাতকে জিজ্ঞেস করলাম, এত বড় লেক কি আরও আছে? হ্যাঁ, ইরির চেয়ে বড় লেক তিন-চারটে আছে। চিল্কাও বড়। কিন্তু চিল্কা ব্যাক ওয়াটার, সমুদ্রেরই

অংশ। ইরি তা নয়। সময় থাকলে ইরিতে একটু নৌকাবিহার করা যেত।

এই রাস্তায় বাফেলো শহরটি বড় শহর। আমরা শহরে আর থামিনি। আমেরিকায় সব শহরই অল্পবিস্তর একইরকম। কাজেই শহরের আলাদা বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নেই।

কখনও কখনও পথ থেকে একদিক ধরে নেমে গিয়ে পান্থশালায় চা খেয়ে, বাথরুম সেরে আবার রওনা হওয়া। গাড়ির মধ্যে আড্ডা এবং লঘু তন্দ্রা ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে চলছিল।

অপরাহ্নে রাস্তা ক্রমশ চওড়া হতে লাগল। এবং সামনে বেশ বড়সড় পরিসর জেগে উঠল, বোঝা যাচ্ছিল নায়াগ্রা আর দূরে নয়।

সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ আমরা নায়গ্রার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। নেমেই বুঝলাম, এখানে আমেরিকার মতো গরম নেই। বরং বেশ শীত-শীত করছে। গরম জামা আনিনি। সন্ধের পর শীত করলে কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

প্রভাত আর তনুশ্রী আমাদের গাড়িতে বসিয়ে রেখে হোটেলে ঢুকল ঘর ঠিক করতে। বেশ সময় নিচ্ছিল ওরা। আসলে এ সময়ে নায়গ্রায় দর্শনার্থীদের বেশ ভিড়। কাজেই অনেকক্ষণ সময় লাগল ঘর ঠিক হতে। মালপত্র নিজেরাই টানাটানি করে লিফটে তুললাম।

পাঁচ বা ছ-তলার ওপর পাশাপাশি তিনখানা ঘর পাওয়া গেল। একটায় আমি আর অসীম। অন্য দুটোয় বাকিরা। অসীম প্রবল সাহিত্যানুরাগী। খোঁজ-খবরও অনেক রাখে। তার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালই লাগে। অসীম তবলাও বাজায়। খুব নম্র প্রকৃতির এই ছেলেটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কাজ করে। পরের জন্য কাজ করার নেশাও তার আছে।

সমস্যা দেখা দিল অসীমকে নিয়েই। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে যখন আমরা নায়াগ্রার প্রাথমিক দর্শনে গিয়ে নায়াগ্রা নদীর ব্রিজের মুখে হাজির হলাম তখন জানা গেল, ওখানে ভিসা করা যাবে না। ভিসার জন্য যেতে হবে কাছাকাছি কোনও শহরে। অর্থাৎ বাফেলো।

নিউইয়র্কে আমার কানাডার ভিসা করাই ছিল। আর কারোই কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু অসীমকে ছাড়া আমরা ওপাশে যাই বা কি করে?

সুতরাং প্রভাত অসীমকে নিয়ে গাড়িতে রওনা হয়ে গেল। আমরা ইতি উতি পদচারণা করতে লাগলাম।

নায়াগ্রা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে যাওয়াটা বাড়াবাড়ি। পাঠ্যবই থেকে শুরু করে সিনেমা ও ডকুমেণ্টারিতে ছেলেবেলা থেকেই আমরা নায়গ্রার ছবি দেখে ও বিবরণ পড়ে আসছি। আমেরিকার দিক থেকে নায়গ্রার দৃশ্য এত ভাল করে দেখা যায় না, যতটা কানাডার দিক থেকে দেখা যায়।

যাদের পয়সা আছে তাদের জন্য নায়গ্রার ওপর দিয়ে অবিরল হেলিকপ্টারের টহল চলছে। একটা জলপ্রপাতকে নিয়ে যে কী বিপুল ব্যবসা তা আমাদের মস্তিষ্কে উদ্ভাবিত হওয়ার নয়।

খোলা জায়গায় কেবলমাত্র টি-শার্ট পরে বেশ ভালই শীত করছিল আমার। কিন্তু কিছু করার নেই। ভরসা এই যে, চট করে সর্দি-কাশি হওয়ার ধাত নয়। তবু শীতটা ভালই তীব্র এবং যত বিকেলের দিকে বেলা গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে।

মনে নেই, বোধহয় ঘণ্টা দুই আড়াই একটু-আধটু পায়ে হেঁটে এবং গল্প করে সময় কাটানোর পর প্রভাত আর অসীম ফিরে এল। হ্যাঁ, ভিসা হয়ে গেছে।

এই ভিসা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও তাজ্জব। এত দ্রুত এসব ফর্মালিটি এদেশে সমাধা হয় বোধহয় ব্যবসায়িক কারণেই। সে যাই হোক, ভোগান্তি যে হয়নি এটাই আসল কথা।

বিকেলের আলো তখনও একটু ছিল। আমরা নায়গ্রার ওপর বিশাল ব্রিজটি পেরিয়ে কানাডার দিকে নায়াগ্রা ফলস শহরে ঢুকলাম। দু দিকের শহরেই হোটেল ও অতিথি নিবাস। দোকানপাট ইত্যাদির ছড়াছড়ি। কানাডার দিকে কিছুটা বেশি।

প্রপাতের কাছাকাছি জায়গাটা চোখধাঁধানো রকমের করে সাজানো। রেলিং দিয়ে ঘেরা, পাথরে বাঁধানো বিশাল চত্বর। শপিং মার্কেট থেকে সব রকম ব্যবস্থা। যারা জলপ্রপাতের একেবারে নিচে গিয়ে দেখতে চান তাদের জন্য লিফট আছে, গা-মাথা ঢাকার জন্য ওয়াটারপ্রুফ আছে।

সন্ধে হতে না হতেই শুরু হল নায়াগ্রার পতনশীল জলের ওপর নানারকম আলোর প্রক্ষেপ। কয়েকবছর আগে মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনসে গিয়ে সেই সুন্দর উদ্যানে সন্ধের পর রুচিহীন লাল-নীল আলোর অত্যাচার দেখে ভারি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। এখানেও তাই হল। নায়াগ্রাকে রাতে দৃশ্যমান করতে একটা জোরালো সাদা আলোর প্রক্ষেপই যথেষ্ট ছিল। ওরকম নানা রঙের আলো ফেলার কী দরকার? ব্যাপারটা সুন্দর তো হলই না, বরং একটা গম্ভীর ও বিপুল জলপ্রপাতকে নিয়ে যেন ছেলেমানুষি মস্করাই হচ্ছিল।

নায়াগ্রায় এই সময়ে বিপুল পর্যটকের সমাবেশ। চারদিকে দীর্ঘগ্রীব মানুষ নায়গ্রাকে নানা কোন থেকে অবলোকন করে নিচ্ছে।

নায়াগ্রার উজানে গিয়ে প্রপাতের পূর্বাবস্থার নদীটিকেও দেখে এলাম আমরা। কিছু উপলও রয়েছে। বেশ চওড়া নদী। অনেকখানি জায়গা নিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হয়ে বহু নীচে পড়ছে। কিন্তু দর্শকের চাপে, আলোয় এবং নানা আধুনিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পর্যভূমিটি লোপাট হওয়ায় নায়গ্রার বিশালত্ব এবং ভয়ংকর ব্যাপারটি আর অনুভূত হয় না। শুনেছি শীতকালে নায়গ্রার জল সম্পূর্ণ বরফ হয়ে জমে যায়। তখন সেই নিস্তব্ধ জলপ্রপাতের শ্বেতশুভ্র ভাস্কর্য কেমন

দেখায় কে জানে। আমার দেখা হবে না বটে, কিন্তু যারা দেখে তাদের ভাগ্য ভালই।

হোটেলের ঘরেই সেই রাতে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়া হল। চাল ডাল হিটারে প্রেসার কুকারে চাপানো হয়েছিল বোধহয়। কিন্তু লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় চাল ডালের পরিমাণের সঙ্গে জলের পরিমাণ খাপ না খাওয়ায় সেদ্ধটা একটু কম হয়েছিল। কিন্তু খারাপ লাগেনি খেতে।

রাতে হোটেলের ঘর থেকেও নায়াগ্রার দু ধারে দুটি শহরের আলোকরাশি মনে করিয়ে দিচ্ছিল, নায়গ্রা শুধু প্রপাতই নয়, বিশাল একটা ইন্ডাস্ট্রিও বটে।

সকালের আলোয় ফের পোল পেরিয়ে কানাডায় ঢোকা গেল। চারদিকে অজস্র দর্শনার্থী। চত্বরে একটি রেস্তোরাঁয় দেখলাম বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ফুট লং হট ডগ। অর্থাৎ এক ফুট লম্বা হট ডগ। মাসখানেকের আমেরিকা সফরে হট ডগ হ্যামবার্গার চাখিনি বটে, কিন্তু দেখেছি বহুবার। এক ফুট লম্বা হট ডগ তো বিরাট ব্যাপার। আমেরিকানরা অতিভোজী বটে, কিন্তু তা বলে এক ফুট লম্বা হট ডগ! আশঙ্কার কারণ, হট ডগের দু ধারে দুটি পুরুষ্টু রুটির মাঝখানে শুয়োর বা গোমাংসের যে পুরটি থাকে তা সামান্য নয়। খাদ্যের ব্যাপারে অতীব উদার মার্কিন দেশে মাংস-টাংসর ব্যাপারে কার্পণ্য নেই। ফলে এক ফুট লম্বা হট ডগ-এ যে বিপুল খাদ্যবস্তু থাকে তা ক্যালরির দিক থেকে বা পরিপাক করার পক্ষে বিপজ্জনক ও কঠিন হওয়ার কথা। তদুপরি হট ডগের সঙ্গে আলু ভাজা ও সবজি ইত্যাদি আনুষঙ্গিক তো আছেই।

একটি অল্পবয়সী মেমসাহেবের হাতে সেই বিপুল আকৃতির লম্বা হট ডগটি দেখে আমি বাংলাতেই বলে ফেলেছিলাম, বাপ রে! এত বড়টা খেতে পারবে?

মেম বাংলা বোঝেনি, কিন্তু বিস্ময়টা বুঝেছিল। বোধহয় লজ্জাও পেল একটু। মুখখানায় রক্তিমাভা ও লাজুক হাসির সঙ্গে আমাকে বলল, ইট ইজ এ বিট বিগ, আইন্ট ইট?

সে কথা আর বলতে?

ত্রিশ বছরের নিরামিষাশী দু চোখে আমি দেখলাম, মেমটি দিব্যি ঘুরে ঘুরে, নায়াগ্রা দেখতে দেখতে হট ডগটি খেয়ে ফেলছে।

পরদিন সারাদিনই নায়াগ্রায় কাটিয়ে পড়ন্ত দুপুরে আমরা লরার পথ ধরলাম। নায়াগ্রা থেকে কলম্বাস। পরদিন আমাকে নিউইয়র্কের দিকে রওনা হতেই হবে।

লরার পথেও আড্ডা, গল্প, সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রশ্ন। কলম্বাসে ফিরতে একটু রাত হল, খেয়ে ঘুম।

পরদিন তনুশ্রী নিয়ে গেল একটি সুপারস্টোরে। অতিকায়, বহুতল বিশিষ্ট সব পেয়েছির দেশ। এই সুপার স্টোরটি আবার সারা বছর প্রতিদিন এবং চব্বিশ

ঘণ্টাই খোলা থাকে। কেনার কিছু তেমন নেই, কিন্তু অজয় জিনিস দেখে বেড়ানোর মধ্যেও একটা উপভোগ্যতা আছে। আমি গরিব দেশের মানুষ। আমাদের দেশের কোনও দোকানেই এত জিনিস একসঙ্গে দেখার কল্পনাও করতে পারি না। কী নেই এসব সুপারস্টোরে সেইটেই গবেষণার বিষয়, কনজিউমার্স মার্কেট বলে খদ্দের টানার সবরকম পদ্ধতিই এরা গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা, উত্তম পণ্য এবং ন্যায্য দাম। তাছাড়া 'সেল' তো আছেই।

ক্ষয়িষ্ণু ডলারের পুঁজিতে আর থাবা দিতে মন সরছিল না। তাই খুব যৎসামান্য কেনাকাটা করেছিলাম। তনুশ্রী অবশ্য তার প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে নিল।

দুপুরে তনুশ্রীর বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট্ট বারান্দার মতো জায়গায় বসে আমার একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিল অসীম আর তনুশ্রী। অতলান্তিক পত্রিকার জন্য।

আমেরিকা ভ্রমণের শেষ পর্বে এসে গেছি প্রায়। আর কয়েকদিনের মধ্যেই লন্ডন হয়ে কলকাতা ফিরব। ঝকমকে আমেরিকা থেকে ফিরে মিনমিনে কলকাতা কেমন লাগবে ? আশ্চর্য আমাদের মনের পক্ষপাত ! কলকাতার কথা মনে হলেই যেন প্রাণ আনচান করে। অবশ্য সেখানে আমার পুত্রকন্যা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়রা আছেন। তাছাড়াও কলকাতারই এক আশ্চর্য আকর্ষণ কিন্তু আমাকে সর্বদাই টানে। কলকাতার প্রতি আমার দুর্বলতা বহুকালের। কৈশোরকালে নানা সুন্দর দৃশ্যাবলী সমন্বিত চমৎকার সব জায়গায় থেকেছি। কিন্তু বরাবরই একটা অস্পষ্ট ইচ্ছে ছিল, একদিন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থাকব। আজও কলকাতাকে আমার ত্যাগ করতে ইচ্ছে হয় না। যতই গ্রাম্য হোক, কলকাতার মতো বৈচিত্র্য আর কোথায় আছে ?

পরদিন সকলেরই মন একটু খারাপ। আমেরিকায় জীবন একটু নিঃসঙ্গ। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডার পরিবেশ এখানে সহজে তৈরি করা যায় না। দূরত্ব আছে, কর্মব্যস্ততা আছে। তাই এখানে কারও বাড়িতে কেউ এলে যেমন একটা খুশিয়াল ভাব তৈরি হয়, চলে যাওয়ার সময় আবার তেমনিই আসে বিষণ্ণতা।

বিকেল ছটায় গ্রে-হাউন্ড বাসে চেপে পরদিন ভোরে নিউইয়র্ক পৌঁছোবো। পরু অর্থাৎ প্রবীরের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়ে আছে যে আমাকে সকালে বাস আড্ডায় নিতে আসবে। তার বাড়িতে সারাদিন কাটিয়ে রাতেই ফের নিউইয়র্কে সুপ্রিয়র বাড়িতে যাওয়া। পরুর বাড়ি নিউইয়র্ক শহরে নয়, নিউইয়র্ক রাজ্যের ছোট্ট এক শহরে।

বাস আড্ডায় আমাকে তুলতে গেল প্রভাত, তনুশ্রী, অসীম এবং প্রভাতের ছেলেমেয়েও। কলম্বাস থেকে নিউইয়র্কের বাস ভাড়া অষ্টাশি ডলার। এদেশে

যাতায়াত যে কী ব্যয়সাপেক্ষ তা বলার নয়। ট্রাভেলারস চেক ভাঙিয়ে টিকিট করলাম। তারপর লবিতে বসে আড্ডা চলছিল। হঠাৎ আমার মনে হল, বাস যেন দেরি করছে। প্রভাতকেও সেই কথা বললাম। ওরা বলল, গ্রে-হাউন্ড বাস নাকি কখনও সময়ের নড়চড় করে না।

সেদিন কিন্তু করল। একটু বাদেই একজন বুড়োমতো সাহেব এসে ঘোষণা করল, নিউইয়র্কগামী বাস এখনও এসে পৌঁছোয়নি। দেরি হবে।

লবিতে যারা ঘোরাফেরা করছে তাদের মধ্যে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ভারি সুপুরুষ ভারতীয় চেহারার ছেলে বারবারই আমার দিকে তাকাচ্ছে, আর চোখে চোখ পড়লেই একটু পরিচিতের মতো হাসছে। সে একা নয়, সঙ্গে আরও দুজন আছে। বাঙালি বলেই মনে হচ্ছিল।

একটু বাদে ছেলেটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ঢাকার ?

মৃদু হেসে বললাম, ঢাকায় দেশ। তবে এখন আমি কলকাতার।

আমরা ঢাকা থেকে এসেছি।

একটু অবাক হয়ে বললাম, ঢাকা থেকে এতদুরে এসেছো কেন ? বেড়াতে ?

না, আমরা পড়ি।

কী পড়ো ?

ইঞ্জিনিয়ারিং।

ভারি ভদ্র আলাপী ছেলে। কথায় কথায় জানলাম, তারা ঠিক স্কলারশিপ পেয়ে আসেনি। একটু কৌশল করেই এসেছে। দেশের জীবন ভাল লাগছে না। তাই এই বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে আসা। তবে তাদের বৈধ পাসপোর্ট আছে।

বাস এল প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরিতে। শুনলাম বাসটি নাকি লস এঞ্জেলেস থেকে আসছে। তাহলে এর দৌড়ের পাল্লা ভাবলে চোখ চড়কগাছ হওয়ার কথা।

বাসের গায়ে বহির্ভাগে লাগেজ চেম্বারে ব্যাগটা তুলে দিয়ে চিন্তা হল, কেউ মাঝরাতে কোনও স্টপে যদি নামিয়ে নেয় ?

প্রভাতকে আশঙ্কার কথা জানাতেই সে বলল, এরকম আকছার হয়। কিন্তু এরা তো বাসের মধ্যে ব্যাগ নিতে দেবে না। নিয়ম নেই।

নিয়ম নেই। কিন্তু তবু দেখলাম দু-একজন প্যাসেঞ্জার তাদের হ্যান্ড ব্যাগেজ নিয়েই বাসে উঠছে। আমিও তাই আমার ব্যাগটি বের করে সেটি হাতে নিয়েই বাসে উঠলাম।

চমৎকার বাস। পেছন দিকে একটু টয়লেটও আছে। বসার ব্যবস্থা খুবই আরামদায়ক। আমার পাশেই বাংলাদেশি ছেলেদের একজন বসেছে। সে আমাকে একটা কোকের টিন উপহার দিয়ে বলল, দাদু, আমরা কিন্তু নিউইয়র্ক পর্যন্ত যামু না। মাঝপথে নাইম্যা যামু।

আমি বললাম, বেশ। নামবার সময় আমাকে ডেকো। বাস ছাড়ার পর মনে হল, বাসটা যে চলছে সেটাই টের পাওয়া যাচ্ছে না যেন। রাস্তা যেমন মসৃণ, বাসটিও তেমনি ঝাঁকুনি ও শব্দবিহীন, সঙ্গে খাবার দাবার নেই বলে আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। এ বাস নিশ্চয়ই ডিনারের ব্রেক দেবে। কিন্তু আমি খাবো কী?

বাংলাদেশি ছেলেটির দেওয়া কোকটিই সেই রাতে আমার ডিনারের বিকল্প হয়ে রইল। ছেলে তিনটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। মা-বাবাকে ছেড়ে এসে কষ্ট হচ্ছে কি না, এখানে কী কী অসুবিধে হয়েছে। ওরা দেখলাম, মনের দিক থেকে তৈরি হয়েই এসেছে। এখানে এসেও মানিয়ে নিয়েছে চমৎকার। না, আমেরিকায় তাদের কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত তিনটে নাগাদ বাংলাদেশি ছেলেরা নেমে গেল। নামার আগে বলে গেল, দাদা, দোয়া করবেন।

কোন জায়গায় নামল সেটা আজ আর মনে নেই। কিন্তু ছেলেগুলোকে খুব ভাল লেগেছিল সেদিন।

এক অপরূপ ভোরবেলা চোখ মেলে দেখলাম, বাস নিউইয়র্ক শহরে ঢুকছে। নিউইয়র্ক আমার কাছে পুরনো হবে না কখনও। এই এক শহর যা আমাকে সত্যিই বড্ড অবাক করে দিয়েছিল। কাচের ভেতর দিয়ে দুই নিষ্পলক চোখে নিউইয়র্ক দেখে নিচ্ছিলাম।

গ্রে হাউন্ড বাস তার বিশাল সেন্ট্রাল টার্মিনালে পৌঁছোলো। এখানেও এক দিশাহারা অবস্থা। হাজারটি বাস হাজার দিক থেকে এসে হাজারো চ্যানেলে ঢুকছে। অবশ্য নিয়ম জানলে কোন বাস কোন চ্যানেলে কখন ঢুকবে তা বোঝা একটুও কঠিন নয়। তাই আমি ঘাবড়ালাম না। জানি, পরু আমাকে ঠিকই খুঁজে নেবে।

খোঁজারও দরকার হল না। বাস থেকে নামতেই পরুর হাসিমুখের দর্শন পাওয়া গেল। হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে পরু আমাকে টার্মিনালের বাইরে এনে ফুটপাতে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল, পাঁচ মিনিট দাঁড়ান, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। গাড়ি পার্কিং লটে রাখা আছে।

জানি, গাড়ি রাখা এদেশে মহা ঝামেলার ব্যাপার। ব্যাগটা পাশে রেখে দাঁড়িয়ে আছি। সামনের রাস্তার দৃশ্য দেখছি। গাড়ির পর গাড়ি চলে যাচ্ছে। তবে ধীরে, কারণ, বাস আড্ডায় যাত্রীদের নিতে গাড়ির ঢল নেমে আসায় একটু জ্যাম মতো হয়েছে।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, উল্টো দিক থেকে একটি নিগ্রো রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসছে আর সামনে যে গাড়িটা যাচ্ছে তারই জানালায় ঝুঁকে কী যেন চাইছে বলে মনে হল, কৃষ্ণাঙ্গরা এসব করেই থাকে। হয়তো বেকার, হয়তো কাজে অনিচ্ছুক।

আমি দাঁড়িয়ে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছি, লোকটা সোজা আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

বিনা ভূমিকায় বলল, হেঃ মিস্টার গিভ মি এ সিগারেট!

মানিব্যাগটা চাইলেও দিয়ে দিতে হত বোধহয়, প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে হাতে দিতেই সে সিগারেটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, কস্টলি থিং আঁ ?

বললাম, ইয়েস।

যে সিগারেটের ফিল্টারটা খুলে ফেলে দিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরে হুকুম দিল, লাইট ইট আপ।

অগত্যা ধরিয়েও দিতে হল, সে আমাকে একটা অস্পষ্ট থ্যাংক ইউ দিয়ে চলে গেল।

সামান্য ঘটনা। তবু মনে আছে, আমেরিকায় এরকম নিস্কর্মা, চেয়ে চিন্তে বেড়ানো লোকের অভাব নেই। জীবনটা কোনও রকমে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া এরা আর কিছু করতে চায় না।

পবু গাড়ি নিয়ে এল একটু দেরিতে। ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছিল।

আমেরিকায় যত বাড়িতে গেছি তার মধ্যে পবুর বাড়িটার একটু অভিনবত্ব হল, ওর বাড়ির সামনে একটা ব্যালকনি গোছের আছে। এবং সেটা ভেদ করেই একটা বড় গাছ উঠেছে।

পবুর বাড়িতে যে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এর জন্য তার লক্ষ্মীমন্ত বউটি খুব দুঃখ করল। তার ওপর সে যে বেরিয়ে যাবে চাকরিতে। আমি বললাম, দুঃখ করার কিছু নেই, আবার দেখা হবে।

ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ অবধি সবই সযত্নে তৈরি করে সাজিয়ে রেখেছে বউমা, ব্রেকফাস্ট নিজের হাতেই খাওয়াল।

পবু রইল আমার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। লাঞ্চের আগে যেটুকু সময় পেলাম নারায়ণদার জন্য একটা বক্তৃতা রেকর্ড করলাম অডিও ক্যাসেটে। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ আগতপ্রায়। আমেরিকাতেও সেই শতবর্ষ পালনের আয়োজন করেছেন নারায়ণ মজুমদার, তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে অক্টোবর পর্যন্ত রেখে দেন। কিন্তু কলকাতায় বিস্তর কাজ ফেলে এসেছি। ভিসা থাকলেও অতদিন থাকার উপায় নেই, আমার শিশুপুত্রটি আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, টেলিফোনে মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছিবাবার বিরহে সে কান্নাকাটি জুড়ছে মাঝে মাঝেই। তাই থাকতে পারব না বলে বক্তৃতা রেকর্ড করে যেতে হচ্ছে। নারায়ণদা জন্মোৎসবে ওটাই শোনাবেন সবাইকে, তাতে কাজ কী হবে জানি না, কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা দেখে রাজি হতে হয়েছিল।

রাতের খাবার খেয়ে পবু আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেরোতে একটু রাত হয়েছিল ঠিকই, তাই বলে রাত দশটা তো আমেরিকায় তেমন রাতই নয়। বিশেষ করে নিউইয়র্ক শহরে তো সারা রাতই জমজমাট।

কুইনস বরোতে সুপ্রিয়র বাড়ি, জামাইকা অ্যাভিনিউ ধরে গিয়ে ভ্যালডারভিন অ্যাভিনিউতে ঢুকতে হবে। তারপর আরও একটা ছোটো রাস্তা।

এই জামাইকা অ্যাভেনিউতেই গণ্ডগোলটা হল, পবু প্রথমটায় ডানদিকে মাইল দশ পনেরো ড্রাইভ করার পর কোথাও হদিশ না পেয়ে গাড়ি থামিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, কিন্তু দেখা গেল, লোকগুলো সবই কৃষ্ণাঙ্গ এবং সকলেই ঘোর মাতাল। ভ্যালডারভিন অ্যাভিনিউ সম্পর্কে তারা কেউ কিছু জানে না, আর তাদের ভাষাতেও বেশ অশালীন শব্দ ঢুকে যাচ্ছে তখন।

অগত্যা উজান ছেড়ে ভাটির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল পবু। অন্তত বিশ মাইল যাওয়ার পরও ভ্যালডারভিন অ্যাভিনিউয়ের হদিস পাওয়া গেল না। আমরা দুজনেই একটু নার্ভাস বোধ করছি। কারণ আমাকে পৌঁছে পবুকে আবার এতটা পথ একা ফিরতে হবে। ঘড়িতে তখন রাত পৌনে এগারোটার কাছাকাছি।

কী একটা রাস্তার দিকচিহ্ন দেখতে গিয়ে পবু আনসান ব্রেক চেপেছিল। পেছন থেকে একটা গাড়ি সজোরে এসে লাগতে লাগতেও কোনওরকমে ধাক্কা বাঁচিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। মুশকিল এক তরুণ আমেরিকান পবুর দিকে চেয়ে সখেদে বলল, নাইস ড্রাইভিং স্যার, নাইস ড্রাইভিং!

পবু লজ্জা পেয়ে মাপ চাইল, কিন্তু এই ঘটনাটাই হয়ে গেল শাপে বর। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম, তারই অদূরে সামনে বাঁ দিকে একটা মাইলে ভ্যালডারভিন অ্যাভিনিউ নামটি জ্বলজ্বল করছে।

সুপ্রিয়র বাড়িতে পৌঁছে দেখি তারা সবাই উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে। পবু বেরোবার আগে ওদের টেলিফোন করে বেরিয়েছিল, এতক্ষণ সময় লাগার কথা নয়। রাত হয়ে গিয়েছিল তাও পবু কিছুক্ষণ বসে আড্ডা দিল, তারপর কফি খেয়ে রওনা হয়ে গেল।

সুপ্রিয় বা তার বউ ভারতীকে দেখলে কে বলবে যে তারা আমেরিকায় থাকে! তাও ভারতী আমেরিকায় আছে সুপ্রিয়রও অনেক আগে থেকে। তার বাপের বাড়ির প্রায় সকলেই দীর্ঘকাল এ দেশে। বঙ্গ সম্মেলনের প্রাক্তন উদ্যোক্তা প্রবীর রায় ভারতীর দাদা, ভারতী ডুরে পার শাড়ি পরে, খুব লাজুক মুখে কথা বলে এবং বাড়ির উঠোনে যথারীতি লাউ বেগুন এবং লঙ্কা ফলায়, সুপ্রিয়রও মার্কিন দেশের কোথাও রং লাগেনি। আদ্যন্ত বাঙালি রয়ে গেছে। তদুপরি সে একটু ভাবুক ধরনের মানুষ।

বাড়িতে চারটি প্রাণী— সুপ্রিয়, ভারতী, তাদের শিশুকন্যা পায়লা এবং একটি ছোট্ট পাখি। এই পাখিটা আসলে মুগ্ধ করেছিল খুব, সকালে পাখিটা খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হত। তখন সেটা সারা বাড়িতে উড়ে উড়ে বেড়াত। তার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা ছিল বাথরুম। আমি বাথরুমে ঢুকলেই তার চেঁচামেচি শুনতে পেতাম। বাইরে উড়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। কারণ গোটা বাড়িটাই তো বাক্সের মতো বন্ধ জায়গা, পাখিটা পালানোর চেষ্টাও করত না।

যে রাতে সুপ্রিয় বাড়িতে পৌঁছলাম সেই রাতেও বেশ কিছুক্ষণ বসে গল্প করা গেল, কারণ পরদিনই আমার লণ্ডন রওনা হওয়ার কথা। সেখানে চার-পাঁচ দিন ভাস্কর দত্তের বাড়িতে থেকে কলকাতা ফিরে যাবো, কাজেই আমেরিকায় এ যাত্রা এটাই আমার শেষ রাত্রি। গল্পে গল্পে রাত বোধহয় দেড়টা হয়ে যাওয়ার পর দোতলায় একটা ছোট্ট সুন্দর ঘরে আমার শোওয়ার ব্যবস্থা হল। বিছানার পাশে জল টল রাখা।

ক্লান্ত ছিলাম, শুয়েই ঘুম এসে গেল। হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাত আর চাপা গলায় ডাক শুনতে পেলাম, শীর্ষেন্দুদা! শীর্ষেন্দুদা।

বললাম, কে?

আমি সুপ্রিয়।

উঠে দরজা খুলে বললাম, কী হয়েছে সুপ্রিয়?

সুপ্রিয় ঘরে ঢুকে ভারি অপরাধী মুখ করে বলল, আপনার কাছে একটা অপরাধ করে বসে আছি, তাই মাপ চাইতে এলাম।

হেসে ফেললাম, কী অপরাধ করেছো শুনি?

আজ্ঞে একটা মিথ্যে কথা বলেছি, আপনার ফিরে যাওয়ার টিকিট কালকের নয়, পরশু দিনের। দেখলাম আপনি যদি কাল যান তাহলে আমার বাড়িতে আপনার থাকাটাই হয় না। তাই সবাইকে বলে দিয়েছি আপনি কাল যাচ্ছেন, যাতে কেউ আপনাকে না আটকায়।

খুব হাসলাম। তারপর বললাম, তোমার এই আন্তরিকতায় বরং খুশিই হয়েছি, একদিন দেরি হলে আর কী অসুবিধে হবে?

সুপ্রিয় অনেক ক্ষমাটমা চেয়ে বিদায় নিল। আমিও নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম।

পরদিন সকালে বেজায় ভারী ব্রেকফাস্ট খেয়ে ভারতীর বাগান দেখে পায়েলার সঙ্গে একটু খুনসুটি করে সুপ্রিয়র সঙ্গে কুইনস এলাকা দেখতে বেরিয়ে পড়া গেল। ম্যানহাটানের মতো জাঁকজমক নেই বটে, কিন্তু কুইনসও কম দেখনদার নয়। বিশাল এলাকা জুড়ে নিউইয়র্কের এই পরগনাটি কলকাতাকে গিলে ফেলতে পারে।

সুপ্রিয় বারবারই আমাকে জিজ্ঞেস করছে, দাদা, কী নেবেন? আপনাকে কী দেবো?

আমি মাথা নেড়ে বলি, ভাইরে, আমার যে কোনও জিনিসেরই দরকার নেই, টুকটাক কিছু কেনাকাটা করেছি বাড়ির লোকেদের জন্য, ওতেই যথেষ্ট।

না, আপনাকে কিছু না দিলে আমার শান্তি নেই।

অনেক কষ্টে তাকে ঠেকালাম।

কুইনসে একটা বিশাল সুপারস্টোরের সামনে নিয়ে গিয়েছিল সুপ্রিয়, কোথাও অজ্ঞাত কারণে সুপারস্টোরটি বন্ধ হয়ে গেছে, নিউইয়র্কে এরকম বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানপাট আরও বেশ কয়েকটি দেখেছি, নিউইয়র্ক হল বিশ্বের সবচেয়ে চালু বাজার। দুনিয়ার লোক এখানে কেনাকাটা করতে আসে। এখানেও কেন ব্যবসা ফেল মারে সেটা আমার বোধের অগম্য।

দুপুরে আর কোথাও ভাত খাইনি, সুপ্রিয়র বাড়ি গেলাম। তারা দুবেলাই ভাত খায়। লাউঘণ্ট, বেগুনভাজা ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার বাঙালি রান্না, শুনলাম রান্নায় ভারতীর বেশ সুনাম আছে। সে মিষ্টিও নানারকম তৈরি করতে পারে।

সুপ্রিয়র বাড়িতে অবিরল ফোন আসছে, অনেকেই আমাকে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন, কারও কাছেই প্রকাশ করা গেল না যে, আমি আজ যাচ্ছি না।

আমার শিশুপুত্রটি টেনিস খেলায় আগ্রহী এই কথাটা কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম, সুপ্রিয় নিজেও টেনিস খেলে, তৎক্ষণাৎ সে তার একটা দামী অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়ের তৈরি র‍্যাকেট আমার ছেলের জন্য উপহার দিয়ে ফেলল। জিনিস বাড়লে আমার আতঙ্ক হচ্ছে। কারণ দুখানা সুটকেসই বোঝাই হয়ে গেছে, আর জায়গা নেই।

সন্ধেবেলা আমি সুপ্রিয় আর পায়লা বেরোলাম। সুপ্রিয় দুচার জায়গা ঘুরে সোজা একটা সুপারস্টোরে নিয়ে গেল। এবার সে বদ্ধপরিকর আমাকে একটা উপহার কিনে দেবেই। যে জিনিসই সে দেখায় সেটাই নাকচ করি বলে বিরক্ত হয়ে সে আমাকে আর পায়লাকে একটা ডিভিও গেম মেশিনের সামনে মোতায়েন করে দিয়ে নিজেই গেল উপহার কিনতে।

আমি আর পায়লা মন দিয়ে ভিডিও গেম খেলতে লাগলাম। আধ ঘণ্টা বাদে সুপ্রিয় এল, মুখে বিজয়ীর হাসি, হাতে একটা প্যাকেট।

আপনার জন্য আনলাম।

খুলে দেখি তাতে একটা স্লিপিং স্যুট। বেশ দামী জিনিস, কিন্তু হেসে বাঁচি না। শোওয়ার সময় লুঙ্গি আর খালি গা ছাড়া আমার ঘুমই আসে না। এ জিনিস পরবে কে ?

তবু ওই উপহারের সঙ্গে মিশে থাকা সুপ্রিয়র ভালবাসাটি ভুলি কী করে ? আজও জিনিসটি আমার ওয়ার্ডরবে যে শোভা পাচ্ছে।

নিউইয়র্কে এ যাত্রায় শেষ রাত্রিটি খুব দ্রুত ঘনিয়ে এল। সময়ের হিসেবের

গোলমালে খুব অসময়ে ভাস্করকে ফোন করে মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়েছিলাম। সে অবশ্য বিরক্ত হয়নি। বলল, তুমি এসো। আমি হিথরোতে থাকব।

পরদিন বিকেলে ফ্লাইট, সুপ্রিয়র সঙ্গে সকালেও একটু বেরোলাম। এটা ওটা সেটা যথাসাধ্য দেখাল সে।

তারপর ধীরে ধীরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

আমেরিকায় আর আসা হবে কি না কে জানে। হয়তো এটাই প্রথম ও শেষ। তার জন্য দুঃখ নেই। আমি এক গরিব দেশের মানুষ, সেখানেই আমার শান্তি ও স্বস্তি, আমার দীন বাতাবরণে মাঝে মাঝে আমেরিকার স্বপ্নের মতো দৃশ্যাবলী ভেসে উঠবে, এইটেই যা প্রাপ্তি।

বিকেলে সুপ্রিয় আমাকে এয়ারপোর্টের টার্মিনালে পৌঁছে দিল। তার বিষণ্ণ মুখখানার দিকে চেয়ে একটু বিষাদবোধ করি। আবার দেশে ফেরার আনন্দও তো আছে। হরিষে বিষাদে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ডিপারচার লেখা কাউন্টারে গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম।

এবার যাত্রা পূর্বে স্বদেশের দিকে।